৭৮৩

হিমালয়ের পাঁচ-ধাম

- সুশীল চন্দ্র ভট্টাচার্য

৪৫৩৮

সূচীপত্র

শ্রদ্ধা ও সমাধান সহকারে তীর্থগমন করিলে পাপীও শুদ্ধ হয় এবং যিনি শুদ্ধচিত্ত তাঁহার বিশিষ্ট ফল লাভ হয়। বিধিপূর্ব্বক তীর্থযাত্রার ফলে তির্য্যক্‌যোনিতে ও কুদেশে জন্মগ্রহণ হয় না, স্বর্গলাভ হয় এবং এমন কি মোক্ষের উপায় পর্য্যন্ত অধিগত হইতে পারে। "তির্য্যগ্‌যোনিং ন গচ্ছেত্তু কুদেশে চ ন জায়তে। স্বর্গী ভবতি বৈ বিপ্র মোক্ষোপায়ং চ বিন্দতি।" কিন্তু যাহার হৃদয়ে শ্রদ্ধা নাই, যে নাস্তিক, যাহার অন্তর সংশয়াকুল, যে পাপাত্মা ও যে হেতুনিষ্ঠ বা কুতার্কিক—সে তীর্থফল লাভ হইতে বঞ্চিত হয়। "অশ্রদ্দধানঃ পাপাত্মা নাস্তিকোঽচ্ছিন্নসংশয়ঃ। হেতুনিষ্ঠশ্চ পঞ্চৈতে ন তীর্থফলভাগিনঃ।" অতএব তীর্থের শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ফল ঠিক ভাবে প্রাপ্ত হইতে হইলে সংযম ও শ্রদ্ধার সহিত বৈধ উপায়ে তীর্থসেবা করিতে হইবে। স্থানের এমনি মাহাত্ম্য যে, তীর্থের তীর্থত্ব জানা না থাকিলেও তাহার কার্য্য হইয়া থাকে। দাহিকা শক্তির জ্ঞান না থাকিলেও দাহ্য বস্তুর সহিত অগ্নির স্পর্শ হইলে যেমন দাহক্রিয়া হইবেই, তেমনি তীর্থরূপে কোন স্থানের পরিচয় না পাইলেও ঐ স্থানের স্বাভাবিক প্রভাববশতঃ চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি ফল অবশ্যম্ভাবী। তবে জ্ঞানপূর্ব্বক তীর্থের আশ্রয় গ্রহণ করিলে ফলের আধিক্য হইয়া থাকে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। "অজ্ঞানেনাপি যস্যেহ তীর্থযাত্রাদিকং ভবেৎ। সর্ব্বকামসমৃদ্ধঃ স স্বর্গলোকে মহীয়তে।"

তীর্থ যে শুধু পৃথিবীতেই আছে এমন যেন কেহ মনে না করেন। কারণ, ত্রিগুণাত্মক সংসারে চতুর্দ্দশ ভুবনের অন্তর্গত যে কোন স্থানে সত্বগুণের বাহুল্য, সেখানেই তীর্থত্ব অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। এইজন্য স্বর্গমর্ত্ত্য-রসাতল কোনস্থানেই তীর্থের অসদ্ভাব নাই, ব্রহ্মপুরাণ ও মহাভারতের বচন হইতে ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। এই সকল তীর্থ দৈব, আসুর, আর্ষ, মানুষ—এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। ব্রহ্মাদি দেবনির্ম্মিত তীর্থকে দৈবতীর্থ বলা হয়। পুষ্কর ও সরস্বতী (ব্রাহ্ম), প্রভাস ও গঙ্গা

বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণে গোদাবরী, ভীমরথী, তুঙ্গভদ্রা, পয়োষ্ণী প্রভৃতি নদী এবং হিমালয় হইতে উদ্ভূত ভাগীরথী, যমুনা, বিশোকা, বিতস্তা প্রভৃতি নদী দেবতীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ। অসুররচিত তীর্থ আসুর, যেমন গয়া। ঋষিগণস্থাপিত তীর্থ আর্ষ ও চন্দ্র-সূর্য্যবংশীয় রাজগণ ও অন্য মনুষ্য দ্বারা স্থাপিত তীর্থ মানুষ।

প্রাচীনকালে লোকে পদব্রজে তীর্থযাত্রা করিত। প্রায়ই কোন প্রকার যানের আশ্রয় গ্রহণ করিত না। শাস্ত্রেও সাধারণতঃ তীর্থগমনে যানের ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, সর্ব্বদা লক্ষ্য বা গম্যস্থানের স্মৃতি অবিচ্ছিন্নভাবে হৃদয়ে রাখিয়া কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক সংযম ও তিতিক্ষার সহিত তীর্থে গমন করা উচিত; তাহাতে চিত্তশুদ্ধি ও দেবতার প্রসন্নতা উভয়ই প্রাপ্ত হওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে রেলগাড়ী, মোটর ও বাষ্পীয় পোতের বহুল প্রচারে পদব্রজে তীর্থপর্য্যটনের প্রথা এক প্রকার লুপ্ত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবে যেখানে এখনও ঐ সকল যানের প্রচার অধিক হইতে পারে নাই, সেখানে পদব্রজে যাত্রার প্রচলন রহিয়াছে। বলা বাহুল্য, হিমালয়ের প্রায় সকল ধামই এই জাতীয় তীর্থের অন্তর্গত।

গ্রন্থকার পদব্রজে হিমালয়ের দুর্গম অথচ নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্যবহুল স্থান সকল পরিভ্রমণ করিয়াছেন এবং নিজের ভ্রমণকাহিনী তীর্থযাত্রীর আবশ্যকীয় সংবাদ সহ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই গ্রন্থে বদরীনারায়ণ, কেদারনাথ, ত্রিযুগীনারায়ণ, গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরী এই পঞ্চ ধামের সচিত্র বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। যাঁহারা হিমাচল-ক্ষেত্রে পর্য্যটনের অভিলাষী, তাঁহারা এই গ্রন্থপাঠে বিশেষ উপকৃত হইবেন, সন্দেহ নাই। গ্রন্থকার সুলেখক—তিনি কিছু দিন পূর্ব্বে তাঁহার 'মানস-সরোবর ও কৈলাস' নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার বর্ত্তমান

প্রসিদ্ধির পোষকতাই করিবে। ভরসা আছে—গ্রন্থকার এই প্রকার আরও দুর্গম তীর্থের ভ্রমণবৃত্তান্ত তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশিত করিয়া লোকসমাজের চিত্তবিনোদনের সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণ-সাধন করিবেন। কারণ, এই প্রকার গ্রন্থাধ্যয়ন হইতে কাহারও মনে তীর্থযাত্রার প্রতি ঔৎসুক্য উৎপন্ন হইলে ধার্ম্মিক দৃষ্টিতেও গ্রন্থরচনা সার্থক বলিয়া বিবেচিত হওয়ার যোগ্য।

আশা করি, তীর্থযাত্রার যথাযথ বিবরণরূপেই হউক অথবা দুর্গম হিমবৎপ্রদেশে পর্য্যটনের বৃত্তান্তরূপেই হউক, এই গ্রন্থ বঙ্গীয় পাঠক-সমাজে সমাদর লাভ করিবে।

৺কাশীধাম
২৩শে চৈত্র, ১৩৪৪

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ
(মহামহোপাধ্যায়, এম, এ)

ভ্রম-সংশোধন

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা		পংক্তি
তীর্থস্থানে	তীর্থস্নানে	৬	...	১৪
একভারে	একভাবে	১১	...	১০
এখন	এখান	১২	...	১৬
অজুহতই	অজুহাতই	২৩	...	২২
অসিলাম	আসিলাম	২৬	...	৭
দৃষ্ট	দৃষ্টি	৩১	...	২১
"বুকস্"	"বুরাস"	৩২	...	১০
গিয়ে	গিয়া	৩২	...	১৫
নানিয়া	নামিয়া	৩২	...	১৬
কেহ	কেহ কেহ	৪৪	...	৩
অমরা	আমরা	৬৩	...	১০
১৯৩৫	১৯২৫	৬৫	...	৩
মহার্ঘ্য	মহার্ঘ	৭৯	...	৪
বিলাস	বিলাসী	৮২	...	৫
শঙ্কধারা	শঙ্খ-ধারা	৯১	...	২
"হরি-শিলা"	"হরশিলা"	৯৭	...	১০
তুষারের	তুষারে	৯৮	...	১৫
অন্দাজ	আন্দাজ	১০৪	...	৪
একবার	একবার এই	১০৫	...	১০
বভূবঃ	বভূব	১০৭	...	১০
সিদ্ধচারণঃ	সিদ্ধচারণা	১০৭	...	১১
জঠাজূটধারী	জটাজূটধারী	১০৮	...	১৫
ধরাণী	ধরালী	১১৪	...	১৫

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা		পংক্তি
পুস্তকাগারে	পুস্তকাকারে	১১৫	...	১
চলিত	চলিতে	১১৭	...	২
ফিরিয়	ফিরিয়া	১৪০	...	৬
করিরা	করিয়া	১৪০	...	৬
কেনা	কিনা	১৪০	...	৭
পিচলাইয়া	পিছলাইয়া	১৪১	...	১৯
অতিরিক্তি	অতিরিক্ত	১৪৬	...	৮
জ্বালাইয়া	জ্বালাইয়া রাখা	১৪৭	...	২২
হাঁপ	হাঁফ	১৪৯	...	১২
"গাওরান কী মড়া	"গাওয়ান কী মাড়া"ও	১৪৯	...	২৩
কেন	কোন	১৫২	...	১৫
শেঠগণেরও	ও শেঠগণের	১৫৬	...	২৩
কালীমলীওয়ালার	কালীকমলীওয়ালার	১৫৯	...	৪
হানুমানজী	হনুমানজী	১৬০	...	৬
দ্রৌপদীর	দ্রৌপদীর মূর্ত্তি	১৬০	...	১০
বেকল	বেলক	১৬৩	...	১৪
চতুদ্দিকে	চতুর্দ্দিকে	১৬৪	...	২০
প্রভৃতি	প্রভৃতির	১৬৪	...	২৩
প্রচীন	প্রাচীন	১৬৬	...	১৪
দেবাদিব	দেবাদিদেব	১৬৭	...	৪
নাবিবার	নামিবার	১৭৯	...	১২
পশ্চিমদিগের	পশ্চিমদিকের	১৮১	...	২৪
প্রথমতঃ	প্রসঙ্গতঃ	১৯৩	...	২১
কর্ম্মধারায়	কূর্ম্মধারায়	১৯৮	...	৬
স্থানকালেই	স্নানকালেই	২০৬	...	৪

পাতা মুড়িবেন না।

হিমালয়ে পাঁচ ধাম

প্রথম পর্ব্ব

হরিদ্বার

বৈশাখের প্রচণ্ড উত্তাপ হইতে অব্যাহতিলাভের আশায় কয় জনে মিলিয়া আমরা বেশ একটু ষড়যন্ত্র রচিয়া তুলিলাম। পাণ্ডা হইলেন আমারই এক বন্ধুপত্নী কলিকাতা কাশীপুরনিবাসী জমীদার বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহধর্ম্মিণী। এবারের গরম তিনি পাহাড়-ভ্রমণে কাটাইতে চাহিলেন। অবশ্য পাহাড়—এ কথাটা এখনকার দিনে আদৌ নূতন নহে। বিংশ শতাব্দীর সভ্যযুগে বাঙ্গালার নব্য ললনারা গ্রীষ্মাতপে পল্লীর 'আম্র-অশ্বত্থ-বটচ্ছায়ায় আর সন্তুষ্ট নহেন! বৈদ্যুতিক পাখার নীচেও তাঁহাদের গরম অসহ্য। তাই প্রতি বর্ষের এ সময়ে তাঁহারা শীতের দেশ দার্জ্জিলিং প্রভৃতি স্থান ভ্রমণে মনের সুখে বাহির হইয়া থাকেন। বন্ধুপত্নীর সেরূপ কোন 'বাতিক' ছিল না। তাই তাঁহার মুখ দিয়া এ কথা শ্রবণে প্রথমে বিস্মিত হইলেও শেষে উদ্দেশ্য বুঝিয়া তাঁহার সৎসাহসের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি নাই। তীর্থযাত্রাই তাঁহার উদ্দেশ্য। হিমালয়ের পাঁচ ধাম দর্শনের জন্য আজ তিনি ব্যাকুল হইয়াছেন। সে পাঁচ ধাম কোথায়? সাধারণতঃ হিন্দুর ঘরে চারি ধাম বলিতে গেলে সকলেই পুরী, রামেশ্বর, দ্বারকা ও বদরীনারায়ণের উল্লেখ করিয়া থাকেন। এ কিন্তু তাহা নহে। এ যে সেই সুদূর যমুনোত্তরী,

গঙ্গোত্তরী, ত্রিযুগীনারায়ণ, কেদারনাথ ও বদরীনারায়ণ—উত্তরাখণ্ডের এই প্রধান প্রধান পাঁচটি দুর্গম তীর্থ।

সঙ্গীর অভাব হইল না। তীর্থযাত্রার দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করিবার ক্ষমতা না থাকিলেও, আজ পর্য্যন্ত এ পথে প্রতি বৎসরেই সহস্র সহস্র যাত্রী অগ্রসর হইতেছেন। সনাতন হিন্দুধর্ম্মের ইহাই হইল চিরনূতনত্ব। আমার এক বৃদ্ধা দিদি এ সুদূর-যাত্রার প্রথম সঙ্গী হইলেন। তার পর আমার পূজনীয় অগ্রজ ও অগ্রজপত্নী ওরফে দাদা ও বৌ-দিদি এবং নিকটসম্পর্কীয় এক জন জ্ঞাতিপত্নী যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সঙ্গী হইতে চাহিলেন। কাযেই বন্ধুপত্নীর এ প্রস্তাবে সম্মতি দিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করিলাম না।

যাত্রার আয়োজন চলিল। এ যাত্রায় শীঘ্রতার আরও একটু উপলক্ষ জুটিল। হরিদ্বারে এবারে অর্দ্ধ-কুম্ভ। তাই চৈত্রশেষে যাত্রা করিলে যাত্রার প্রাক্কালে সেখানে দেশদেশান্তরের সমাগত সাধু মহাত্মার দর্শনলাভ ও সঙ্গে সঙ্গে চৈত্রসংক্রান্তিদিনে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান—এই উভয়বিধ পর্ব্বের একত্রে মণি-কাঞ্চনসংযোগ উপস্থিত মনে করিয়া তীর্থ-যাত্রার আবশ্যক দ্রব্যাদি সত্বর সংগ্রহের নিমিত্ত উদ্যোগী হইলাম।

সকলেই জানেন, কেদার-বদরীর যাত্রাপথে যাত্রিগণের সুবিধার্থে আজকাল দোকান বা চটির সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিয়াছে। ফলে একটু বেশী মূল্য স্বীকার করিলেই যাত্রিগণ অনেক দুর্লভ বস্তুও হয় ত স্থানে স্থানে সংগ্রহ করিতে পারেন। আমাদের যাত্রা হইল স্বতন্ত্র। আমরা হরিদ্বার হইতে মসুরী গিয়া সেখান হইতে প্রথমে যমুনোত্তরী, গঙ্গোত্তরী দর্শন করিয়া তার পর ত্রিযুগীনারায়ণের পথে কেদারনাথে নামিয়া আসিব এবং সেখান হইতে শেষের দিকে বদরীনারায়ণ দেখিয়া বাটী ফিরিব, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলাম।

প্রাক্-কথা

অন্যান্য ধর্ম্মে নানাপ্রকারে স্থান-মহিমা অঙ্গীকৃত হইলেও তীর্থ-তত্ত্ব এবং তীর্থযাত্রার মাহাত্ম্যের সবিশেষ আলোচনা একমাত্র হিন্দু শাস্ত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও খৃষ্টিয়ানের নিকট জেরুজালেম, মুসলমানের নিকট মক্কা-মদিনা, বৌদ্ধের নিকট কপিলাবাস্তু, সারনাথ, বুদ্ধগয়া প্রভৃতি, জৈনগণের নিকট অর্ব্বুদাচল, শত্রুঞ্জয় প্রভৃতি স্থান তীর্থরূপেই পরিগণিত হইয়া থাকে এবং এই সব স্থানে তত্তদ্ধর্ম্মাবলম্বিগণ ধার্ম্মিক প্রেরণাতেই গমন করিয়া থাকেন, তথাপি ইতিহাস, পুরাণ, তন্ত্র, স্মৃতি এবং অন্যান্য শাস্ত্রীয় গ্রন্থে তীর্থযাত্রার যে প্রকার গৌরব কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং তীর্থের স্বরূপ, যাত্রাপ্রণালী, তীর্থকৃত্য, তীর্থের প্রকার-ভেদ, যাত্রার অধিকার প্রভৃতি যাবতীয় আনুষঙ্গিক বিষয় যত সূক্ষ্ম এবং বিস্তৃতভাবে বিবৃত হইয়াছে, অন্যত্র সেরূপ পরিদৃষ্ট হয় না।

যাঁহাকে আশ্রয় করিলে জীব দুঃখ ও তাপের রাজ্য হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে, তাহাই তীর্থপদবাচ্য। ব্যাপকভাবে দেখিতে গেলে যাহা হইতে চিত্তপ্রসাদ ও জ্ঞানসম্পত্তি অধিকৃত হয়, তাহাই তীর্থ। এইজন্য শাস্ত্রে গুরুকে তীর্থ বলা হইয়াছে। মহাভারতে সত্য, ক্ষমা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ভূতদয়া, সরলতা, দান, দম, সন্তোষ, ব্রহ্মচর্য্য, প্রিয়বাদিতা, জ্ঞান, ধৃতি, তপস্যা প্রভৃতি চিত্তধর্ম্মকে তীর্থরূপে বর্ণনা করিয়া পরে বলা হইয়াছে "তীর্থাণামপি তত্তীর্থং বিশুদ্ধির্ম্মনসঃ পরা"। পৃথিব্যাদি লোকমধ্যেও এমন সকল স্থান আছে—যাহারা স্বভাবতঃ ও আগন্তুক কারণ বশতঃ পবিত্র ও পবিত্রতা-সম্পাদক। সেইজন্য ঐ সকল স্থানকে ধর্ম্মগ্রন্থে তীর্থ বলিয়া অভিহিত করা হয়। "যথা শরীরস্যোদ্দেশাঃ কেচি-ন্মেধ্যতমাঃ স্মৃতাঃ। তথা পৃথিব্যা উদ্দেশাঃ কেচিৎ পুণ্যতমাঃ স্মৃতাঃ।

যেমন শরীরের কোন কোন অংশ সাত্ত্বিক উপাদানের আধিক্য বশতঃ স্বভাবতঃই অত্যন্ত পবিত্র, তদ্রূপ পৃথিবীর কোন কোন প্রদেশ সত্ত্বোৎকর্ষবশতঃ অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অধিকতর পবিত্র। এই পবিত্রতা মূলতঃ সত্ত্বগুণের বৈশিষ্ট্যবশতঃ হইলেও বহিরঙ্গভাবে ভূমি অথবা জলের অলৌকিক স্বভাবসিদ্ধগুণবশতঃ হইতে পারে এবং মুনি, ঋষি ও সিদ্ধ যোগিগণের তত্তৎস্থানের সহিত সম্বন্ধবশতঃও হইতে পারে।

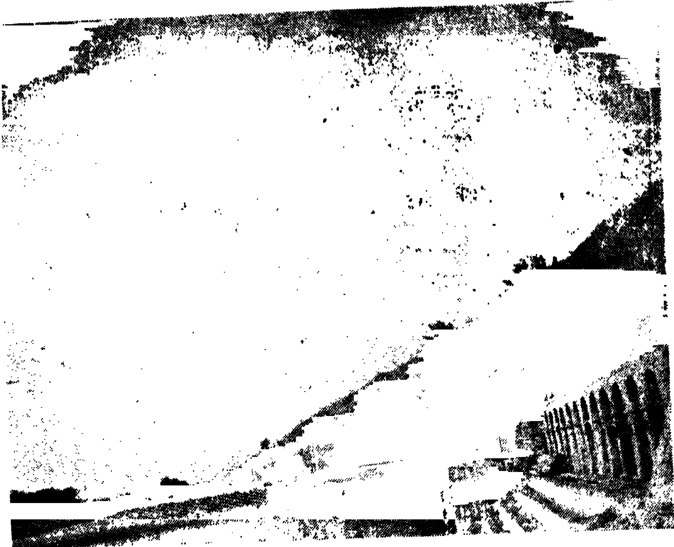
"প্রভাবাদদ্ভুতাদ্ ভূমেঃ সলিলস্য চ তেজসা।
পরিগ্রহান্মুনীনাঞ্চ তীর্থাণাং পুণ্যতা স্মৃতা।"

অতি প্রাচীনকালে যজ্ঞাদি সম্পাদনের দ্বারা মনুষ্য স্বাভিপ্রেত উত্তম ফল লাভ করিত, কিন্তু কালধর্ম্মবশতঃ যজ্ঞাদি সাধন বর্ত্তমান সময়ে সকলের পক্ষে সুসাধ্য নহে। কারণ, যে সকল বহুমূল্য উপকরণ ও বিচিত্র সম্ভার ব্যতিরেকে যজ্ঞ সিদ্ধি হইতে পারে না, তাহা অল্পবিত্ত সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে সংগ্রহ করা কঠিন। এইজন্য লোকহিতের উদ্দেশ্যে ঋষিগণ তীর্থাভিগমনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বস্তুতঃ তীর্থযাত্রা অতি সাধারণ দরিদ্র ব্যক্তিও অল্পায়াসে সম্পন্ন করিতে পারে এবং তাহার ফলও অতি মহৎ। "অগ্নিষ্টোমাদিভির্যজ্ঞৈরিষ্ট্বা বিপুলদক্ষিণৈঃ। ন তৎফলমবাপ্নোতি তীর্থাভিগমনেন যৎ" (মহাভারত)।

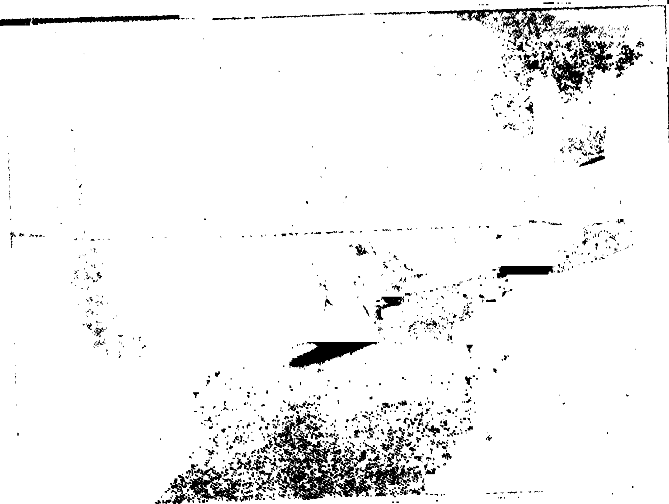
শাস্ত্রানুসারে চারি বর্ণ ও চারি আশ্রমের সকলেরই তীর্থযাত্রার অধিকার রহিয়াছে।

তীর্থফলের বর্ণনাপ্রসঙ্গে শাস্ত্রকারগণ মুক্তকণ্ঠে পাপীর পাপক্ষয় ও শুদ্ধাত্মার স্বর্গাদি উত্তম গতিলাভ বর্ণনা করিয়াছেন—তবে সম্যক্ প্রকারে এই ফল প্রাপ্ত হইতে হইলে বিশেষরূপে সংযত হইয়া যথাবিধি তীর্থের সেবা করিতে হয়। হস্তসংযম, পাদসংযম, কাম-ক্রোধাদি অসদ্বৃত্তির পরিত্যাগ, সত্যবাদিতা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা, আত্মবৎ সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি—এই সব তীর্থযাত্রার অঙ্গরূপে শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। বায়ুপুরাণে আছে যে,

১ম পর্ব্ব—



হরিদ্বারে নদীর দৃশ্য



১ম পর্ব্ব—



হৃষীকেশের পথে



স্বর্গাশ্রমের নিকট

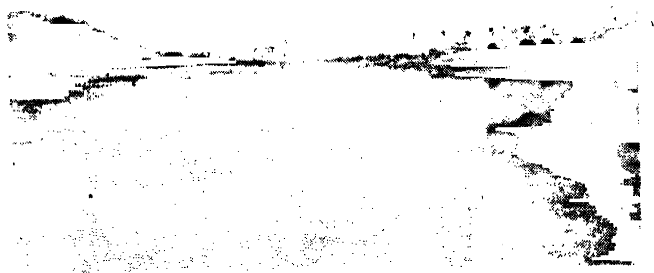
এরূপ করিবার একটু কারণও ছিল। ১৫ই জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত এবারে কালশুদ্ধি না থাকায় অগত্যা উক্ত তারিখের পরেই শ্রীশ্রী৺কেদারনাথ বা শ্রীশ্রী৺বদরীনারায়ণ দর্শন করাই আমাদের অভিপ্রেত ছিল এবং কাল-শুদ্ধির পূর্ব্বে গঙ্গা-যমুনা-স্নানাদি শাস্ত্রমতে দোষদুষ্ট নহে জানিয়া উক্ত সময়ের মধ্যেই গঙ্গোত্তরী-যমুনোত্তরী-যাত্রা শেষ করিয়া লইব, এরূপ স্থির হইয়াছিল। কিন্তু একসঙ্গে ঐ সকল তীর্থের যাত্রা শেষ করা সময়সাপেক্ষ। এ অবস্থায় পথের দুর্গমতা স্মরণ করিয়া জিনিষপত্র সংগ্রহে একটু বেশী সতর্কতা অবলম্বন করা যুক্তিযুক্ত মনে হইয়াছিল।

কলিকাতা হইতে বন্ধুপত্নী অনেক কিছু দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। রান্নার জন্য মাসোপযোগী গুঁড়া মশলা, অরুচি-নিবৃত্তির জন্য রুচিকর সামগ্রী—নেবুর আচার, আমসত্ব, পাঁপর, বড়ী, হরীতকী ও আমলকীর মোরব্বা প্রভৃতি। রোগের পথ্য হিসাবে ঈষবগুল, মিছরী, সাগু, বার্লি, শঠী, এরারুট এবং ঔষধ হিসাবে পুরাতন তেঁতুল, পুরাতন ঘৃত, মকরধ্বজ, মধু, মহালক্ষ্মীবিলাস, ক্রেলু, সোডা, বেড্‌পিল্‌ এবং কয়েক শিশি হোমিওপ্যাথিক ঔষধ—ব্রাইয়োনিয়া, সল্‌ফর্‌, নক্সভমিকা প্রভৃতি, এক কথায় একটি বড় মজবুত স্যুট্‌কেস ভরিয়া যেন একটি ডাক্তারখানা সাজাইয়া আনিয়াছিলেন। পথে চিবাইবার জন্য শুষ্ক খাদ্য পেস্তা, বাদাম, আখরোট, কিসমিস্‌, বাঙ্গালীর খাইতে ও মালিশ করিতে নিত্য আবশ্যক খাঁটি সরিষার তৈল /৩ সের আন্দাজ (একটি মজবুত পেট্রোলের টিনে ভরা) এমন কি, ভিজাইয়া খাইবার শুষ্ক ছোলা পর্য্যন্ত সঙ্গে লওয়া তিনি প্রয়োজন মনে করিয়াছিলেন। খাদ্যদ্রব্য ও ঔষধাদি ব্যতীত প্রতিদিন রাঁধিবার ও খাইবার জন্য প্রয়োজনীয় যথাসম্ভব হাল্কা

বাসনাদি, ১টি ষ্টোভ, ২ বোতল স্পিরিট্, ২টি বাল্‌তি, ২টি হ্যারিকেন্ লণ্ঠন, টর্চ্চলাইট, ব্যাটারী, দেশালাই ও বাতী ২ বাণ্ডিল, ছুরী, কাঁচি, সূচ, সূতা ; বিছানা ঢাকিয়া লইবার জন্য খানিকটা অয়েল ক্লথ ও নিজেকে রৌদ্র ও বর্ষা হইতে বাঁচাইবার জন্য একটি ছাতা ও হাল্কা বর্ষাতি জামা সঙ্গে লইতে পারিলে যাত্রিগণ অতিরিক্ত স্বচ্ছন্দতা অনুভব করেন। দারুণ শীত হইতে রক্ষার জন্য বিছানা ও শীতবস্ত্রের যথেষ্ট আবশ্যক। বিছানার মধ্যে অন্ততঃ তিনখানি গরম কম্বল এবং শীতবস্ত্রের জন্য উলেন্ সোয়েটার, গরম কম্ফর্টার ; টুপী, ষ্টকিং (দুই জোড়া), দস্তানা প্রভৃতি লইতে পারিলে ভাল হয়। স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে প্রত্যেকেরই এক জোড়া রবার-সোল "ক্রেপ শু" না থাকিলে প্রস্তর-বহুল উঁচু-নীচু পার্ব্বত্য পথে এক পদও অগ্রসর হইবার উপায় নাই। যাহা হউক, এই সকল খুঁটিনাটি দ্রব্য-সংগ্রহে বন্ধুপত্নীর আশাতিরিক্ত সতর্কতা দৃষ্টে, নূতন করিয়া আর কিছু সংগ্রহ করিবার প্রয়োজন মনে হইল না। অন্যান্য যাত্রিগণও এইভাবে কতক কতক জিনিষ-পত্রাদি সঙ্গে লইলেন। প্রয়োজন বুঝিয়া আমি কেবল চারি সের আন্দাজ আদা ও দুই সের আন্দাজ তালের মিছরী এই দুইটি জিনিষ (পথে আদৌ পাওয়া যায় না) ক্রয় করিয়াই শেষ ক্ষান্ত দিলাম। মানুষের স্কন্ধে এত অধিক লগেজের বহন সহজসাধ্য নহে, অধিকন্তু বহু ব্যয়-সাপেক্ষ। তাই অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া এই সকল দ্রব্যাদি সহ সকলে মিলিয়া আমরা শুভদিনে হরিদ্বার উদ্দেশে কাশী হইতে যাত্রা করিলাম।

যাত্রার দিনস্থির হইয়াছিল ২৮শে চৈত্র। এখনকার দিনে ট্রেণে উঠিয়া হরিদ্বার যাওয়ায় কোন নূতনত্ব নাই। কাশী হইতে হরিদ্বারের তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া মাত্র ছয় টাকা সাত আনা। আহারান্তে

১ম পর্ব্ব—



লছমন-ঝোলার নিকটে নদীর দৃশ্য



তরতরবাহিনী গঙ্গা (হরিদ্বার)

১ম পর্ব্ব—



হৃষীকেশ—মন্দির

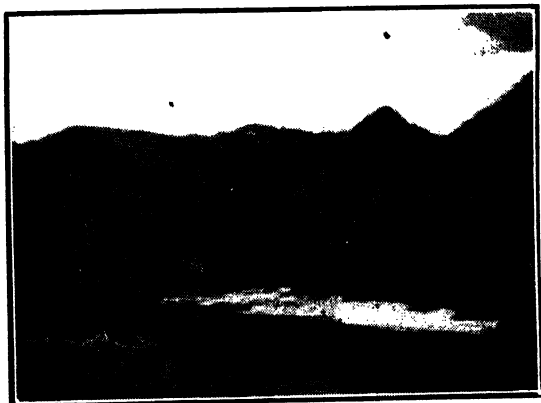
বেলা ১১।২৫ মিঃ সময়ে কেণ্টনমেণ্ট ষ্টেশন হইতে "ডেরাদুন এক্সপ্রেসে" চাপিয়া বসিলাম। পরদিন প্রত্যূষেই একেবারে হরিদ্বারে উপস্থিত। শেষরাত্রি লগেজের পৃষ্ঠে মাথা দিয়া কোন প্রকারে কাটানো হইল। ষ্টেশনে অসম্ভব যাত্রীর ভিড়। সকলেই অর্দ্ধকুম্ভ মেলার দর্শনার্থী। আমরা সংখ্যায় ছিলাম সাত জন। চারি জন স্ত্রীলোক যথা,—বন্ধুপত্নী, জ্ঞাতি-পত্নী, বৌদিদি ও আমার বৃদ্ধা দিদি এবং দাদা, আমি ও বন্ধুপত্নীর আনীত একটি কর্ম্মঠ জোয়ান চাকর (নাম সুরেন) এই তিন জন পুরুষ। এই সাত জনের উপযোগী থাকিবার একটি ঘরও সে সময়ে হরিদ্বারে খালি পাইলাম না। সকল ধর্ম্মশালাই যাত্রি-পরিপূর্ণ। অগত্যা এক মাইল দূরে কনখলে আসিয়া সুরযমল মাড়োয়ারীর একটি প্রকাণ্ড ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লইলাম। প্রত্যেক টঙ্গায় এক টাকা করিয়া ভাড়া গণিতে হইল।

শীতের দেশ হরিদ্বারে ৭।৮ দিন কাটিয়া গেল। প্রথমতঃ সেখানকার দর্শনীয় স্থানগুলি বহুবার দেখা থাকিলেও সকলের আগ্রহে পুনর্ব্বার দেখিয়া লইলাম। বিল্বকেশ্বর, নীলধারা, চণ্ডীর পাহাড়, ব্রহ্মকুণ্ড, দক্ষযজ্ঞের স্থান ও কুশাবর্ত্তঘাট প্রভৃতি কোন তীর্থই বাদ গেল না। পথে-ঘাটে বাজারের সর্ব্বত্রই যাত্রীর মেলা; শুনিলাম, এবার সাত আট লক্ষ নূতন যাত্রীর সমাগম; বড় সহজ কথা নহে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ, পথে যাইতে গেলেই যাত্রিপূর্ণ মোটর, টঙ্গা ও বাসের অবিরাম ঘর্ঘর ও ভোঁ ভোঁ শব্দ এবং ঘাটে ও বাজারে সদা-সর্ব্বদাই অসংখ্য যাত্রীর হুড়াহুড়ি তুই-ই—চলিবার পক্ষে প্রতি পদেই সাবধান করিয়া দিতেছিল। তার পর যে দিনের স্নানের জন্য এই অৰ্দ্ধকুম্ভ যোগে দেশবিদেশ হইতে আগত লক্ষ লক্ষ সাধু ও নর-নারীর কল-কোলাহল, মধুর উৎসব—সে দিনের পবিত্র দৃশ্য এখনও যেন চোখের আগে নূতন হইয়া

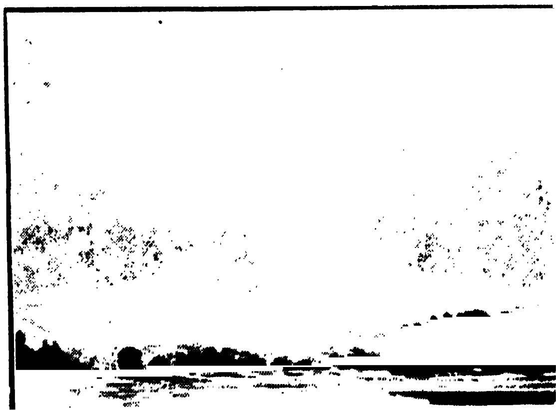
ফুটিয়া রহিয়াছে। চৈত্র-সংক্রান্তির মধুর প্রাতে, হরিপাদ-নিঃসৃত পূত-সলিলা গঙ্গাবক্ষে, ব্রহ্মকুণ্ডতীর্থে সকলেই সে দিন আপন আপন পাপ-তাপ-ক্লিষ্ট শরীর ক্ষণেকের জন্য ডুবাইয়া দিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিয়াছিল। পঞ্জাবপ্রদেশের পবিত্রতম তীর্থ হরিদ্বারে সিন্ধুদেশী ও পঞ্জাবী তীর্থযাত্রীই সমধিক। তাহাদের স্ত্রী-পুরুষের দলই তখন ঘাটটি ঘিরিয়া রাখিয়াছে। প্রতি মুহূর্ত্তেই তাহাদের মুখ হইতে সুরসংযোগে উচ্চারিত "শিবহর-গঙ্গে"র পবিত্র শব্দ প্রতিধ্বনিত হইয়া দর্শকমণ্ডলীকে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে মাতাইয়া তুলিতেছিল। হিন্দুর তীর্থ হরিদ্বারে প্রত্যেকেই যেন ঘর ছাড়িয়া ঘাটে আসিয়া সে দিন সমবেত হইয়াছিল। ভিড় ঠেলিয়া স্নানের জন্য সকলেরই সমান উৎসাহ। সে উৎসাহে প্রত্যেক নরনারীর মুখমণ্ডলে কেবল এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় দীপ্তিপ্রকাশ দেখিলাম। সংসারের পাপ-তাপ দৈন্য ক্ষণেকের জন্য কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল! কৌপীনবস্ত, মুণ্ডিত-মুণ্ড, জটাজূটধারী সাধুসন্তদিগের স্নানের সহিত লক্ষ লক্ষ নর-নারীর একযোগে তীর্থস্থানে, হিন্দুধর্ম্মের চিরন্তন মহিমা কত যুগ ধরিয়া এইভাবে প্রকীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে, কে বলিতে পারে! প্রাতঃকাল হইতে সায়াহ্ন পর্য্যন্ত এ দিনে স্নানের বিরাম ছিল না। অর্দ্ধ-কুম্ভের স্নানার্থী দর্শনার্থী সকলেই যেন ধন্য মনে করিয়া আপন আপন বাসায় ফিরিয়া আসিলেন।

অর্দ্ধকুম্ভের মেলা দর্শন শেষ করিয়া এইবার আমরা পাঁচ ধাম যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত হইলাম। সঙ্গে স্ত্রীলোক, সুতরাং বাহন ইত্যাদি সংগ্রহের আবশ্যক। বন্ধুপত্নী, জ্ঞাতিপত্নী, বৌদিদি ও আমার বৃদ্ধা দিদি এই চারি জনের মধ্যে প্রথমোক্ত তিন জনেই কিঞ্চিৎ স্থূলশরীরা, কেবল বৃদ্ধা দিদিই একমাত্র ক্ষীণদেহা। যাহা হউক, ইহাদের প্রত্যেকেরই ডাণ্ডি করিবার কথা উঠিলে বৃদ্ধা দিদি প্রথমতঃ আপত্তি তুলিলেন।

১ম পর্ব্ব—

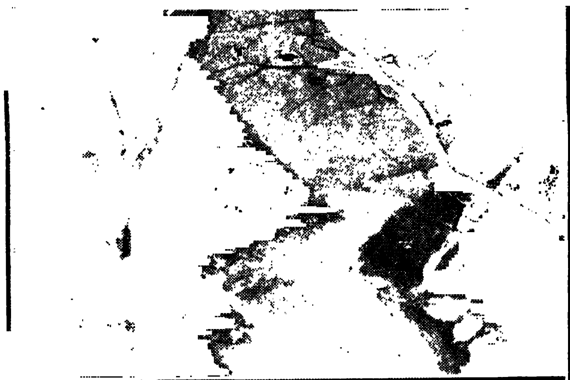


হরিদ্বারের পার্ব্বত্য দৃশ্য

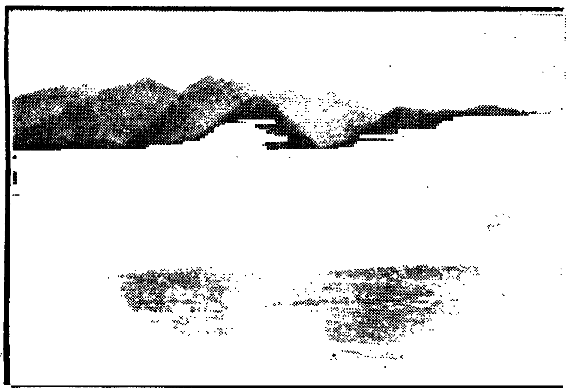


গঙ্গার পর-পারের দৃশ্য—হরিদ্বার

১ম পর্ব্ব—



শিবঘাট—হরিদ্বার



নীচে গঙ্গা প্রবাহিত

মানুষের স্কন্ধে উঠিয়া তিনি তীর্থযাত্রায় আদৌ রাজী নহেন। তাঁহার সাহস দেখিয়া বৌদিদিও সে কথায় সায় দিলেন। বলিলেন, "সকলে একযোগে পদব্রজেই যাত্রা করিব। তবে যদি কোন স্থানে একেবারে অসমর্থ হই, তখন যাহা হয় একটা ব্যবস্থা করিয়া লওয়া হইবে।" কেবল বন্ধুপত্নী ও জ্ঞাতিপত্নী উভয়েই পার্ব্বত্য পথের চড়াই উৎরাই পথে উঠিতে নামিতে আদৌ সমর্থ হইবেন না বুঝিয়া কেবলমাত্র দুই জনের দুইখানি ডাণ্ডি করা সাব্যস্ত হইল।

কেদার-বদরীর যাত্রিগণের জন্য সাধারণতঃ এ পথে "কাণ্ডি" "ঝাঁপান" ও "ডাণ্ডি" এই তিন প্রকার বাহনের ব্যবস্থা আছে। "কাণ্ডি" একটি লম্বা ঝোড়াবিশেষ, সম্মুখদিকে একটু কাটা। ঝোড়ার মধ্যে কম্বলাদি বিছাইয়া যাত্রিগণ ইহার মধ্যে দেহখানি নামাইয়া দেয়, কেবল পা দুখানি বাহিরে থাকে। একটিমাত্র বাহক যাত্রিসহ ঝোড়াটিকে পৃষ্ঠদেশে উঠাইয়া লইয়া চলিতে থাকে। মানুষের বোঝা কম নহে, তায় পার্ব্বত্য প্রদেশের চড়াই-উৎরাই পথ এই ভাবে অতিক্রম করিতে বাহককে প্রতি দশ বারো মিনিট অন্তর ঘর্ম্মাক্তকলেবরে দাঁড়াইতে হয়। শতবার বিশ্রাম লইয়া এইরূপে বাহকের পৃষ্ঠে একভাবে যাত্রিগণ বসিয়া থাকিতে কিরূপ বিরক্তি বোধ করেন, তাহা যাত্রাকালে যাত্রিগণের মুখ দেখিয়াই সকলে অনুমান করিয়া লইতে পারেন। আবার হৃষ্ট-পুষ্ট যাত্রীর পক্ষে কাণ্ডিতে উঠিয়া যাইবার কোন প্রকারে সম্ভব থাকে না।

এই "কাণ্ডি"-নামীয় বাহনের ভাড়া সর্ব্বাপেক্ষা কম, কিন্তু একবারে বৃদ্ধ, খঞ্জ, স্থবির ব্যক্তি ভিন্ন এ প্রকার বাহন ভাড়া করা কোন যাত্রীর পক্ষেই বাঞ্ছনীয় নহে। ইহা অপেক্ষা পদব্রজে যাত্রা করা সর্ব্বপ্রকারে সুবিধাজনক। "ঝাঁপান"-জাতীয় বাহন অনেকটা কাশী অঞ্চলের

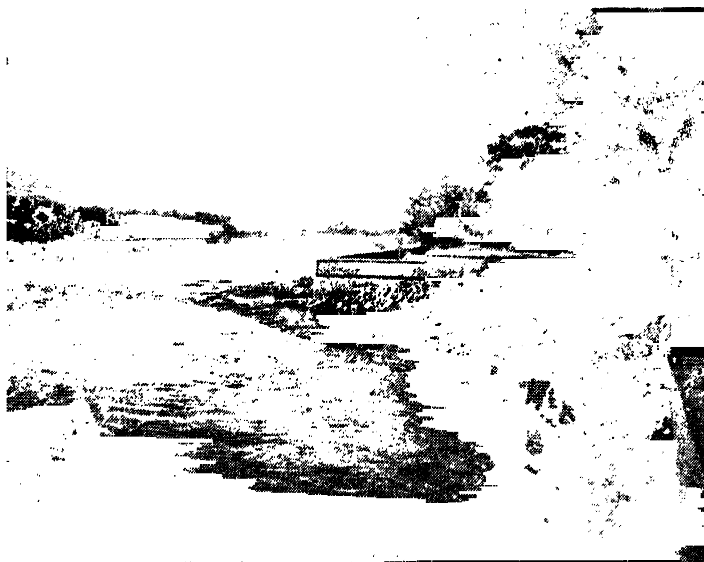
'ডুলীর' মত'। আসনপিঁড়ি দিয়া একভাবে বসিয়া যাইতে হয়, তবে সম্মুখে ও পশ্চাদ্ভাগে দুই জন করিয়া প্রতি ঝাঁপানে মোট চারি জন বাহক নিযুক্ত থাকায় দ্রুতগতিতে চলিয়া থাকে। কেবল ডাণ্ডি অনেকটা "তম্‌জমের" মত। বাহনের মধ্যে ইহাই অপেক্ষাকৃত আরামপ্রদ। চেয়ারের মত পৃষ্ঠদেশে ঠেস দিবার বা পা-দুখানি পাদানীতে নামাইয়া দিবার বেশ ব্যবস্থা আছে। ইচ্ছা করিলে রৌদ্র ও বর্ষার জল হইতে অব্যাহতির জন্য যাত্রিগণ ডাণ্ডি-সংলগ্ন বর্ষাতি কাপড়ের ছাতা মাথার উপরে তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্তমনে চলিতে পারেন। ইহাতেও চারি জন বাহক ; সুতরাং স্বচ্ছন্দে দ্রুতগতি চলিতে পারা যায়। অবশ্য যাত্রীর শরীরের ওজন বেশী হইলে বাহকের সংখ্যাও আরও বাড়াইয়া দেওয়া হয়।

আমাদের দুইখানি ডাণ্ডি করিবার আবশ্যক আছে, জানিতে পারিয়া ডাণ্ডিওয়ালারা পূর্ব্ব হইতেই ভাড়া করিবার জন্য আমাদিগকে উত্ত্যক্ত করিতেছিল। কেদার-বদরী দুই ধাম যাত্রার জন্য ডাণ্ডির ভাড়া সাধারণতঃ ১ শত ১০ টাকা হইতে ১ শত ৩০ টাকা পর্য্যন্ত লাগিয়া থাকে। আমরা একযোগে পাঁচ ধাম যাত্রার ডাণ্ডি ভাড়া করিব শুনিয়া ডাণ্ডিওয়ালার মধ্যে কেহ ৩ শত টাকা, আবার কেহ বা ২ শত ৭৫ টাকা পর্য্যন্ত প্রত্যেক ডাণ্ডি পিছু মজুরী চাহিয়া বসিল। এ টাকা ত নগদ চাহিল, ইহার উপরে আবার প্রত্যেক ধামের "ইনাম" "খিচুড়ী" "চানা" "চবৈনি" প্রভৃতি উপসর্গের বাবদ অতিরিক্ত অনেক কিছু খরচ দিতে হইবে, ইহাও শুনিলাম। পরে সে সমস্ত খরচের বিষয় পাঠকবর্গকে জানাইবার ইচ্ছা রহিল। ডাণ্ডিওয়ালা ছাড়া বোঝার জন্য বোঝাওয়ালারাও আসিয়া জুটিল। প্রতি মণ-পিছু বোঝার জন্য কেহ ৭০ টাকা, আবার কেহ বা ৮০ টাকা পর্য্যন্ত চাহিতে দ্বিধাবোধ করিল না।

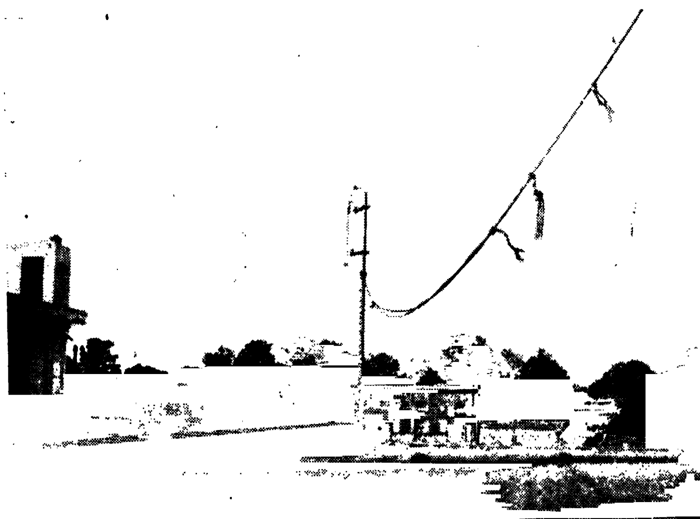
১ম পর্ব্ব—



নীলধারার পার্শ্ব-দৃশ্য



১ম পর্ব্ব—



খরখান দৃশ্য



হরিদ্বার অপেক্ষা হৃষীকেশ প্রভৃতি স্থানে এই সব কুলীর ভাড়া অপেক্ষাকৃত কম হইতে পারে, কেহ কেহ এরূপ অভিমতও প্রকাশ করিলেন।

আমাদের এ যাত্রায় যাইতে হইবে প্রথমে মসূরীর দিকে, যাহার জন্য হরিদ্বার হইতে রেলপথে ডেরাদূনে নামিবার কথা। আবার পাঁচ ধাম দর্শনান্তে অন্য পথ ধরিয়াই (এ পথ নহে) বাটী ফিরিব; সুতরাং এই সময়ের মধ্যেই হৃষীকেশ, লছমনঝোলা প্রভৃতি দর্শনীয় স্থান আমরা দেখিয়া লওয়া আবশ্যক মনে করিয়াছিলাম। তার পর ডাণ্ডি বা বোঝাওয়ালাদিগের সন্ধান ওখানেই মিলিতে পারে। ভাবিয়া চিন্তিয়া এক জন ট্যাক্সীওয়ালার সহিত এককালীন ১৪ টাকা ভাড়া স্বীকারে পরদিন প্রত্যূষেই হৃষীকেশ উদ্দেশেই যাত্রার কথাবার্ত্তা স্থির হইল।

হরিদ্বার হইতে প্রায় চৌদ্দ মাইল দূরে হৃষীকেশ। তরতরবাহিনী জাহ্নবীর তীরে তীরে এই পথ বরাবর উত্তরাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। দু-ধারেই সমুন্নত ধূসর পর্ব্বতমালা। প্রকৃতির রাজত্বে এখান হইতেই যাত্রীদের চিত্ত সহজেই যেন অন্য দিকে ধাবিত হয়। সমতলদেশবাসী বাঙ্গালীর ত কথাই নাই। চোখের সম্মুখে পাহাড়ের পর পাহাড়ের এইরূপ অভিনব স্তর সুসজ্জিত দেখিলে সাধারণতঃ ইহাই মনে হইয়া থাকে, এ সকল পাহাড়ের অন্তরালে না জানি অজানা দেশের কতই না নূতন কিছু দেখিবার বস্তু আছে। হিমালয় স্বর্গের ছবি, দেবতার লীলাভূমি, প্রকৃতির চির-মনোরম স্বভাব-সুন্দর অট্টালিকা-বিশেষ বলিয়াই দর্শনমাত্রে মনের মধ্যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উথলিয়া উঠে। এ আনন্দ হৃদয় দিয়াই অনুভব করিবার কথা।

আমরা যাত্রী ছিলাম মোট ছয় জন। সুরেন ওরফে 'সুরো' চাকরকে ধর্ম্মশালায় রাখিয়া আসিয়াছিলাম। দ্রুতগতি মোটর হুহু শব্দে আগে চলিতেছিল। প্রভাতে হরিদ্বার ছাড়িয়া বেলা ৮টা আন্দাজ সময়ে

সাত মাইল দূরে "সত্যনারায়ণজী"র মন্দির-সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। মন্দিরটি কৃত্রিম উপায়ে দূর হইতে আনীত জলের দ্বারা চারিদিকেই বেষ্টিত। মধ্যস্থলে সত্যনারায়ণজীর মূর্ত্তি। প্রকৃতির নির্জ্জন ক্রোড়ে এই সুরম্য পর্ব্বত-প্রদেশে পথিপার্শ্বে অবস্থিত সত্যনারায়ণজীর পবিত্র মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আগে চলিলাম। বেলা নয়টা আন্দাজ সময়ে আমাদের মোটর 'হৃষীকেশে' পৌঁছিল। কিছুকালের জন্য মোটরকে এখানে ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

হিন্দুর চক্ষুতে হৃষীকেশ অতি পবিত্র স্থান। হিমগিরি-নিঃসৃত গঙ্গার পাদদেশে এই তপোভূমি ক্রমশঃই যেন সহরে পরিণত হইতে চলিয়াছে। সাধু-সন্তদিগের অগণিত বাসভূমি, কালী কমলীওয়ালার প্রকাণ্ড ধর্ম্মশালা, সদাব্রত, দোকান-হাট, পোষ্ট আফিস প্রভৃতি বিদ্যমান থাকায় এক হিসাবে স্থানের ক্রমোন্নতি সূচিত হইতেছে। ত্রিধারায় স্নান, হৃষীকেশ ও ভারতজীর মন্দির এখানকার মুখ্য তীর্থ। যথারীতি স্নান-দর্শনাদি শেষ করিয়া ডাণ্ডি ও বোঝার কুলী অনুসন্ধানে কিছুক্ষণ বৃথা সময় নষ্ট করিলাম। কারণ, অনেক স্থলেই দেখিলাম, হরিদ্বার হইতে আগত কুলীরাই এখানে উপস্থিত হইয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে কেহই হরিদ্বার অপেক্ষা কম দর চাহিল না। অগত্যা হৃষীকেশ ছাড়িয়া এক্ষণে লছমনঝোলা উদ্দেশে মোটরে উঠিলাম। বেলা এগারোটা আন্দাজ সময়ে পাহাড়ের গা দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া, আমাদের মোটর একেবারে লছমনজীর মন্দিরের ঠিক উপরিভাগ পর্য্যন্ত আসিয়া শেষবার নামাইয়া দিল। বলা বাহুল্য, এই পর্য্যন্তই তাহার গতি নির্দ্দিষ্ট আছে।

প্রথমেই আমরা লছমনজীর মন্দিরে ক্ষণকালের জন্য বিশ্রাম লইলাম। মন্দিরে যথেষ্ট ভিড়। অর্দ্ধকুম্ভ দেখিয়া সে সময়ে কত দেশের

কত যাত্রীই এখানে দর্শনার্থী হইয়া আসিয়াছে। সহজ সুগম পথ। এখনকার দিনে এ পর্য্যন্ত আসা-যাওয়ায় কোন চিন্তাই নাই। চিন্তা কেবল, এখান হইতে আগে যাইবার পথে! সে পথের দুর্গমতা, কঠিনতা তুচ্ছ করিয়াই যাত্রিগণ বদরী-কেদার দর্শনে অগ্রসর হন। আমাদের যাত্রা যদিও এদিক্ দিয়া নহে, তথাপি এখানে আসিয়া সেই চিন্তাই মনকে আলোড়িত করিয়া তুলিল। অন্যমনস্কতার সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি পড়িল হঠাৎ মন্দিরের বহির্দরজার দিকে। মানুষের পৃষ্ঠে দণ্ডায়মান এক ঝোড়ার মধ্য হইতে জনৈক বৃদ্ধা যাত্রী ধীরে ধীরে জমীতে নামিলেন। বৃদ্ধাটি গুর্জ্জরদেশীয়া। দারুণ রৌদ্রে বাহকের শরীর এক দিকে যেমন অসম্ভব পরিশ্রান্ত ও গলদ্‌ঘর্ম্ম, অন্য দিকে বৃদ্ধাটিও সেই ঝোড়ার মধ্যে একভাবে বসিয়া বসিয়া আড়ষ্টপ্রায়, মাটীতে দাঁড়াইবার জন্য চঞ্চল ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। উভয়েরই সমান দুর্দ্দশা। এই ঝোড়াজাতীয় অপরূপ বাহনকেই এ দেশের লোকে "কাণ্ডি" কহে। পদব্রজে যাইতে যাঁহারা নিতান্ত অক্ষম অথচ অতিরিক্ত অর্থব্যয়ে অসমর্থ, তাঁহাদের জন্যই এ দুর্গম পথের ইহাই একমাত্র অবলম্বন। বাহক, বাহন ও যাত্রীর অবস্থা স্বয়ং প্রথম প্রত্যক্ষ করিয়া মনে মনে শিহরিয়া উঠিলাম! অবস্থাবিশেষে আমাদিগকেও কি এই কাণ্ডির আশ্রয় লইয়া চলিতে হইবে? কি জানি, অর্থ-ব্যয় করিয়াও গৃহী যাত্রীর এরূপ দুর্গতি ভোগ না হইলে বুঝি বা মহাপ্রস্থানের পথ অগম্যই থাকিয়া যায়! বেলা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিতেছে দেখিয়া সকলেই যথা শীঘ্র দর্শনাদি শেষ করিয়া লইলাম। মন্দির-বাহিরে কয়েকখানি দোকান পার হইতেই সম্মুখে লছমনঝোলার পুল দেখা দিল। গঙ্গাবক্ষে নব-নির্ম্মিত সুন্দর দোদুল্যমান লৌহ-সেতু। পূর্ব্বে এইস্থানে গঙ্গা পারাপারের জন্য একমাত্র বাঁশের ঝোলা বিদ্যমান ছিল। শুনিয়াছি, সে সময়ের ঝোলা পার হইতে যাত্রিগণ বিলক্ষণ

প্রমাদ গণিতেন। যাত্রীর সুবিধার্থে দেখিতে দেখিতে, ঝোলার পরিবর্ত্তে লৌহ-সেতু নির্ম্মিত হইল। মায়ের কোপে পড়িয়া সে লৌহ-সেতুও মধ্যে একদফা ভাঙ্গিয়া যায়! এমন কি, সেতুর চিহ্ন পর্য্যন্ত ছিল না। সে দুর্ব্বৎসরে আমরাও কয় জনে লছমনজীর মন্দির পর্য্যন্ত আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছি। দেখিলাম, সে সময়ের তুলনায় মা আজ বিলক্ষণ শান্তপ্রকৃতি। তখনকার প্রবল জলপ্লাবনে শুধু এই সেতু নহে, শুনিয়াছি, রাত্রিমধ্যে দুই শতাধিক সাধু জীবন্ত অবস্থায় মায়ের ক্রোড়ে সমাধিলাভ করিয়াছিলেন। আজ কয়েক বৎসরের মধ্যে আবার সেইখানে এই লৌহ-সেতু নির্ম্মিত হইয়া যাত্রিগণকে মহোল্লাসে পার করিয়া দিতেছে।

পুলের উপরে আসিয়া চকিত-নেত্রে বার বার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম। কি সুন্দর! প্রকৃতি-বক্ষে পবিত্রতার রূপ সবই যেন এখানে সজীব ও নূতন! মায়ের দুই তীরেই পাহাড়ের কোলে কোলে কেবল অগণিত মন্দির ও দেবালয়। শঙ্খধ্বনি, শিঙারব, গেরুয়াধারী, কৌপীন-বন্ত, সবই যেন একাধারে প্রকৃতির পূজায় চারিদিক চির-মুখরিত করিয়া রাখিয়াছে, ত্রিতাপ-দগ্ধ মানবের পক্ষে জুড়াইবার আর কোথাও স্থান নাই! এখন হইতেই যেন নিত্য সত্য শান্তির পথ উন্মুক্ত হইয়াছে।

পুণ্যতোয়ার তরঙ্গ-ভঙ্গে কতই না পবিত্র উচ্ছ্বাস! হিমগিরি-নির্ঝরিণী পূতপ্রবাহিণী মা আমার এখান হইতেই যেন সুরনর-মুনি-বন্দিতা দেবতার পূজামাল্যে প্রীতা হইয়া মহোল্লাসে "হর-হর" শব্দে ছুটিয়া চলিয়াছেন একটানে, ধরার দিকে। সকলেরই মুখে হর্ষদীপ্তি ও উৎসাহ। সে উৎসাহে সকলেই আমরা "স্বর্গাশ্রম" দেখিবার মনস্থ করিলাম। এখান হইতে প্রায় মাইলখানেক পদব্রজে যাইতে হইবে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা বা দ্বিপ্রহরের দারুণ রৌদ্র কাহাকেও কাতর করিল না। পুল পার হইয়া ধীরে ধীরে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইলাম।

কলিতে সাধুসঙ্গ দুর্ল্লভ, কিন্তু মনকে সান্ত্বনা দিবার শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট সহজ সিদ্ধান্ত "কলৌ স্থানানি পূজ্যন্তে" এ কথা বিস্মৃত হইলে মানুষ কখনই দুর্গম পথে তীর্থ-দর্শনে অগ্রসর হইত না। বিশেষতঃ, যে উদ্দেশ্য লইয়া আজিকার এ সুদূর-যাত্রায় বহির্গত হইয়াছি, তাহার তুলনায় এ সময়ের এতটুকু ক্লেশ মনকে অবিচলিত রাখিয়াই আমাদিগকে আগে লইয়া চলিল। কিছুদূর যাইতে না যাইতেই গঙ্গার তীরে সাধুদিগের অগণিত "আশ্রম-কুটীর" দেখিতে পাইলাম। অনেক স্থলেই এই কুটীরগুলি পাহাড়ী লতাপাদপে বিলক্ষণ বেষ্টিত থাকায় 'স্বর্গাশ্রম' আশ্রমের মতই রমণীয় ভাবে শোভা পাইতেছিল। মনে হইল, এ নির্জ্জন রমণীয় স্থান, সংসারের কল-কোলাহল হইতে যেন অনেক দূরে; মায়া-মোহান্ধ মানবের জন্য কখনই নির্ম্মিত নহে। শ্রদ্ধা-সম্ভ্রমচিত্তে স্বর্গাশ্রমের কতক কতক স্থান পরিদর্শন করিয়া বেলা আড়াইটা আন্দাজ সময়ে লছমনজীর মন্দিরে পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে এইবার সঙ্গে আনীত ফল-মূল-মিষ্টাদি দ্বারা এখানেই জলযোগ শেষ করিয়া আবার মোটরে উঠিলাম এবং সন্ধ্যার প্রাক্কালে ধীরে ধীরে কনখলের ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া আসিলাম।

পরদিন প্রাতেই হরিদ্বার বাজারে গিয়া উপস্থিত হইলাম। উদ্দেশ্য, দুইখানি ডাণ্ডি খরিদ করিয়া কুলী প্রভৃতি একেবারে ঠিক করিয়া ফেলিব। বিলম্বে সকলেরই ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতেছিল।

অর্জ্জুন সিং নামক এক জন দোকানদারের নিকট বিক্রয়ার্থে বহু ডাণ্ডি প্রস্তুত ছিল। আমাদের সহযাত্রিদ্বয়ের শরীরের ওজনমত সেখানে দুইখানি মজবুত ডাণ্ডির দর করিলাম। প্রতি ডাণ্ডি পিছু দোকানদার দশ টাকা হিসাবে মূল্য চাহিল। ইহার কমে ভাল ডাণ্ডি

পাওয়া যায় না জানিতে পারিয়া আমরা ঐ দরই স্বীকার করিয়া লইলাম। দোকানদার লোকটি বেশ সজ্জন বলিয়া মনে হইল। কথা-প্রসঙ্গে "আমরা পাঁচ ধাম যাত্রার সংকল্প করিয়াছি, ডাণ্ডির কুলী প্রভৃতি এখনও ঠিক হয় নাই," এ সকল বিষয় জানিয়া শুনিয়া লোকটি নিজেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ডাণ্ডিওয়ালার ব্যবস্থা করিয়া দিতে অগ্রসর হইলেন। অনেকগুলি কুলীকে ডাকাইয়া দর করা হইল, শেষ তাঁহারই মধ্যস্থতায় ফতে সিং নামক এক জন ডাণ্ডিওয়ালা প্রতি ডাণ্ডি পিছু এককালীন দুই শত কুড়ি টাকা মজুরী লইবে, ইহা স্বীকার করিয়া আমাদের সহিত পাঁচ ধাম যাইতে চাহিল। উহা ব্যতীত প্রতিদিনের "চানা চবৈনি" এবং প্রত্যেক ধামের "খিচুড়ী-ইনাম" প্রভৃতি বাবদ অতিরিক্ত যাহা লাগে (সাধারণতঃ যাত্রীরা যাহা দিয়া থাকেন), তাহাও দিতে হইবে। একসঙ্গে পাঁচ ধাম যাত্রা একাধারে সময় ও যথেষ্ট শ্রম-সাপেক্ষ জানিয়া ডাণ্ডিওয়ালার কথামত সকল দাবীই স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইলাম। এই-রূপে ডাণ্ডি ও ডাণ্ডিওয়ালার ব্যবস্থা ঠিক হইয়া গেল। কথাবার্ত্তা 'পাকা' স্বরূপ ফতে সিং সেখানকার প্রথানুযায়ী আমাদের হস্তে দুই টাকা অগ্রিম দিয়া চুক্তিপত্র লিখাইয়া লইল এবং নিজেও স্বীকার-পত্র লিখিয়া দিল। মসূরী হইতে প্রথমে যমুনোত্তরী, যমুনোত্তরী হইতে গঙ্গোত্তরী হইয়া ক্রমশঃ ত্রিযুগীনারায়ণের পথে আসিয়া শেষের দিকে কেদারনাথ, বদরীনারায়ণ দর্শন করাইবে এবং "মেইলচৌরী" আনিয়া ডাণ্ডি ছাড়িয়া দিবে, চুক্তিপত্রে ইহাই লিখিত হইয়াছিল।

এই সকল ব্যাপারে সহায়তা করিবার জন্য দোকানদারকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিলাম। ফতে সিং সম্বন্ধে তিনি উচ্চ সার্টিফিকেট না দিলে হয় ত সে দিন আমাদের ডাণ্ডিওয়ালার সহিত পাকা ব্যবস্থা হইতে

পারিত না। ডাণ্ডি খরিদ ব্যাপারেও আমরা তাঁহার নিকটে আশাতিরিক্ত উপকার পাইলাম। আমাদের মসূরী হইতে প্রথম যাত্রার কথা শ্রবণে তিনি "রাজপুর" গ্রাম হইতে দুইখানি ডাণ্ডি দিবার ব্যবস্থা করিলেন। রাজপুর মসূরী যাইতে পথেই পড়ে। সে স্থানে ইঁহার নিজের বাড়ী এবং ডাণ্ডিরও কারখানা আছে। এইরূপে হরিদ্বার হইতে ডেরাদুন্ পর্য্যন্ত ডাণ্ডি দুইখানির রেলমাশুল বাঁচিয়া গেল। দোকানদারকে দশ টাকা অগ্রিম দিয়া চিঠি লিখাইয়া লইলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে ফতে সিংকে ডাণ্ডি ও কুলী প্রভৃতি সংগ্রহের জন্য অগ্রেই রাজপুরে যাওয়া আবশ্যক জানিয়া তদ্দণ্ডেই বিদায় দিলাম। পরদিন মসূরীর পথে রাজপুরে গিয়া আবার মিলিত হইব, এইরূপ কথাবার্ত্তা স্থির রহিল।

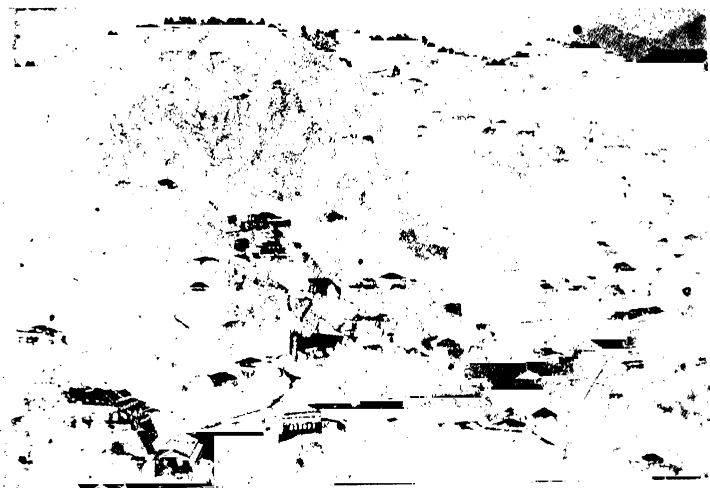


মসূরী

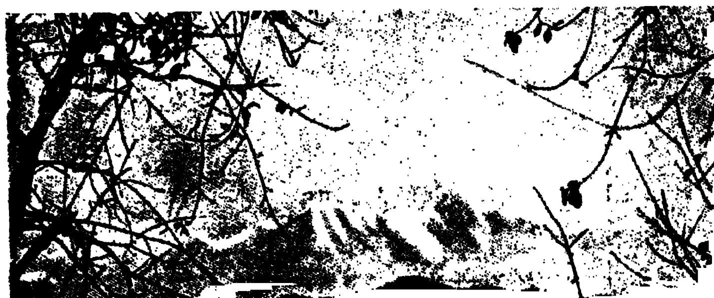
হরিদ্বার হইতে ডেরাডুন পর্য্যন্ত প্রত্যেকের তৃতীয় শ্রেণীর রেল-ভাড়া এক টাকা মাত্র। আমরা লগেজপত্র সহ পরদিন প্রভাতে হরিদ্বার হইতে ৯।৭ মিঃ ট্রেণে উঠিয়া অল্পকালমধ্যেই ডেরাডুনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখান হইতে মসূরী যাইবার মোটর-লরীর যথেষ্ট সুবন্দোবস্ত আছে। আমরা মোটের উপর সাত জন যাত্রী হইলেও সঙ্গে বিস্তর লগেজপত্র থাকায় একখানি পূরা বারো 'সিটের' লরীই ভাড়া করিয়া লইলাম। "United Motor Transport Comp." নামক জনৈক ফারমের এজেন্টের সহিত এ বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইল। তিনি মসূরী তক ভাড়া ১৫৲ টাকা এবং ঐ স্থানে থাকিবার অতিরিক্ত টোল বা পথকর ১॥০ টাকা, একুনে ১৬॥০ টাকা অগ্রিম লইয়া রসিদ দিলেন এবং যাইবার কালে আমাদের কথামত তিনি ড্রাইভারকে রাজপুর গ্রামে কিছুক্ষণ দাঁড়াইবার জন্য বলিয়া দিয়া আবার অন্য যাত্রীর উদ্দেশে সরিয়া গেলেন।

প্রশস্ত রাজপথ ধরিয়া আমরা সহরের মধ্য দিয়া আগে চলিলাম। দুধারেই সুরম্য বাস-ভবন ও সহর-বাসীর রুচি ও প্রয়োজনসম্মত নানা দ্রব্যের দোকান-পসারগুলি অতিক্রম করিতে বেশ একটা কৌতূহল জন্মিয়াছিল। বাজারে ফলমূল, যথা—বৃহদাকার পেঁপে ও কলা, কমলালেবু, আপেল প্রভৃতি কিছুরই অভাব নাই। নিজেদের প্রয়োজনমত এখান হইতেই কিছু ফলমূল ক্রয় করিয়া লওয়া হইল। তার পর সহরবাসীর কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি দূরে রাখিয়া ত্বরিত-গতি

২য় পর্ব্ব—



মুসৌরী—পাহাড়ের সাধারণ দৃশ্য



মুসৌরী হইতে চিরতুষারাবৃত পর্ব্বতরাজি

২য় পর্ব—



মুসৌরী ডল হাসপাতাল

আমরা অল্পক্ষণমধ্যেই সাত মাইল দূরে রাজপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। রাজপথের বামদিকেই অর্জ্জুন সিংএর ডাণ্ডির কারখানা। পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট কথামত ফতে সিং (আমাদের ডাণ্ডিওয়ালা) এখানেই উপস্থিত ছিল এবং দেখিয়া শুনিয়া সে নিজের পছন্দমত (কারণ, তাহারাই বহন করিয়া লইয়া যাইবে) দুইখানি ডাণ্ডি ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল।

ডাণ্ডি লইয়া আমরা উহার বাকী দাম এখানেই দোকানদারকে চুক্তি করিলাম। ডাণ্ডি দুইখানি ফতে সিংএর জিম্মায় রাখিয়া দেওয়া হইল। মসূরী লইয়া যাইতে প্রত্যেক ডাণ্ডি পিছু ১।।০ টাকা হিসাবে অতিরিক্ত টোল বা পথকর লাগিবে জানিয়া তিনটি টাকা ফতে সিং-এর হাতে দিয়া আমরা এখান হইতে আগে যাইবার উদ্যোগী হইলাম।

এই রাজপুর গ্রামেও কুলীর এজেন্সি আছে। বলা বাহুল্য, আমাদের ডাণ্ডিবহনের অধিকাংশ কুলীই ফতে সিং এখান হইতে সংগ্রহ করিয়াছিল। তাহাদিগকে লইয়া ডাণ্ডিসহ অদ্যই সন্ধ্যাকালে সে আবার মসূরীতে আমাদের আড্ডায় পৌঁছিতেছে, এ কথা জানাইলে, আমরা "বোঝার কুলীর জন্যও এখানে কতকটা সন্ধান করিও" এ কথা পুনঃপুনঃ জানাইয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিলাম।

এখান হইতে মসূরী সাত মাইল মাত্র—যাইবার জন্য সাধারণতঃ দুইটি পথ নির্দ্দিষ্ট আছে। একটি পুরাতন; সে পথের চড়াই কঠিন, বিশেষতঃ সমতলদেশবাসীর পক্ষে ডাণ্ডি বা ঘোড়ার সাহায্য না লইয়া এ পথ অতিক্রম করা আদৌ সহজসাধ্য নহে। আর একটি পথ নূতন অর্থাৎ গত ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছে। এ পথটিতে প্রায় মসূরীর কোল "Sunny View" পর্য্যন্ত যাত্রিগণ মোটরযোগে অনায়াসে যাইতে পারেন। সহজ সুগম সুন্দর পথ পাহাড়ের গা দিয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া এমনভাবে উপরে লইয়া যাওয়া হইয়াছে যে,

যাত্রিগণ মোটরে বসিয়া বসিয়াই আশে-পাশের পাহাড়ে উঠিবার নয়নানন্দকর নূতনতর দৃশ্যগুলি দেখিতে দেখিতে, যুগপৎ বিস্মিত ও অভিভূত হইয়া পড়েন। আমরা এই পথ ধরিয়াই চলিতেছি। ক্রমশঃ আমরা সমতল পথ পশ্চাতে ফেলিয়া উঁচু পথের পথিক হইলাম। দূর হইতে এইবার ধূসরবর্ণ সুবৃহৎ পর্ব্বতের গায়ে গায়ে ছোট ছোট খেলনার মত অগণিত শ্বেতবর্ণের সুসজ্জিত গৃহগুলি চোখের সম্মুখে "আশমান কুটীরের" ন্যায় মনে হইতে লাগিল। উহাই হইল মসুরীর চির-মনোরম শৈলনিবাস। ইংরাজরা ইহার সুন্দরতায় "Queen of the hill stations" অর্থাৎ পার্ব্বত্য দেশের রাণী বলিয়া ইহাকে আখ্যা দিয়াছেন। কম গৌরবের কথা নহে। আর অল্পক্ষণমধ্যেই আমরা ওখানে উপস্থিত হইব জানিয়া আনন্দে অধীর হইলাম। সঙ্গে সঙ্গে এই আকাশস্পর্শী পাহাড়ের উপরে কিরূপে এই মোটর-যান সকলকে লইয়া উঠিয়া চলিবে, সে চিন্তাই ক্ষণকালের জন্য প্রত্যেককে বিস্ময়বিমুগ্ধ করিল। বেলা ১টা আন্দাজ সময়ে এই পাহাড়ের নীচে একটি গেটের সম্মুখে আসিয়া আমাদের মোটর একবারে দাঁড়াইয়া পড়িল।

প্রত্যেক মোটরকেই এখানে দাঁড়াইতে হয়। জনৈক লাল পাগ্‌ড়ী-ধারী পুলিস সর্ব্বদাই এখানে মোতায়েন থাকে। মোটর আসিলে ইনি টেলিফোন্ সাহায্যে, উপর হইতে কোন মোটর নীচে নামিতেছে কি না, জানিয়া তবে মোটর ছাড়িবার হুকুম দেন। পাশেই টেলিফোনের একটুকু আচ্ছাদনযুক্ত স্থান। পাশাপাশি দুই মোটরের আসাযাওয়ার সুবিধা নাই বলিয়াই এরূপ ব্যবস্থা হইয়া থাকিবে।

প্রায় তিন কোয়ার্টার কাল আমরা এখানে অপেক্ষা করিতে বাধ্য হইলাম। পাশে দু'একখানি দোকানঘর বলিয়াই মনে হইল। জল

পাওয়া যাইবে জানিয়া আমরা সকলেই মোটর হইতে নামিয়া নিকটস্থ একটি বৃক্ষতলের ছায়ায় আশ্রয় লইলাম এবং ফল-মূলাদি জলযোগ কথঞ্চিৎ শেষ করিয়া যাত্রার অপেক্ষায় সময় কাটাইতে লাগিলাম। পর পর তিনখানি শ্বেতজাতিপূর্ণ মোটর নামিয়া আসিলে আমরা উপরে উঠিবার ছাড় পাইলাম।

মুসৌরী হিমালয় পর্ব্বতের প্রথম স্তরে অবস্থিত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এ স্থানের "লাল-টিবা" (Lal Tiba) নামক সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ সমুদ্রগর্ভ হইতে প্রায় ৮ হাজার ফুট উচ্চ হইবে। পাহাড়ের গা দিয়া একটুর পর একটু করিয়া ক্রমশঃই আমরা উচ্চে উঠিতেছিলাম। এক দিকের বাঁক ঘুরিয়া অন্য দিকে উঠিবার কালে অনেক স্থলেই নীচের রাস্তাগুলি পর পর চোখে পড়িতেছিল। সমতলদেশবাসী যাত্রী এরূপ দুরারোহ শৈলশিখরে যান-সাহায্যে কদাচিৎ উঠিয়া থাকেন। দূরে, বহু নীচে আমাদেরই মত যাত্রী লইয়া আরও দুইখানি "বাস্" ভোঁ ভোঁ শব্দে চলিয়া আসিতেছে। সকলেই এক পথের পথিক। মোটরের 'ঘূর্ণীতে' পড়িয়া কোন কোন যাত্রী বিলক্ষণ অস্বস্তি বোধ করিলেন। কাণের ভিতরে নিয়ত ঘর্ঘর-শব্দ সকলকেই সে সময়ে ক্ষণেকের জন্য চঞ্চল ও অন্যমনস্ক করিয়া তুলিল। এক একবার মনে হইতেছিল, পাহাড়ের পাল্লায় পড়িয়া মোটরের কল-কব্জাও বুঝি বা বিকল হইয়া যায়! এইরূপে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে না হইতে মধ্য-পথে এক ব্যক্তি লাল নিশান দেখাইয়া আবার আমাদের মোটরখানিকে দাঁড় করাইল। জিজ্ঞাসায় জানিলাম, সরকার বাহাদুরের তরফ হইতে এখানে "টোল" বা পথকর লওয়ার নিয়ম আছে।

যাত্রী পিছু প্রত্যেকে আমরা দেড় টাকা হিসাবে টোল দিয়া ছাড়পত্র লইলাম। এই টোলের আয় বড় সামান্য নহে। অনুসন্ধানে

জানিলাম, যাত্রী ছাড়া প্রায় সকল জিনিষ ও জন্তুর উপরেই এই টোল নির্দ্দিষ্ট আছে। ডাণ্ডি, ঝাঁপান, মোটর, দ্বিচক্রযান, রিক্সা, ঘোড়া, অশ্বতর প্রভৃতির প্রত্যেকটিতে ১৷৷ দেড় টাকা, বলদ পিছু ৸৹ বার আনা, গরু, মহিষ বা তাহাদের বাচ্চা পিছু প্রত্যেকটিতে ।৵৹ ছয় আনা, ছাগল, ভেড়া, শূকর বা তাহাদের ছানা পিছু প্রত্যেকটিতে ৶৹ তিন আনা এবং পাঁচ সেরের অতিরিক্ত বোঝা পিছু প্রত্যেক কুলীর নিকটে ⁄১৹ ছয় পয়সা হিসাবে টোল লইয়া থাকে।

যাঁহারা ইতিহাসের খবর রাখেন, তাঁহারাই জানেন, এই মুসৌরী ১৮১২ খৃষ্টাব্দে প্রথম ইংরেজ রাজ্যের মধ্যে পরিগণিত হয়। তখন এ স্থানের বেশীর ভাগই হিংস্র-জন্তুপরিপূর্ণ জঙ্গল ছিল। শ্বেত-জাতির সুদৃষ্টি পড়িয়া আজ সে স্থান শুধু শ্বেত-জাতির কল-কোলাহল-মুখরিত সহর নহে, স্বাস্থ্য-সম্পদে, বিলাস-ব্যসনে প্রত্যেক সৌখীন স্বাস্থ্যসেবী মাত্রেরই চির মনোরম শৈলনিবাস আরাম কুটীর প্রভৃতিতে বিলক্ষণ ভরিয়া গিয়াছে। স্বাস্থ্য এখানে অটুট, সম্পদ অতুলনীয়। বলিতে কি, অন্য স্থানের মত এ স্থানে আজ পর্য্যন্ত কোন সময়েই কোন প্রকার সাময়িক কঠিন রোগের সূত্রপাত শুনা যায় নাই। দার্জ্জিলিং, নাইনিতাল প্রভৃতি স্থান তত দিনই 'সরগরম' থাকে—যত দিন সরকার বাহাদুরের অফিস দপ্তরাদি সেখান হইতে না উঠিয়া যায়। মুসৌরীর পক্ষে তাহা নহে, "সিজ্‌ন্‌-টাইমে" বরাবরই এ স্থান স্বাস্থ্য-সেবীদিগের পরম উপভোগ্য।

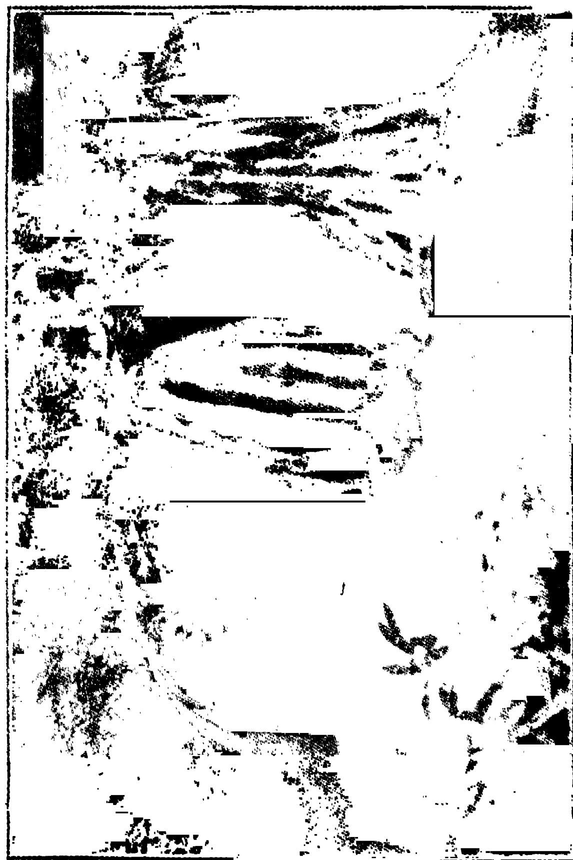
এ স্থানের এক দিকে (উত্তরে) প্রবল শীত এবং অন্যদিকে (দক্ষিণে "মল রোড্" প্রভৃতি স্থানে) শীত অপেক্ষাকৃত কম। সুতরাং বেশী বা কম শীতভক্ত উভয় শ্রেণীর লোকই এ স্থান সমধিক পছন্দ করেন।

২য় পর্ব্ব—



রাজপুরের নিকট সহস্রধারা ঝরণা

২য় পর্ব্ব-



মুসৌরী—জলপ্রপাত

. বেলা তিনটা আন্দাজ সময়ে আমাদের মোটর "Sunny View"এ আসিয়া আমাদিগকে একদম নামাইয়া দিল। এখান হইতে গন্তব্য স্থান "ল্যাণ্ডর বাজার" প্রায় দেড় মাইল। এ পথটুকুও ক্রমশঃ উচ্চে উঠিয়াছে। বোঝাওয়ালা, রিক্‌সাওয়ালা, কুলীর দল ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। মজুরী সকল স্থানেরই পরিষ্কার ভাবেই নির্দ্দিষ্ট আছে। প্রয়োজন মত আমরা পাঁচ জন কুলী বোঝার জন্য এবং ৩ খানি রিক্সা—উপরে উঠিতে নিযুক্ত করিলাম। এজেন্সীতে কুলিগণ নিজ নিজ নাম লিখাইয়া দিয়া বোঝা লইয়া পাক্ ডাণ্ডির পথে উপরে উঠিয়া গেল। আমাদের "স্বরো" চাকরকে তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইতে দিলাম। বলিয়া দিলাম, "ল্যাণ্ডর বাজারে" একটি রাত্রি কাটাই-বার জন্য যদি কোথাও স্থান খালি থাকে, তবে কুলীদের দ্বারা অগ্রেই সন্ধান করিয়া বোঝা ইত্যাদি সেইখানে রাখিবার ব্যবস্থা করিও।

সহযাত্রিণী চারি জনে দুইখানি রিক্সায় উঠিয়া বসিলেন, আমি ও দাদা তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আর একটি রিক্সায় উঠিয়া চলিতে লাগিলাম। রিক্সার অগ্রে এবং পশ্চাদ্ভাগে দুই জন করিয়া চারি জন কুলী নিযুক্ত থাকে। "ল্যাণ্ডর বাজার"-তক প্রত্যেক রিক্সার ভাড়া হইয়াছিল এক টাকা পাঁচ আনা। দুই দুই মানুষের বোঝা লইয়া রিক্সাপথে চড়াই উঠিয়া যাইতে প্রত্যেক কুলীকেই বিলক্ষণ গলদ্ঘর্ম্ম হইতে হইয়াছিল।

মুসৌরীর শৈল-শিখর শুধু স্বাস্থ্যের দিক্ দিয়া নহে, সৌন্দর্য্যেও বেশ শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। পাহাড়ের গায়ে ইহার নিত্য নূতন প্রাকৃতিক শোভা-সম্পদ, মেঘের খেলায় রং-বেরংএর পরিপূর্ণ হাসি—মানুষকে নিয়তই প্রফুল্ল ও আত্মবিস্মৃত করিয়া দেয়। বলা বাহুল্য, রাজা, মহারাজা, সামন্ত নৃপতি, ধনী ও বিলাসী ব্যক্তি ভিন্ন এ আনন্দ সাধারণের সুখসেব্য নহে। স্থানের তারতম্য হিসাবে এখানে "সিজ্‌ন্

ফতে সিংএর দলে ভিড়িয়া যায়। বোঝার কুলী অনুসন্ধান করিয়া সেও ফতে সিংএর সহিত এখানে ফিরিয়া আসিল।

কুলীদের "প্রধান" অর্থাৎ সর্দ্দারবিশেষের সহিত কথাবার্ত্তায় বিশেষ কিছু ফল হইল না। পাঁচ ধাম যাত্রায় প্রতি মণ বোঝা পিছু ৬০ টাকার কমে কেহই যাইতে চাহে না দেখিয়া সে দিনের মত তাহাদিগকে বিদায় দিলাম।

সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে মুসৌরীর ধূসর অঙ্গে লক্ষ লক্ষ বৈদ্যুতিক আলো শোভা বিস্তার করিল। ঘর ছাড়িয়া এইবার আমরা কিছুক্ষণ সহর-পরিভ্রমণে ইচ্ছুক হইলাম। দেখিবার অনেক কিছু বর্ত্তমান, কিন্তু তাহা অল্পসময়ের কায নহে। জলপ্রপাত, উপত্যকা প্রভৃতি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ইহার আশ-পাশ পরিপূর্ণ। শুনিলাম, সেগুলি প্রায়ই নিকটে নাই—পাঁচ সাত মাইল দূরে। "বিনগ," "ভট্টা" প্রপাত, "অগ্‌লার" উপত্যকা, "হার্ডি" প্রপাত, "যমুনা ব্রীজ" "কেম্‌তি" প্রপাত "সহস্র ধারা" প্রভৃতি এ স্থানের দৃশ্যগুলি অতীব রমণীয় হইলেও দুঃখের বিষয়, এ যাত্রায় দেখিবার অবকাশ হইল না। ব্যয়ের দিক্ দিয়া এখন আবার নূতন চিন্তা—কোন স্থানে এক দিনের বেশী থাকিলে সর্ত্তমত ডাণ্ডিওয়ালাদের প্রত্যেক কুলীকে প্রতিদিনের খোরাকী জোগাইতে হইবে, তাহা নিতান্ত কম নহে, উপরন্তু বিঘ্নবহুল দুর্গম গিরি-পথে প্রায় পাঁচ শত মাইল অগ্রসর হইবার সঙ্কল্প লইয়া, এখন হইতে মুসৌরীর আশেপাশে পড়িয়া থাকা সে সময়ে আদৌ যুক্তিযুক্ত মনে হয় নাই। তত্রাপি এই সহরের একটু আধটু পরিচয় এখানে না দিলে অসঙ্গত হয়। প্রথমতঃ সহরবাসীর যাহা প্রয়োজন ও প্রীতিকর যথা,—বাজার, হোটেল, পোষ্টঅফিস, টেলিফোন, ব্যাঙ্ক, লাইব্রেরী, ক্লব্, হাসপাতাল, সিনেমা, "পিক্‌চার্ প্যালেস্" প্রভৃতি যাঁহার যাহাতে রুচি,

তৎসমুদয়ই এখানে বিদ্যমান। ভারতীয়দের থাকিবার পক্ষে "কাশ্মীরী হোটেল," "ইউনিয়ন্ হোটেল," "হোটেল্ হিন্দুস্থান" প্রভৃতি ৩।৪টি হোটেল আছে। বাজার দ্রব্যাদি—ফলমূল, মিষ্ট, শাকসব্জী হইতে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সমুদায় কিনিবার জন্য "ল্যাণ্ডর বাজার" ও "বারলোগঞ্জ বাজার" দুই স্থানই যথেষ্ট বলিলে হয়।

স্কুল অনেক। অন্য কোনও পার্ব্বত্য সহরে এত অধিক স্কুল নাই। তবে সেগুলি প্রায় য়ুরোপীয়ান্ বালক-বালিকাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। এই য়ুরোপীয়ান্‌দের জন্যই বড় বড় "হোটেল," "ক্লব," "পোলো গ্রাউণ্ড" হইতে স্বতন্ত্র বাজার, ক্যাণ্টন্‌মেণ্ট প্রভৃতির অনুরূপ সুন্দর ব্যবস্থা আছে, ইহা বলাই অত্যুক্তি হইবে। "তিলক লাইব্রেরীই" ভারতীয়দের জন্য শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগার বলা যায়।

সহরের দিক্ দিয়া কতক কতক স্থান সে রাত্রিতে কিছুক্ষণ ঘুরিয়া লইলাম। সর্ব্বত্রই শ্বেত ললনা, সৌখীন শ্বেত পুরুষের অবাধ বিচরণ, মুখে অফুরন্ত আরামের হাসি, কক্ষে কক্ষে পিয়ানো-সুর-মিশ্রিত কোমল কণ্ঠের গীতধ্বনি সবই যেন একাধারে এই শৈল-কাননের নিভৃত প্রদেশে স্থানলাভ করিয়া, আপনাদিগকে প্রতি মুহূর্ত্তেই ধন্য মনে করিতেছে।

আহারান্তে দারুণ শীতে আমাদের রাত্রি কাটিল।

তৃতীয় পর্ব্ব

১ম ধাম—যমুনোত্তরী অভিমুখে

প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গের পর বহির্বারান্দায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সম্মুখেই পাহাড়ের মাথায় প্রভাতের আরক্ত রবি ছবির মতই আকাশের কোলে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে আলোকে মুসৌরীর শৈলশিখর ক্রমশঃই যেন উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া, পার্ব্বত্য প্রদেশের অপরূপ সৌন্দর্য্যরাশি বিস্তার করিতেছিল। সেই রবি আমাদের দেশে নিত্যই উদয় হয়, কিন্তু আজিকার মত এতটা সৌন্দর্য্যের বিস্তৃতি তাহাতে কৈ দেখিয়াছি! একবার মনে হইল, কোথায় ফেলিয়া অসিলাম সেই সমতল দেশ, লতাপাদপ-পরিপূর্ণ উদ্যান, রাস্তা-ঘাট, পুষ্করিণী প্রভৃতি যে দেশের আবহাওয়ায় আজন্ম পরিপুষ্ট হইয়া আসিতেছি। এ দেশের দৃশ্য যে একবারে পৃথক্, নূতন ও চমৎকার!

বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ফতে সিং (ডাণ্ডিওলালা) ও ভগবান্ সিং (বদ্রী-কেদার পাণ্ডাদ্বয়ের দেওয়া কর্ম্মচারী) একে একে আসিয়া সেলাম দিল। আমরা বোঝার কুলীর জন্য বিশেষ চিন্তিত ছিলাম। তাহা-দিগকে সম্মুখে দেখিয়া সে সম্বন্ধেই আবার কথা উঠিল। উত্তরে সেই একই কথা। "এ অঞ্চলের কুলীদিগের সর্দ্দার 'প্রধান' প্রতি মণ বোঝা পিছু ৬০৲ টাকার কমে কুলী জোগাইতে রাজী নহে।" এ সংবাদে আমরা একটু ইতস্ততঃ করিতেছিলাম। ভগবান্ বলিয়া উঠিল, "যাত্রার কঠিনতা হিসাবে ইহা খুব বেশী দর নহে। শুধু কেদারবদরী দুই ধামের যাত্রায় অনেক সময়ে হরিদ্বারের কুলিগণ এই দরই চাহিয়া বসে।" ইত্যাদি।

আর বৃথা কালক্ষয় অনাবশ্যক মনে করিয়া আমরা যখন প্রধানকেই ডাকা সাব্যস্ত করিতেছিলাম, ঠিক সেই অবসরে দুইটি বলিষ্ঠকায় নেপালী কুলী আমাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। জিজ্ঞাসায় জানিলাম, ডাণ্ডি ও নূতন যাত্রী দেখিয়া তাহারা বোঝার সন্ধানেই এখানে আসিয়াছে।

সুযোগ বুঝিয়া তাহাদিগকে নিকটে ডাকা হইল। পাঁচ ধাম যাত্রার মজুরী কত লইবে, জিজ্ঞাসা করা হইলে, প্রথমে তাহারা পঞ্চাশ টাকা মণ চাহিয়া বসিল। তাহাদের মনের অবস্থা বুঝিয়া আমরা "দুই মাসের যাত্রায় এত অধিক দর?" "দেশের অবস্থা কি?" "এবারে এদিকের আর যাত্রী নাই" ইত্যাদি অনেক কিছু বুঝাইয়া শেষ প্রতি মণ বোঝার জন্য চল্লিশ টাকা হিসাবে দর চুক্তি করিতে সমর্থ হইলাম। অবশ্য "চানা চবৈনি" ও "খিচুড়ী ইনাম" স্বতন্ত্র দিতে হইবে। বোঝা দেখিতে চাহিলে আমরা তাহাদিগকে হলঘরে লইয়া গিয়া একে একে সমস্তই দেখাইয়া দিলাম। সর্ব্বসমেত পাঁচটি কুলীর আবশ্যক হইবে, ইহাও তাহারা সঙ্গে সঙ্গে জানাইয়া দিল। ওজন হিসাবে দর স্থির হওয়ায়, এ বিষয়ে আমাদের কোন কিছু বলিবার ছিল না। তাহাদের কথামতই অতিরিক্ত তিন জন কুলী ঠিক করিতে ও সঙ্গে সঙ্গে অদ্যই আহারান্তে আগে যাত্রার জন্য ঠিকমত প্রস্তুত হইতে আদেশ দিলাম। হৃষ্টচিত্তে "ফতে সিং" "ভগবান্" প্রভৃতি সকলেই যাত্রার আয়োজনে তৎপর হইল।

এত শীঘ্র মুসৌরী পরিত্যাগের ইচ্ছা কাহারও না থাকিলেও ঘটনাচক্রে তাহাই ঘটিয়া গেল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রধান কারণ হইল এই কুলিগণ। প্রথমতঃ ফতে সিংএর সহিত নয় জন কুলী আসিয়াছে। কোন স্থানে এক দিনের বেশী থাকিলেই সর্ত্তমত তাহাদের প্রত্যেককে খোরাকী জোগাইতে হইবে। তার পর, বোঝার জন্য যে কুলিগণকে

অদ্য ঠিক করা হইল, বিলম্ব হইলে পাছে ইহাদের প্রধান মহাশয়—যিনি ইতিপূর্ব্বে প্রতি মণ বোঝা পিছু ষাট টাকা লইবার চেষ্টায় ছিলেন, এক্ষণে মজুরীর অল্পতার জন্য সহজেই ইহাদিগকে বিগড়াইয়া দিয়া আমাদের দূরের যাত্রা পণ্ড করিয়া দেন, যাত্রার পূর্ব্ব-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সে চিন্তা আমাদিগকে বিলক্ষণ উত্ত্যক্ত করিয়াছিল। আমাদের সহিত বোঝা বড় কম ছিল না; পাঁচ মণেরও অধিক হইবে। মণকরা ২০৲ টাকা কম দর, সে যে অনেক টাকার প্রভেদ।

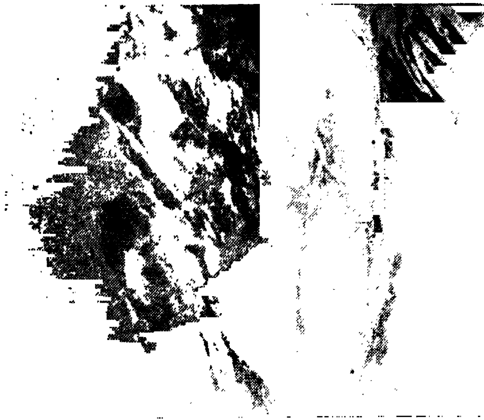
যথাসম্ভব সত্বর আহারাদি শেষ করিয়া লইয়া সকলেই যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম। বেলা ১৷৷৹টা আন্দাজ সময়ে বোঝার কুলী (এবারে পাঁচটি) তাহাদের নিজ নিজ সামর্থ্যানুযায়ী বোঝার বিভাগ করিয়া লইতে ব্যস্ত হইল। প্রায় দেড় ঘণ্টাব্যাপী সে এক বিরাট উদ্যোগপর্ব্ব। তাহার কথা লিখিতে গেলে পাঠক ও লেখক উভয়েরই ধৈর্য্যচ্যুতি হওয়ার সম্ভব, এজন্য এক্ষেত্রে নিরস্ত হইলাম।

যাত্রার আয়োজন দেখিয়া "গুরুসিং সভার" ম্যানেজার মহাশয় (বাংলোর মালিক) সভার তরফ হইতে এক্ষণে প্রার্থিরূপে উপস্থিত হইলেন, বলিলেন, "এটি একটি সৎপ্রতিষ্ঠান, দশের সাহায্যে পরিচালিত হইতেছে। ইহার অনেক কিছু অভাব অভিযোগ বিদ্যমান। আপনাদের মত তীর্থসেবী সজ্জনগণেরই সহায়তায় সে অভাব দূর হইবে" ইত্যাদি। তাঁহার কথায় আমরা সকলেই এই সভার উদ্দেশ্যে কিছু কিছু দক্ষিণা স্বীকার করিলাম, সঙ্গে সঙ্গে বিনা বাধায় তিনি যে মুসৌরীর মত হিম-শীতল শৈলশিখরে আমাদিগকে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন, তাহার জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ প্রকাশ করিলাম। 'ঘরমুখো' বাঙ্গালীর সকল অবস্থায়ই ঘরের দিকে ঠিক নজর থাকে। স্থানীয় ডাকখানা হইতে আমরা সকলেই কতক কতক খাম ও পোষ্টকার্ড সংগ্রহ করিয়া রাখিলাম,

৩য় পর্ব–



স্থানবিশেষে তুষার-ধারা



তুষারের রাজ্য

৩য় পর্ব্ব—



পাহাড়ের নীচে নদীর ধারের রাস্তা



নদীতটে বিস্তৃত উপলখণ্ড

কি জানি, আগের পথে পাছে উহা না পাওয়া যায়। যাইতেছি ত দূর দুর্গম বিঘ্নসঙ্কুল গিরি-পথে—মহাজনরা যাহাকে মহাপ্রস্থানের পথ বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন। ঘন জঙ্গলাকীর্ণ—ঝরণা-নদীর অবিরাম কল-কল স্বরের মাঝখানে হয় ত মনের অবস্থা এক একবার দেশের জন্য যদি কাতর হয়, তবে অন্ততঃ একটু সংবাদ দিতে পারিব, এটুকু আশা বোধ হয় গৃহী ব্যক্তি কেহই পরিত্যাগ করিতে পারেন না। অবশ্য কৌপীনবস্ত সাধুসন্তদিগের কথা স্বতন্ত্র।

কুলীরা বোঝা বাঁধিয়া রজ্জুগুলি আপন আপন ললাটের সহিত সংলগ্ন রাখিয়া (এ দেশের এই প্রথা) আগে চলিল। বোধ হয়, বোঝার সহিতই তাহাদের ললাটের বিশেষ সম্বন্ধ! বন্ধুপত্নী, জ্ঞাতিপত্নী উভয়েই বাহকস্কন্ধে ডাণ্ডির উপর উঠিয়া বসিলেন! প্রায় সপ্ততিতম বর্ষের অগ্রজ মহাশয়, অগ্রজ-পত্নী, বৃদ্ধা দিদি, আমি সকলেই এক একটি দীর্ঘ যষ্টিহস্তে, একে একে মূসৌরীর পাহাড়সংলগ্ন সংকীর্ণ পথ ধরিয়া আগে চলিলাম! সঙ্গে 'সুরো' চাকর ও পথের সাথী "ভগবান্।" "সাথে আছে ভগবান্, নাহি ভয়" কবির এই এক চরণ গানের সার্থকতা সত্যই যেন মনে মনে উপলব্ধি করিলাম। বিশেষ ভগবানের নাম ধরিয়া ডাকিতে ডাকিতে মহাপ্রস্থানের পথে অগ্রসর হওয়া কয়জনের সৌভাগ্যে ঘটিয়া থাকে? চারিদিকেই কেবল পাহাড়; পাহাড়ের ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া প্রথমতঃ আমরা দেশ-হারা, ক্রমেই দিশা-হারার মতই—ছয় মাইল পথ অতিক্রম করিয়া "ঝাল্‌কী" নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম। বোঝাওয়ালারা এখানে আসিয়া অপেক্ষা করিতে-ছিল। ঝরণা-বিহীন এই স্থানটিতে অসম্ভব জলকষ্ট দেখিয়া এখানে রাত্রি কাটাইতে কেহই স্বীকৃত হইলেন না। অগত্যা আরও আড়াই মাইল আন্দাজ পথ অতিক্রম করিয়া "কোটলি"র ধর্ম্মশালায় আসিয়া

উপস্থিত হইলাম। ধর্ম্মশালাটি পাকা হইলেও তাহাতে মাত্র দুইখানি ছোট ছোট ঘর ও তৎসংলগ্ন একটু বারান্দায় এতগুলি লোকের বোঝা সমেত থাকার অসুবিধা মনে হইল। তাহার উপর ঘর দুইখানি তখন গেরুয়া দলেই ভরা ছিল। এ দিকে সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া বোঝাওয়ালারা আর আগে যাইতে চাহিল না। অগত্যা এইখানেই আজ রাত্রিযাপন করা স্থির হইল।

ভগবানের কাকুতি-মিনতি ও সঙ্গে বেশীর ভাগ স্ত্রীলোক দেখিয়া গেরুয়াধারী যাত্রীর দল অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোনমতে একখানি ঘর খালি করিয়া দিল। ঘরখানি পাইয়া এ দুরন্ত শীত হইতে কতকটা অব্যাহতি পাইলাম। বোঝাগুলি সমস্তই ফতে সিং, ভগবান্ ও সুরোর জিম্মায় বারান্দায় পড়িয়া রহিল। এখানে গ্রাম বলিতে কিছুই দেখিলাম না। শুধু দুই একখানি দোকান, তাহা কেবল যাত্রীদের জন্যই মনে হইল। দোকানে চাউল, আটা, ঘৃত, চিনি প্রভৃতি হইতে দুগ্ধ, খোয়া, পেঁড়া পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। খোয়া এখানকার উৎকৃষ্ট; প্রতি সের বারো আনা এবং দুগ্ধ প্রতি সের চারি আনা। সুতরাং সে রাত্রিতে দুগ্ধ, পেঁড়া, খোয়া প্রভৃতিই আমাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিল। দূরে পাহাড়ের নীচে একটি ছোট ঝরণা ঝির্-ঝির্ করিয়া ক্ষীণধারায় বহিয়া যাইতেছে। সুতরাং এখানেও জলকষ্টের অবধি নাই বলিলেও ক্ষতি নাই।

পরদিন অর্থাৎ ৬ই বৈশাখ বুধবার প্রাতে আমরা "কোট্‌লি" পরিত্যাগ করিলাম। চোখের আগে পাহাড়গুলি জলাভাবে যেন আজ শুষ্ক বলিয়া মনে হইতেছিল। সংকীর্ণ রাস্তা, আঁকাবাঁকাভাবে পাহাড়ের গা দিয়াই আগে গিয়াছে। প্রায় আড়াই মাইল আন্দাজ আগে গিয়া একটি বাঁকের মুখে, দূর হইতে সম্মুখে উত্তরদিকের তুষার-মণ্ডিত শুভ্র পর্ব্বতগুলির উজ্জ্বল দৃশ্যগুলি খুবই চমৎকার মনে হইল। ঐ দিকেই আমাদের

যাত্রা জানিতে পারিয়া সকলেই সে সময় আনন্দে অধীর হইয়াছিলাম। এ দিনে কদাচিৎ দু'একটি ঝরণার ক্ষীণ ধারা পথি-মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয়। মধ্যে মধ্যে পাহাড়ের কোলে দূর হইতে "ককৃকো" (cucko) পাখীর এক একবার শ্রুতিমধুর ডাক ক্রমশঃই যেন স্থানের নির্জ্জনতা সূচিত করিতেছিল। এক স্থানে আলমোড়ার মত ঘন-সন্নিবিষ্ট লম্বা লম্বা চীরের (Pine tree) গাছের মধ্য দিয়া রাস্তা অতিক্রম করিতে কতকগুলি হরিণ-শিশু দৌড়াইতে দেখিলাম। বেলা ১০টা আন্দাজ সময়ে আমরা "ধনোটী" পৌঁছিলাম। কোট্‌লি হইতে ধনোটী প্রায় ৬॥০ মাইল হইবে। এখানে কালী-কম্‌লীওয়ালার সুন্দর দ্বিতল ধর্ম্মশালা। মৃত্তিকা-নির্ম্মিত হইলেও বাস ও স্থান হিসাবে পূর্ব্বদিনের পাকা ধর্ম্মশালা অপেক্ষা প্রশস্ত ও বিলক্ষণ মনোরম। পাহাড়ের বহু নীচে ঝরণা; কিন্তু যাত্রীর সুবিধার্থে সেখান হইতে পাইপ্ সংযোগে জল আনিবার সুন্দর ব্যবস্থা রহিয়াছে দেখিয়া সকলেই এখানে মধ্যাহ্নের স্নানাহার সম্পন্ন করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। পাহাড়ের উপরিভাগে একটি ডাক-বাংলো শোভা পাইতেছিল। এখানে দুই-খানিমাত্র দোকান। তাহাতে মোটামুটি সকল দ্রব্যই পাওয়া গেল। চাউল প্রতি সের তিন আনা, ঘৃত টাকায় তিন পোয়া, আলু প্রতি সের দুই আনা, উৎকৃষ্ট খোয়া প্রতি সের (৸০ স্থলে) মাত্র ছয় আনা। কেবল কেরোসিন তৈল প্রতি বোতল ছয় আনা হিসাবে ক্রয় করিতে হইল। জনৈক পাহাড়ী ধর্ম্মশালাটি রক্ষণাবেক্ষণ ও যাত্রীদের সুখ-সুবিধার প্রতি দৃষ্ট রাখিবার জন্য, কালীকম্‌লীওয়ালার তরফ হইতেই নির্দ্দিষ্ট বেতনে নিযুক্ত আছে। আহার-কালে ইহার মারফত কিঞ্চিৎ দধি পর্য্যন্ত সংগৃহীত হইয়াছিল।

আহারান্তে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আবার আমরা আগে রওনা

হইলাম। যাত্রার পূর্ব্বে ধর্ম্মশালার রক্ষক পাহাড়ীটি একখানি বৃহৎ খাতা (Remark Book) বাহির করিয়া আমাদের স্ব স্ব মন্তব্য লিখিয়া দিতে অনুরোধ জানাইল। ধন্য এই সকল ধর্ম্মশালার পরিচালক সাধু মহাত্মগণ—যাঁহাদের ঐকান্তিক ধর্ম্মানুপ্রেরণায় এই নির্জ্জন পর্ব্বতারণ্যে আত্মীয়স্বজন-পরিত্যক্ত যাত্রীদের জন্য আজও এইরূপ সুব্যবস্থার প্রচেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। বৈকালের দিকে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় পথের মাঝে বৃষ্টি ও ঝড়ের বিলক্ষণ উৎপাত সহ্য করিতে হইল। মধ্যে মধ্যে পাহাড়ের গায়ে বড় বড় রক্ত জবার মত লাল ফুলের জঙ্গল এ পথের অতীব নয়ন-রঞ্জন দৃশ্য। পাহাড়ীরা ইহাকে "বুকস্" ফুল বলিয়া থাকে, ইংরাজী নাম "রডো ড্রেনড্রাম।" এ দিনে আমরা "কানাতালে" আসিয়া রাত্রিযাপন করিলাম। মূসৌরী হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় ২৩ মাইল হইবে।

পরদিন প্রাতে যথারীতি যাত্রার প্রারম্ভেই ফতে সিং ও ভগবান্ বোঝাওয়ালাদিগকে পুনঃপুনঃ সাবধান করিয়া জানাইয়া দিল, "আজ্কার পথে দেড় মাইল আন্দাজ আগে গিয়ে, এই রাস্তা ছাড়িয়া বামদিকে উত্‌রাই পথে নামিয়া যাইতে হইবে। সে পথ এ সরকারী রাস্তার মত নহে, সুতরাং বোঝা লইয়া খুবই সন্তর্পণে আগে চলিবে।" জিজ্ঞাসায় জানিলাম, এ সরকারী রাস্তা "টিহিরী" পর্য্যন্ত গিয়াছে। টিহিরী-রাজের দৃষ্টি থাকায় তাঁহার তরফ হইতে এ রাস্তার মধ্যে মধ্যে মেরামত-সংস্কার ইত্যাদি করা হয়। বলা বাহুল্য, এই জন্যই এ দেশের লোকে ইহাকে "সরকারী রাস্তা" বলিয়া থাকে।

আমরা টিহিরীর পথ ছাড়িয়া, যে স্থানে উত্‌রাই পথে নামিতে সুরু করিলাম, সে স্থানে পাহাড়ীদের একখানি লম্বা "আটচালা" (বোধ হয় দোকানঘর হইবে) দেখিলাম। সে স্থানটিকে "বলডানা কা ঠাঁং"

৩য় পর্ব্ব—



পাহাড়ের সঙ্কীর্ণ পথ



মধ্যপথে এক স্থানের দৃশ্য

৩য় পর্ব্ব—





বলা হয়। ডাণ্ডিওয়ালা তাহাদের অভ্যাসমত যাত্রী না নামাইয়াই ধীরে ধীরে আগে নামিয়া চলিল। আমরা উপর হইতে তাহাদিগকে বহু নীচেই দেখিতে পাইতেছিলাম। ক্রমশঃ অদৃশ্য হইয়া গেল। স্ত্রীলোক যাত্রীদের কষ্টের অবধি ছিল না। এ উত্‌রাই পথে কেবলই বড় বড় প্রস্তরখণ্ড বিস্তৃত ছিল। নীচু পথ, তায় "ক্রেপ-শু"-পরিহিত পদদ্বয়, পদে পদে প্রত্যেক-কেই পিছলাইয়া দিবার উপক্রম করিতেছিল। বহু কষ্টে প্রায় পাঁচ মাইল উত্‌রাই পথ নামিয়া আসা হইল। মধ্যে—"বল্‌ডোয়ান গাঁও" ও —"সুপাকোড়" নামক চটী অতিক্রম করিয়াছিলাম। প্রায় মধ্যাহ্ন দ্বিপ্রহর সময়ে এই উত্‌রাইএর নীচেই এক চৌরাস্তা দেখিতে পাওয়ায় সে স্থানে কিছুক্ষণের জন্য সকলেই বিশ্রাম লইলেন। ইত্যবসরে অন্যদিক্ হইতে ৭।৮ জন গুর্জ্জর প্রদেশের যাত্রী একে একে উপস্থিত হইলেন। ইহা-রাই আজ আমাদের চোখে প্রথম যাত্রী, সুতরাং পরস্পর পরস্পরের যাত্রা-বিবরণ জানিতে উৎসুক হইলাম। যাত্রিদলের সহিত চারিখানি কাণ্ডির উপরের চারি জন বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা উপবিষ্ট ছিলেন। তন্মধ্যে এক জনের একখানি হস্ত একবারে ভাঙ্গা অবস্থায় ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড দিয়া বিলক্ষণ বাঁধা রহিয়াছে দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করা হইল। কাণ্ডিওয়ালা যাত্রি-দ্বন্দ্বে নিজেই পড়িয়া যাওয়ায় এই বিপত্তি তাঁহাকে ইতিমধ্যেই সহ্য করিতে হইয়াছে। কাণ্ডি ছাড়া এই দলের সহিত একটি ডাণ্ডিতে জনৈক বৃদ্ধ যাত্রীও আগে আসিতেছিলেন। সকলেই চারি ধামের (যমুনোত্তরী ছাড়া) যাত্রী, হৃষীকেশ হইতে টিহিরী হইয়া আজ চতুর্থ দিনে এত দূর আসিয়া পৌঁছিয়াছেন ইত্যাদি শ্রবণ করিয়া ডাণ্ডি, কাণ্ডি ও বোঝা পিছু কিরূপ দর পড়িয়াছে, জানিতে চাহিলাম। চারিধাম যাত্রার মজুরী প্রতি ডাণ্ডি দুই শত পনেরো টাকা, প্রতি কাণ্ডি এক শত টাকা এবং প্রতি মণ বোঝা পিছু পঁচাত্তর টাকা দর স্থির হইয়াছে শুনিয়া আমরা

নীরব রহিলাম। ইহা ছাড়া "চানাচবৈনী" ও "খিঁচুড়ী ইনাম" অতিরিক্ত দিতে হইবে। সুখের বিষয়, আমাদের বোঝাওয়ালা কুলী কয় জন তখন নিকটে ছিল না। 'বোঝাওয়ালাগণ আপনাদের নিকট হইতে অনেক বেশী আদায় করিয়া লইয়াছে' এ কথা পুনঃপুনঃ নূতন যাত্রীকে জানাইয়া দিয়া আমরা আবার আগে অগ্রসর হইলাম। এইরূপে বেলা ১টা আন্দাজ সময়ে সে দিন আমাদের দল সকলেই "বলডানায়" আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মসৌরী হইতে প্রায় তেত্রিশ মাইল দূরে এই বলডানায় আলু, ঘৃত, চিনি, সরিষার তৈল, দধি প্রভৃতি সকল দ্রব্যই দোকানে পাওয়া গেল। আহারাদির পরে এ দিনে যাত্রা বন্ধ রাখা হয়। কারণ, অগ্ন একাদশীর নিরম্বু উপবাস দিনে দশ মাইল পথ চলিয়া আসিয়া বৃদ্ধা দিদি বিলক্ষণ পরিশ্রান্ত হইয়া পড়েন। পরদিনেও আহারাদি শেষ করিয়া বেলা দুইটা আন্দাজ সময়ে রওনা হইলাম। দুই মাইল দূরে "শাঁশু" গ্রাম। পুলের উপর দিয়া এখানে একটি বৃহৎ ঝরণা পার হইতে হইল। পুলটি কাষ্ঠ-নির্ম্মিত; দৈর্ঘ্যে প্রায় ২৬ হাত হইবে। এই শাঁশু হইতেই আমরা প্রথম গঙ্গার তীর ধরিলাম। আশে-পাশে গম, যব প্রভৃতি শস্যের হরিৎ ক্ষেত্রগুলি ক্ষণিকের জন্য দেশের কথা স্মরণ করাইয়া দিল। এক স্থানে মাটী-মিশ্রিত প্রস্তরখণ্ড অর্থাৎ নুড়ির পাহাড়ের পার্শ্ব দিয়া পথ অতিক্রম-কালে, ত্বরিত-গতি ভগবান্ ও ফতে সিং শীঘ্র শীঘ্র আগে যাইতে উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। শাঁশু হইতে দুই মাইল আন্দাজ আগে আসিয়া "ছামের" একটি সুন্দর দ্বিতল ধর্ম্মশালা চোখে পড়ে। ধর্ম্মশালার গায়ে প্রস্তরফলকে হিন্দীভাষায় ইহাই লিখিত আছে,—"এই ধর্ম্মশালাটি সম্বৎ ১৮৬৫ অব্দে নেপালের স্বর্গীয়া মহারাণী কৃষ্ণকুমারী দেবীর স্মরণার্থে তথাকার ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী ও 'কমাণ্ডার-ইন্-চীফ্' জঙ্গ বাহাদুর দেবশর্ম্মণ

দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে।” এ সকল স্থানে মসৌরীর মত প্রচণ্ড শীত নাই। প্রায় সমস্ত পথই সমতল শস্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়া গঙ্গার তীরে তীরে আগে গিয়াছে। গঙ্গার পরপারে শস্যহীন ধূম্রবর্ণের পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে কদাচিৎ দু'একটি পাহাড়ীদের বাসভূমি দেখিয়া এপারের যাত্রীরা স্বতঃই মনে করেন, এই নির্জ্জন পাহাড়ের মধ্যে তাহারা কোন্ সুখে বাঁচিয়া আছে! আমরা এ দিনে প্রায় দশ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে “নগুনা”য় আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

“নগুনা”—এই গ্রামে পৌঁছিতেই পাহাড়ী বালক-বালিকারা আজ প্রথম আমাদিগকে পাইয়া বসিল। “বদরীবিশাল কী জয়” “গঙ্গোত্রী মায়ী কী জয়, “যমুনোত্রী মায়ী কী জয়” সমস্বরে এই রবের সহিত কেহ কেহ ‘সুঁই তাগা দেও,” কেহ বা “লাল ডুরী দেও” ইত্যাদি প্রার্থনায় আমাদিগের বিস্ময় উৎপাদন করিল। কতটুকু সামান্য দ্রব্যের আশায় এই কাকুতি-মিনতি! যে সুঁই (সূচ) আমাদের দেশে এক পয়সায় বিশটি পাওয়া যায় অথবা এতটুকু লাল সূতা, যাহা যেখানে সেখানে অবহেলায় পড়িয়া থাকে, সেই অকিঞ্চিৎকর দ্রব্যেরই এখানে এত আদর! এই অদ্ভুত দান কাহাকেও দিতে গেলে সে একেবারে আনন্দে গদ্‌গদচিত্ত—সব প্রার্থনাই যেন তাহার পূরণ হইয়াছে। এই সামান্য দ্রব্যের জন্য এখানকার যুবতীরা পর্য্যন্ত অকপট-চিত্তে হাত পাতে! মনে পড়িল, দেশের, বিশেষ করিয়া কাশীবাসী ভিখারীর দল—যাহাদের বলিতে কি, দিবাভাগে প্রায় সত্রে সত্রে আহারের ব্যবস্থা থাকে, অধিকন্তু সত্রাধ্যক্ষ মহাশয়দের নিকটে ইহাদের বেশ কিছু সঞ্চিত অর্থ বিদ্যমান। এই শ্রেণীর ভিক্ষুকের এমন কি, রাত্রিতে পর্য্যঙ্ক ভিন্ন স্বচ্ছন্দ শয়ন চলে না! ইহাদের হাত পাতিবার “ঢং” আর এই নিরক্ষর অল্পে সন্তুষ্ট পাহাড়ীদের অকপট

প্রার্থনায় কতদূর প্রভেদ, আজ তাহা বিশেষ করিয়া হৃদয়ঙ্গম হইল।

এখানকার ধর্ম্মশালাটি দ্বিতল, উপরে তিনখানি ঘরের মধ্যে একটি ঘর খালি ছিল। সেখানেই রাত্রি-যাপনের ব্যবস্থা হইল। পূর্ব্বদিকে গঙ্গা এবং পশ্চিমদিক্ হইতে সম্মিলিত একটি সুবৃহৎ ঝরণা এই উভয়েরই জলধারার নিরন্তর ঝরঝর শব্দ যাত্রিগণকে এখানে বিলক্ষণ উন্মনা করিয়া রাখে। গঙ্গোত্রীর দূরত্ব এখান হইতে প্রায় ৭৯ মাইল। পরদিন প্রাতে যাত্রা করিয়া বেলা ১০টা আন্দাজ সময়ে "ধরাস্থ" আসিয়া উপস্থিত হইলাম। দৃশ্য হিসাবে এ স্থান অতীব রমণীয়। প্রশস্ত গঙ্গাতটে কালী কমলীওয়ালার সুন্দর দ্বিতল ধর্ম্মশালা। সহজেই যাত্রিগণকে এখানে থাকিবার জন্য উল্লসিত করে। ধর্ম্মশালার ঘরগুলিও বেশ প্রশস্ত, বিশেষতঃ গঙ্গার দিকে এই ঘরগুলির সংলগ্ন লম্বা বারান্দা নির্ম্মিত হওয়ায় সেখান হইতে সম্মুখের দৃশ্য অতীব চমৎকার মনে হয়। ধূম্রবর্ণের পাহাড় ও তন্নিম্নে স্রোতস্বতীর চির-চঞ্চল উদ্দাম গতি দেখিয়া দেখিয়া আত্মবিস্মৃতি ঘটে। উপর্য্যুপরি দুই দিনের বৃষ্টিপাতে ইতিমধ্যেই জল কর্দ্দমাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। আমরা মধ্যাহ্নের আহারাদি সম্পন্ন করিয়া এ দিনে এখানেই থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। অগত্যা ডাণ্ডিওয়ালা ও বোঝাওয়ালা কুলীর দল আজ ছুটী পাইল। আহার্য্য দ্রব্যের মধ্যে এখানে সকল জিনিষই পাওয়া গেল; কেবল তরকারীর অভাবে, বিশেষ করিয়া আলু দুষ্প্রাপ্য হওয়ায়, সঙ্গে আনীত পাঁপরই আজ ডালের সহিত আহারের উপাদান-রূপে ব্যবহৃত হইল।

১০ বৈশাখ রবিবার প্রভাতে আমরা ধরাস্থ হইতে আগে চলিলাম। একটি ঝরণার পুল পার হইয়াই বামভাগে চড়াইয়ের

পথে উপরে উঠিবার জন্য ভগবান্ সকলকে সাবধান করিয়া দিল। এখান হইতেই গঙ্গাতীর-সংলগ্ন নীচের রাস্তা ও গঙ্গাকে আমরা ছাড়িয়া দিয়া ভিন্নপথে যমুনোত্তরীর দিকে অগ্রসর হইলাম। আর ৪৮ মাইল আগে গেলেই যমুনোত্তরীর দর্শন পাওয়া যায়। শুনিলাম, এই পথ অতীব দুর্গম, যাহার জন্য যাত্রীরা (এমন কি হিন্দুস্থানীয় পর্য্যন্ত) সাধারণতঃ এ তীর্থে অগ্রসর হইবার সাহস করেন না। প্রথমেই আড়াই মাইল আন্দাজ চড়াই পড়িল। পথের দুই পাশেই অপেক্ষাকৃত ঘনসন্নিবিষ্ট জঙ্গল। জঙ্গলে নানাজাতীয় বৃক্ষলতাদির মধ্যে আমাদের চিনিবার মত কেবল কোথায়ও আমলকীবৃক্ষে অজস্র আমলকী ফলিয়া রহিয়াছে, কোথায় লম্বা লম্বা চীরের গাছ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া, কোথায়ও বা তেকাঠার কণ্টকময় জঙ্গল, বেশীর ভাগ পথে ডালিম-গাছের মত এক প্রকার গাছে হলুদে রংএর ছোট ছোট অজস্র ফুল আশপাশ আলো করিয়া রাখিয়াছে। জিজ্ঞাসায় জানিলাম, এই ফুলের নাম "কেশর"। ইহা হইতেই (?) কেশর বা জাফ্রাণ প্রস্তুত হয়! আবার স্থানে স্থানে পাহাড়ী গোলাপের কণ্টকময় লতাকুঞ্জ হইতে অজস্র গোলাপের সুমিষ্ট আঘ্রাণ, আগে যাইবার পথে আমা-দিগকে যথেষ্ট উৎসাহিত করিয়া তুলিল। এই গোলাপের একটি করিয়া পাপ্ড়ী, রং সাদা। এক একটি স্তবকে একসঙ্গে অনেকগুলি ফুল ফুটিয়া থাকে। এইরূপ নূতন নূতন দৃশ্যের মধ্য দিয়া আমরা ৪ মাইল দূরে "কল্যাণী" চটী অতিক্রম করিলাম। তার পর সেখান হইতে আরও ৪ মাইল অগ্রসর হইয়া "কুমরানা" নামক চটীতে পৌঁছিতে দ্বিপ্রহর অতীত হয় দেখিয়া সেখানেই আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলাম। এই চটীর-অবস্থা আদৌ ভাল নহে। একটিমাত্র ঘর, তাহাতে আবার অর্দ্ধেকাংশে, দোকানদার জিনিষপত্র সাজাইয়া রাখিয়াছে,

অপরাংশ যাত্রীর জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। "এ-পথে এইরূপ চটীই দৃষ্ট হইবে" ভগবান্ ও ফতে সিং উভয়েই আমাদিগকে এ কথা জানাইয়া দিল। গঙ্গোত্রীর পথে কালী কম্‌লীওয়ালার কেমন সুন্দর সুন্দর ধর্ম্মশালা ও আশানুরূপ সুব্যবস্থা আর এই যমুনোত্তরীর সুকঠিন যাত্রাপথে একেবারেই তাহার অভাব কি জন্য, তাহা আমাদের মোটেই হৃদয়ঙ্গম হইল না। বলা বাহুল্য, দোকানদারগণই যাত্রীর জন্য এই ঘর নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। ঘরের নীচে উঠানের এক পার্শ্বে একটি বাতাবী লেবুর গাছ ও আরও একটু নীচে দু-একটি আপেল ও কমলা লেবুর গাছ শোভা পাইতেছিল। দোকানের এক পার্শ্বে কড়াইশুঁটি ক্ষেতের উপরে হঠাৎ আমাদের সকলের নজর পড়িল। এত দিন পরে আহারকালে আজ নূতন তরকারীর আস্বাদ জুটিল। ইহা ছাড়া দোকানে গোলাকার ছোট ছোট মিছরীর আমদানী দেখিয়া দেড় টাকা মূল্যে দেড় সের খরিদ করিয়া রাখিলাম। কি জানি, আগের পথে যদি না পাওয়া যায়। ধরাসুর বড় ধর্ম্মশালায় কাল যাহা দুষ্প্রাপ্য হইয়াছিল, এই দুর্গম পথে আজ তাহা সুলভ দেখিয়া সকলেই সেদিনকার মত খুসী হইয়াছিলাম। কেবল একমাত্র অস্বস্তি—দিনের বেলায় এ স্থানে অসম্ভব মাছির উপদ্রব। বলা বাহুল্য, প্রতিক্ষণে ইহা যেমনই বিরক্তিকর, আহারকালে তেমনই আবার ঘোরতর অসহ্য মনে হইয়াছিল।

পরদিন প্রাতঃকালে পথে মধ্যে মধ্যে কেবল কয়েকটি ঝরণা এবং আগাগোড়া অগণিত চীর বৃক্ষের শন্‌শন্ আওয়াজের মধ্য দিয়াই চারি মাইল পথ চলিয়া আসিলাম। পাহাড়ী ব্যবসায়ীরা এ পথে ঝরণার ধারে ধারে এই সকল চীরবৃক্ষ হইতে তক্তা বাহির করিয়া জমা রাখিয়াছে। বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে ঝরণার ধারা প্রবল

হইয়া উঠিলে, এই তক্তাগুলিকে ইহারা স্রোতের মুখে ভাসাইয়া দিয়া নীচের দিকে সহজেই লইয়া যায়। এ ভাবে মজুরী বাঁচাইবার তীক্ষ্ণবুদ্ধি অবশ্যই পাহাড়ীদের পক্ষে প্রশংসার বিষয়, সন্দেহ নাই।

বেলা নয়টা আন্দাজ সময়ে আমাদের সম্মুখের এক প্রকাণ্ড চড়াইএর পথে, সকলেরই ক্ষিপ্রগতি, ক্রমেই যেন মৃদু-মন্থরে পরিণত হইল। পাঁচ মাইলব্যাপী ভীষণ চড়াই! পথের শেষ নাই, এ দিকে বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে রৌদ্রও তীক্ষ্ণতর হইয়া উঠিল। ডাণ্ডি-ওয়ালা সওয়ার-স্কন্ধে হাঁপাইতে হাঁপাইতে কিছুদুর উপরে গিয়াই সওয়ার নামাইয়া রাখে, ক্ষণিক বিশ্রাম করিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করে। ক্ষীণশরীরা বৃদ্ধা দিদি পরিশ্রান্ত হইলেও সুরো চাকর এবং আমার সহিত অগ্রে অগ্রে চলিয়া আসিয়া, বেলা বারোটা আন্দাজ সময়ে এই চড়াইএর শীর্ষদেশে উপস্থিত হইলেন। সঙ্গীদের আর আর সকলে—বিশেষভাবে দাদা ও বৌদিদি তখন চড়াইএর অর্দ্ধ-পথে ভগবান্‌কে সঙ্গে করিয়া উপরে উঠিতেছেন। ক্রমে ডাণ্ডি-ওয়ালাগণ সওয়ার লইয়া নিকটে পৌছিল। আজিকার পথে সওয়ার-দিগের অবস্থাও কাহিল দেখিলাম। প্রথমতঃ, দীর্ঘকাল একভাবে বসিয়া বসিয়া এই যানমধ্যে ইহাদের শরীর আড়ষ্টপ্রায়, তদুপরি চড়াইপথে বার বার ইহাদিগেকে লইয়া "উঠা নামা" করার অসহনীয় ধৈর্য্য, সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কষ্টপ্রদ এই বাহকদিগের শ্রম-জনিত শ্বাস-প্রশ্বাসের মুহুর্মুহু কাতরধ্বনি নীরবে শ্রবণ—ইহাদের পক্ষে সব দিক্ দিয়াই অস্বস্তির কারণ হইয়াছিল। জ্ঞাতি-পত্নী এইবার তাঁহার পরিবর্ত্তে দিদিকে সওয়ার হইবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিলেন। বলিলেন, "চড়াইপথে আজ আপনার যথেষ্ট ক্লেশ হইয়া থাকিবে। আমারও শরীর একেবারে আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে। এ অবস্থায়

এখনকার উতরাই-পথে স্বচ্ছন্দেই পদব্রজে নামিয়া চলিব।” অনিচ্ছা সত্ত্বেও আজিকার এ প্রস্তাব তিনি স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন।

এ দিকে এই শিখরদেশের অপর প্রান্তে পৌঁছিয়া কি দেখিলাম: দূরে চোখের সম্মুখে সারি সারি রজত-শুভ্র গিরিশৃঙ্গের নয়ন-মনোহর শোভা! মরি মরি, তুষারের ঢেউ দিয়া ইহাদের চিরোজ্জ্বল বিস্তৃতি একেবারে আকাশ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়া রাখিয়াছে। কোথাও এতটুকু মলিনতা নাই, অভ্রভেদী হিম-গিরির দিগন্ত-প্রসারী এই রজত-মুকুট রৌদ্রকিরণে তখন ঝলমল করিতেছিল। কিছুক্ষণের জন্য সকলেরই চক্ষু সেই দিকে আকৃষ্ট হইল। এ মরজগতের এক প্রান্তে প্রকৃতি যেন এরূপ দেখিয়া, চাহিয়া চাহিয়া একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। এতটুকু শব্দ নাই, লোকালয়-হীন এই পাহাড়ের সবই যেন সুষুপ্তির শান্তিময় ক্রোড়ে চিরদিনের জন্য সমাধি লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে!

এইবার আমরা ধীরে ধীরে উত্‌রাই-পথে নামিতে সুরু করিলাম। নীচের পথে ক্রমেই জঙ্গলের পর জঙ্গল ভেদ করিয়া বেলা ১৷৷টা আন্দাজ সময়ে ৪ মাইল দূরে “ডণ্ডালগাঁও”এ উপস্থিত হইলাম!

তখনও আর আর সঙ্গীরা পশ্চাতে রহিয়াছেন দেখিয়া ইত্যবসরে এখানকার ধর্ম্মশালার অবস্থা স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিয়া লইলাম। দুইখানি পাকা ঘর ও তৎসম্মুখে চারি হাত মাত্র প্রশস্ত একটু বারান্দাই যাত্রিগণের একমাত্র আশ্রয়। আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ একখানি ঘরে পূর্ব্ব হইতেই সুরাট-দেশীয় যাত্রী আসিয়া দখল করিয়া রাখিয়াছে, আর একখানি ঘর তালাবদ্ধ করিয়া রক্ষক মহাশয় কোথায় সরিয়া গিয়াছেন। সম্মুখ বারান্দায় ক্ষণেকের জন্য বিশ্রাম লইয়া দোকানের সন্ধানে বাহির হইলাম। একটু দূরে একখানি ছোট আটচালা। তন্মধ্যে দোকানদার কেবল আটা, চাউল, অল্পমাত্র

৩য় পর্ব্ব—

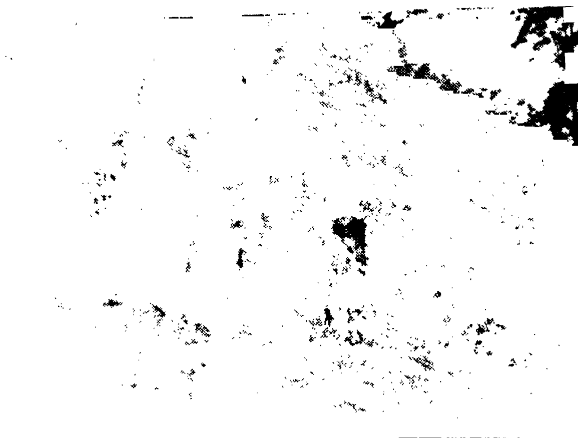


পর্ব্বত নিম্নে যমুনা নদী



নদীতটে পুষ্প-বৃক্ষ

৩য় পর্ব্ব—



জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ের দৃশ্য



পর্ব্বতের পাইন-বীথি

ঘৃত, ও চিনি এবং দু এক রকম মশলা রাখিয়াই যাত্রীর অভাব পূরণ করিতেছেন। "আমরা কয় জন যাত্রী," "কোন্ চটী পর্য্যন্ত আজ যাইতে হইবে।" ইত্যাদি কথাবার্ত্তায় যতদূর বুঝিতে পারিলাম, এখানে স্থানাভাব, সুতরাং আহারান্তে আগের চটীতে গিয়া রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা করাই তাহার মতে যুক্তিযুক্ত। রাত্রির বিশ্রাম, সে ত পরের কথা, এখানে পেটের চিন্তাই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। সারাদিন অন্নাহার জুটে নাই, তার পর কতক্ষণে আর আর সঙ্গীরা আসিয়া পৌঁছিবেন, বোঝাওয়ালারা আজ হয় ত অনেক পশ্চাতে আছে, ইত্যাদি অনেক কথাই মনকে বিশেষ করিয়া তোলপাড় করিতেছিল। বেলা আড়াইটা আন্দাজ সময়ে দাদা, বৌদিদি, ভগবান্ প্রভৃতি সকলেই দেখা দিলেন। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় সকলেই তখন ম্রিয়মাণ। থালা, ঘটী, বাটি, বগুনা প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্যই ত বোঝাওয়ালার স্কন্ধে। সে বোঝাওয়ালারা আজ কতক্ষণে আসিয়া পৌঁছিবে? সুখের বিষয়, আজ পথিমধ্যে অন্য কোন চটী নাই, সুতরাং নিশ্চয়ই তাহারা বরাবর এখানে আসিতেই বাধ্য হইবে। সকলেই একে একে নিঃশব্দে বারান্দায় উপবেশন করিলেন। কথা প্রসঙ্গে, "আজিকার চড়াই অতি সাংঘাতিক, যেন স্বর্গে উঠিবার সিঁড়ি" এ কথা দাদাকে জানাইলে তিনি জোরের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "তুমি ত স্বর্গের সিঁড়ি বলিয়াই ছাড়িয়া দিলে। আমার কিন্তু মনে হয়, এই কয় মাইল চড়াইএ আজ যেরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হইয়াছে, এইরূপ চড়াই যদি আরও দুই মাইল বেশী পড়িত, তবে যুধিষ্ঠিরের মত আমাদেরও সশরীরে নিশ্চয়ই স্বর্গলাভের অসুবিধা ঘটিত না।" অগ্রজের এই সময়োচিত উক্তিতে সকলেই সে সময়ে হাসিয়া উঠিলাম। সুরাটী যাত্রিগণ আমাদের দুর্দ্দশা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহারা তাঁহাদের ষ্টোভে প্রস্তুত

গরম দুগ্ধ (দেড়সের আন্দাজ হইবে) আনিয়া খাইবার জন্য আমাদিগকে বারংবার অনুরোধ করিলেন। আমরা ইতস্ততঃ করিলেও দলের মালিক কিন্তু সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন। পুরুষ কয় জন অর্থাৎ দাদা, আমি ও সুরো চাকরকে সম্মত করাইয়া তিনি (আমাদের পাত্রাভাব ছিল) তিনটি গ্ল্যাসে ভরিয়া সেই দুগ্ধ আমাদিগকে খাইতে দিলেন। অগত্যা তাঁহার অনুরোধ অবনত-মস্তকে স্বীকার করিয়া লইলাম। বেলা চারিটা আন্দাজ সময়ে বোঝাওয়ালা কুলীর দল আসিয়া পৌঁছিল। সেদিন সন্ধ্যাকালে দিনগত পাপক্ষয়ের মত একমাত্র খিচুড়ীই আমাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিল। তার পর নূতন চিন্তা, রাত্রিযাপনের স্থান কৈ? সুরাটী যাত্রীর কর্ত্তা মহাশয়ের সহিত খুবই আলাপ হইয়াছিল। তিনি একজন ধার্ম্মিক ও সদাশয় ব্যক্তি, সন্দেহ নাই। সঙ্গে স্ত্রীলোক দেখিয়া দোকানদারের অসম্মতিতেই তিনি পাশের ঘরটির তালা ভাঙ্গিয়া থাকিবার পরামর্শ দিলেন। অবশ্য উহাতে কোন আসবাবপত্রাদি নাই, এ কথা দোকান-দার পূর্ব্বেই আমাদিগকে জানাইয়া রাখিয়াছিল। বিদেশে অজানা পাহাড়ের মাঝখানে রক্ষকের সম্মতি না লইয়া তালা ভাঙ্গিয়া ফেলা নিরাপদ নহে মনে হইলেও, অন্যদিকে এতগুলি লোকের বরফের রাজ্যে উন্মুক্তস্থানে রাত্রিযাপন আরও বিপজ্জনক হইবে, ইহা নিঃসন্দেহ জানিয়াও ইতস্ততঃ করিতেছিলাম; ইত্যবসরে সেই সুরাটদেশীয় কর্ত্তামহাশয় নিজেই কর্ম্মচারী দ্বারা তালা ভাঙ্গিয়া আমাদের চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি দিলেন। এইরূপে সে রাত্রি স্বচ্ছন্দেই অতিবাহিত হইল।

পরদিন প্রত্যূষে চাবি ভাঙ্গিবার দণ্ডস্বরূপ দোকানদারকে চারি আনা পয়সা ইনাম দিয়া আগে যাত্রা করিলাম। সুরাটী যাত্রিগণ তৎ-পূর্ব্বেই আগেকার পথ ধরিয়াছেন। তীর্থযাত্রী সকলেই অবগত আছেন, সারাদিনের যাত্রা-পথের শ্রম যতই কঠিন ও গুরুতর হউক না কেন,

রাত্রিতে বিশ্রামের পর, পরদিনে সে শ্রম আদৌ মনে থাকে না। তাহা না হইলে তাঁহারা এইরূপ দুরারোহ কঠিন পার্ব্বত্য-পথে প্রতিদিন একভাবে কখনই অগ্রসর হইতে পারিতেন না। বিশ্বপতির এ দয়া বড় সামান্য নহে। আমরা আড়াই মাইল আন্দাজ আগে আসিয়া "সিমল" চটী পাইলাম। জিনিষ-পত্র সুলভ জানিয়া এখানে কিছু কিছু জিনিষ খরিদ করিয়া সঙ্গে লওয়া হইল। উৎকৃষ্ট ঘৃতের দর প্রতি সেরে এক টাকা পাঁচ আনা, অড়হর ও মুগের দাল যাহা অন্য যায়গায় বড় একটা পাওয়া যায় নাই, প্রতি সের যথাক্রমে চারি ও পাঁচ আনা মূল্যে সংগ্রহ হইল। তরকারীর মধ্যে আলু সুলভ, প্রতি সের দুই আনা মাত্র। কি জানি, আগের পথে যদি কিছু না পাওয়া যায়, সেই আশঙ্কায় আমরা প্রায় প্রত্যেক চটীতেই জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া এইরূপে নূতন দ্রব্যের সন্ধান লইতাম এবং সম্ভবমত এই সকল দ্রব্য বোঝাওয়ালার স্কন্ধে চাপাইয়া দিতে বাধ্য হইতাম।

সিমল চটী হইতে দেড় মাইল আসিয়া "গঙ্গানি" এবং গঙ্গানি হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে "খরাদ" চটী অতিক্রম করিলাম। এই সকল চটীর অবস্থা ক্রমশঃই সাংঘাতিক মনে হইল। এখানে পূর্ব্ব-দিক্ হইতে আগত দুইটি ঝরণার পুল পড়ে। তার পর কতকটা চড়াই উঠিয়া আগে যাইতে হয়। বামধারে যমুনার স্বচ্ছ প্রবাহ-ধারা এখান হইতেই তরতর শব্দে পাহাড়ের দুকূল ভাঙ্গিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। জলের রং নীল, তবে কতকটা কালো আভা-মিশ্রিত বলিয়াই মনে হইল। এই পবিত্র স্রোতস্বতীর তটসংযুক্ত পাহাড়ের ধার দিয়া নির্দ্দিষ্ট পথে, ক্রমান্বয়ে আমরা একের পর একে আগে চলিতে-ছিলাম। নদীর ওপারেও সেই আকাশচুম্বী বিরাট-দেহ পর্ব্বত সমানভাবে

আমাদের সহিত আগে গিয়াছে। কচিৎ দু' একটি পাহাড়ী কৃষক আশে-পাশের কথঞ্চিৎ ক্ষেত্রভূমিতে সে সময় লাঙ্গল চষিতেছিল। যাত্রীর জন্য ইহারাই আবার কেহ গরম দুগ্ধ রাখে। দু এক স্থানে আমরা ইহাদের নিকট হইতে ইহা ক্রয় করিয়া সেবন করিলাম। নদীর দুই ধারে কেবলই বিস্তৃত প্রস্তরখণ্ড—বেশীর ভাগ শ্বেতবর্ণের, কোনটি বা বেশী উজ্জ্বল দেখা যাইতেছিল। জলের গতি উদ্দাম, বিশেষতঃ এই সকল প্রস্তরখণ্ডের আঘাত পাইয়া যেখানে এই নীল জল আবার উচ্ছলিত ও উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে, সেখানকার দৃশ্য আরও মধুর ও উপর হইতে মনে হইল, ঠিক যেন তুষারের কণা চোখের সম্মুখে ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। দূরে উত্তরভাগে ইহারই উৎপত্তিস্থল পাহাড়ের মাথার উপরের তুষারশুভ্র শৃঙ্গগুলি সে স্থানের চিরন্তন মহিমা উদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছে। সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমরা কখনও উচ্চে, আবার কখনও বা নীচু পথে এই পবিত্র ধারার নিরন্তর কল-কল্লোল শুনিতে শুনিতে তিন মাইল পথ চলিয়া আসিলাম। তখন বেলা প্রায় সাড়ে বারোটা হইবে। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হওয়ায় এক প্রশস্ত ঝরণার ধারে একটি লম্বা 'ছপ্পর' দেখিয়া, আমরা আর অধিক দূর অগ্রসর হইলাম না। এখানে স্নানাহার সম্পন্ন করিতে ইচ্ছুক হইলাম। এ স্থানের নাম "কুত্‌নৌর" বা "জগন্নাথ" চটী। চটীর তিন দিক্ খোলা, কেবল পশ্চাদ্‌ভাগ ও মাথার উপরে কাঁচা লতা-পাতা দিয়া ঘেরা একটু আচ্ছাদন আছে। আশেপাশে ঝরণার জল শতধা বিভক্ত হওয়ায়, ইহার জমি এতই সেঁত্‌সেঁতে ও আর্দ্র যে, দোকানদার বাধ্য হইয়া ইহাতে খড় বিছাইয়া যাত্রীর মনোরঞ্জন করিতেছে। রাত্রিতে এই প্রকার চটীতে বিশ্রাম অপেক্ষা উপরের উন্মুক্ত শুষ্ক স্থান বোধ হয় বেশী আরামপ্রদ। এইরূপ মনে করিয়া যতশীঘ্র সম্ভব আহারাদি শেষ

করিয়া আগে যাইতে উদ্যোগী হইলাম। ইতিমধ্যে একদল হিন্দুস্থানী যাত্রী যমুনোত্তরী দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিল। বলা বাহুল্য, তাহাদিগকে ঘিরিয়া অধৈর্য্যের মত আমরা রাস্তা সম্বন্ধে অনেক কথাই জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিলাম। উত্তরে তাহারা মোটামুটি ইহাই জানাইল ;—"এখান হইতে দশ মাইল অর্থাৎ—'হনুমান' চটী পর্য্যন্ত পথ একরূপ 'চলন-সই,' উহার আগের পথ ক্রমশঃ ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়াছে। *সে সকল স্থানে খুবই সন্তর্পণে যাইতে হইবে, বিশেষ করিয়া রাস্তার এক স্থান শুধু যে বরফ-ঢাকা পড়িয়াছে, তাহা নহে, ধ্বসিয়া* রাস্তার চিহ্ন পর্য্যন্ত লোপ করিয়া দিয়াছে।" রাস্তার অবস্থা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। তাহারা আরও বলিল, "যমুনোত্তরীর চারি মাইল নীচেই 'মার্কণ্ডেয় আশ্রম'! সেখানে একদিন থাকিয়া প্রাতঃকালের দিকে যমুনোত্তরী গিয়া দর্শন করতঃ সেই দিনেই আবার ঐ আশ্রমে ফিরিয়া আসা উচিত। কারণ, সে স্থানে চারিদিকেই কেবল বরফ। রাত্রিতে এই বরফ বেশী জমিয়া রাস্তা বন্ধ করিয়া দিলে, ফিরিবার জন্য হয় ত সেখানে এই দুরন্ত শীতে কিছুদিন অপেক্ষা করিতে হইবে ইত্যাদি।" তাহাদের নিকটে কেবল একটি সংবাদে আমরা আশ্বস্ত হইলাম, রাজার তরফ হইতে এই সকল স্থানের বরফ কাটিবার জন্য ইতিমধ্যেই অনেক কুলী নিযুক্ত হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সুতরাং যাত্রিগণের আর অধিক দিন ভয়ের কারণ নাই।

অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময়ে আমরা এই জগন্নাথ চটী পরিত্যাগ করিয়া আগে চলিলাম। আর দেড় মাইল আগে যাইতে পারিলেই—"যমুনা" চটী ; সেখানেই আজ রাত্রি-যাপনের কথা আছে। জানি না, সে চটীর অবস্থা আবার কেমনতর! যমুনার তীরে তীরে এবারকার প্রায় এক মাইলব্যাপী পথ নানা-জাতীয় পুষ্পবৃক্ষে পরিপূর্ণ দেখিলাম।

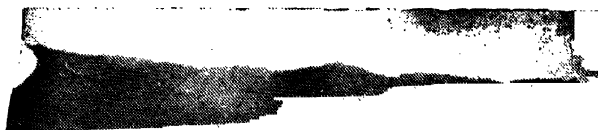
সৌন্দর্য্যে ও সৌগন্ধে সকলেরই মন ভরপূর হইয়া উঠিল। কোথাও লাল, কোথাও পীত, আবার কোথাও বা শ্বেতবর্ণের এই অজস্র গুচ্ছ গুচ্ছ পুষ্পরাশি এই নির্জ্জন পাহাড়তলী আলো করিয়া রাখিয়াছে। সাদা গোলাপের ত কথা নাই, স্তবকে স্তবকে ইহার শোভা অনুপম। সৌন্দর্য্য-সম্ভারে শাখা-প্রশাখা অবনত করিয়া এক একটি বৃক্ষ যেন এক একটি কুঞ্জের আকার ধারণ করিয়াছে। এইরূপ সুমধুর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আমরা যমুনা চটীতে উপস্থিত হইলাম। আজ সর্ব্বসমেত প্রায় ১০॥ মাইল পথ আসা হইল।

এখানে চারিটি ছপ্পর, তবে এ সকল ছপ্পরের চারিদিকেই বিলক্ষণ ঘেরা, দরজার স্থান কেবলমাত্র আবরণহীন। জমি প্রায় সমতল ভূমির উপরে, এজন্য কিছু সেঁতসেঁতে থাকিলেও আমরা কিছু কিছু খড় (এ দেশের লোকে 'পোরা' কহে) সংগ্রহ করিয়া বিছাইয়া লইলাম। সম্মুখে দুই বিঘা আন্দাজ প্রশস্ত শ্যামশষ্পশোভিত ময়দান চতুর্দ্দিকস্থ পাহাড়ের মধ্যস্থলে পড়িয়া স্থানটির শোভা-সমূহ অধিকতর বৃদ্ধি করিয়াছে মনে হইল। এক দিকে আঁকিয়া বাঁকিয়া সেই যমুনার উচ্ছল উজ্জ্বল নীল-ধারা উদ্দাম-গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। অপরাহ্ণকালীন সূর্য্যের শেষ রশ্মি তখন সর্ব্বত্রই—বিশেষ এই নীলজলের আশে পাশে আপনার বিদায়কালীন অপূর্ব্ব মায়াজাল বিস্তার করিতেছিল। নীচে নামিয়া আজ প্রথমে সকলেই যমুনার তুষার-শীতল জল স্পর্শ করিয়া ধন্য হইলাম! জলের দুই ধারেই, এমন কি, মধ্যে মধ্যেও নানা বর্ণের প্রস্তরখণ্ড বিস্তৃত ছিল। কোনটি শ্বেত, কোনটি গভীর লাল, আবার কোনটি বা মার্ব্বেল পাথরের মত মসৃণ ও উজ্জ্বল। বুঝি বা কালো জলের আশে-পাশে এইরূপ উজ্জ্বল চাকচিক্যময় প্রস্তরখণ্ড না বিছাইলে সৃষ্টিকর্ত্তার সৌন্দর্য্যের 'ষোল কলা' পূর্ণ হয় না! একটির পর একটি করিয়া

আমরা এই নীল জলের মধ্যগত একটি উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণের বৃহৎ প্রস্তরোপরি আসন বিছাইয়া নীরবে সন্ধ্যাবন্দনাদি শেষ করিলাম। দুকূল-ভাঙ্গা জলোচ্ছ্বাসের শব্দে কাণ যেন বধির হইয়া গেল। এই নির্ঝরিণীই ত নিস্তব্ধ পাহাড়কে প্রাণময় করিয়া রাখিয়াছে। বলা বাহুল্য, এখান হইতে কাহারও নড়িবার ইচ্ছা ছিল না। চক্ষু কেবল উদ্ভ্রান্তের মত এই নীল জলে অপলকদৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া আত্মবিস্মৃত হইল। প্রকৃতির রমণীয় রাজত্বে সে দিনের সেই পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের চলচ্চিত্র আজও যেন সজীব ও চির-নূতন হইয়া মনের মধ্যে ফুটিয়া রহিয়াছে !

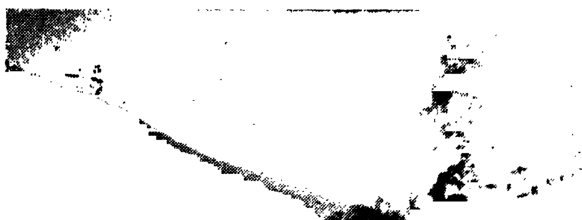
মসৌরী হইতে আমাদের মধ্যে প্রায় সকলেরই ঠোঁট ফাটিতে সুরু হয়। প্রভাতে মুখ ধুইবার কালে আজ সেই ঠোঁট দিয়া প্রথম আমার রক্ত বাহির হইল। "পাহাড়ে শীত" এ কথাটা হাড়ে হাড়েই অনুভব করিলাম। দিবসে অসংখ্য মাছি ও রাত্রিতে শয়নকালে "পিশু"—এই উভয়ের উৎপাত সহ্য করিয়াই যমুনোত্তরী-দর্শন-মানসে মসৌরী হইতে ৮০ মাইল দূরের এই যমুনা চটী একে একে সকলেই পরিত্যাগ করিলাম। প্রথমেই যমুনা নদীর পুল পার হইয়া স্রোতস্বতীকে দক্ষিণে রাখা হইল। দুই ধারেই কৃষ্ণবর্ণের পাহাড়, মধ্যে চির-উজ্জ্বল কল-কল-নিনাদিনী তটিনীর এই নীল জল উদ্দামবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। যতই ইহার তীর-সংলগ্ন সংকীর্ণ পথের ধার দিয়া আমরা আগে যাইতেছিলাম, ততই যেন কেবল এই পূত নির্ঝরিণীর সজীবতা চক্ষু-কর্ণ প্রত্যক্ষ করিয়া লইতেছিল। যাত্রার সার্থকতা ত ইহারই উৎপত্তি-স্থান দেখিয়া লইবার জন্য! জানি না, সে স্থানে কি অসীম সৌন্দর্য্য বিস্তৃত আছে। এখনও এখান হইতে প্রায় ষোল মাইল পথ আগে যাইতে হইবে। দ্বিগুণ উৎসাহে সকলেই যাত্রাপথ অতিক্রম করিতেছিলাম। আড়াই মাইল আগে "ওজিরির" ছপ্পর-ঘর পথিমধ্যে দৃষ্টিগোচর হইল। একখানি-মাত্র

দোকান, দোকানে যাত্রীর আবশ্যকমত চাউল, আটা, ঘৃত, চিনি প্রভৃতি আহার্য্য দ্রব্য বিক্রয়ার্থ সাজানো রহিয়াছে। বহুদিন পরে আজ এখানে "আখরোট্" ফল কিনিতে পাইলাম। বলা বাহুল্য, এগুলি আশপাশের বৃক্ষ হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে। দোকানদার বাঙ্গালী যাত্রী দেখিয়া হালুয়ার জন্য সুজীর আবশ্যক আছে কি না জিজ্ঞাসা করিল। হঠাৎ মসৌরী হইতে এত দূরে এ জঙ্গলের মাঝখানে সুজীর কথা শুনিয়া দর সম্বন্ধে আমরা একটু কৌতূহলী হইলাম। দর প্রতি সের এক টাকা মাত্র। বলিতে কি, টাকা সের সুজী লইয়া হালুয়া খাওয়ার সাধ আমাদের মধ্যে কাহারও হয় নাই। চটীর এক পার্শ্বে একটু উচ্চ স্থানে লাল রংএর ছিন্ন ছিন্ন বস্ত্রখণ্ডের অনেকগুলি ধ্বজা রোপণ দেখিয়া হঠাৎ আমার তিব্বতের স্মৃতিকথা মনে উদয় হইল। মানস-সরোবর ও কৈলাসের পথে স্থানে স্থানে প্রায়শঃ এইরূপ ধ্বজা-রোপণ দেখিয়া আসিয়াছিলাম। তবে কি এখানেও তিব্বতীদের বসবাস আছে? জিজ্ঞাসায় জানিলাম, এ স্থানের অধিবাসিগণ 'রোজপুত'। ইহারা "নরসিংহ-বীর"কে এইভাবে মানসিক করিয়া পূজা দেয়। ইহা ছাড়া দোকানদার সেখান হইতে পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে একটি মন্দির দেখাইয়া বলিল, ওখানে কালী-মায়ীর মূর্ত্তি আছে। রোজপুতগণ কালীমায়ীরও আবার উপাসক। এখান হইতে এক মাইল আন্দাজ আগে "ডবরকোট" চটী পার হইলাম। তার পর কিছু দূর যাইতে না যাইতেই যমুনা নদীর পুল পার হইয়া এইবার এক আকাশচুম্বী পাহাড়ের সম্মুখীন হইতে হইল। পাহাড়ের পর পাহাড় দেখিয়া এ পথের যাত্রীকে সন্ত্রস্ত হইলে চলে না। উপরে উঠিতেই হইবে। ঘন-সন্নিবিষ্ট ছায়া-শীতল জঙ্গলের মধ্যে ধীরে ধীরে সকলেই যষ্টির উপর ভর দিয়া চিহ্নিত পথ অতিক্রম করিতেছিলাম। বেশীর ভাগ মসৌরীর মত "রডোড্রেনড্রাম" বা বুরাস্





গঙ্গার পরপারের পর্ব্বতমালা





নদীর দুই দিকে পাহাড়ের ভিন্ন রূপ

৩য় পর্ব্ব—



দক্ষিণভাগের রজতগিরির দৃশ্য—নীচে নদী

ফুলের জঙ্গলই দৃষ্টিগোচর হইল। অন্যান্য বৃহদাকার পাহাড়ী বৃক্ষও আছে। এই ভাবে কিছুক্ষণ উপরে উঠিয়া এই পাহাড়ের শেষ সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে উপস্থিত হইলাম। তখন বেলা প্রায় দশটা হইবে। এক স্থানে প্রস্তর-গাত্রে লিখিত আছে, "যমুনোত্তরী ১১ মাইল, টিহিরী ৬৩ মাইল।" এই উপরের শৃঙ্গ হইতে সম্মুখে যমুনোত্তরীর অমলধবল তুষারগিরিশৃঙ্গগুলি দেখিতে কতই উজ্জ্বল ও মধুর! আমরা এখান হইতে দ্বিগুণ উৎসাহে অগ্রসর হইয়া এক মাইল আগে একটি ঝরণার পার্শ্বে 'বাণা'-গ্রাম অতিক্রম করিলাম। আমাদের নির্দ্দিষ্ট পথ হইতে গ্রামটি অনেক উচ্চে। পথের দুই পার্শ্বে কতকগুলি বৃহদাকার বৃক্ষে আমলকীর মত অজস্র ছোট ছোট ফল ধরিয়াছে দেখিয়া জিজ্ঞাসায় জানিলাম, ইহার নাম "চুলু"। এই চুলু ফল পাকিলে গ্রামবাসীরা খাইয়া থাকে। বেলা বারোটা আন্দাজ সময়ে পরিশ্রান্ত চিত্তে সকলেই "হনুমান" চটী আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

এ পর্য্যন্ত প্রায় নয় মাইল পথ চলিয়া আসিয়া এখানেই আহারাদি সম্পন্ন করিয়া লইবার জন্য সকলেই ব্যস্ত ও কাতর হইয়া পড়িলাম। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে প্রায় দশ বারো জন গুজরাটী যাত্রী (বেশীর ভাগ স্ত্রীলোক) এখান হইতে আগের পথে রওনা হইল। আহারাদি না করিয়াই ইহাদের অগ্রগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, ইহারা "এ চটীতে অনেক অসুবিধা, 'মার্কণ্ডেয় আশ্রম' অর্থাৎ পরের চটীতে গিয়া আহারাদি করা হইবে" এইরূপ মত প্রকাশ করিলেন। সাথের সাথী "ভগবান্" ও ফতে সিং" এ স্থলে আমাদিগকে নিকটে ডাকিয়া জানাইয়া দিল, "আজ এখানে আহারাদি বন্ধ রাখিয়া মার্কণ্ডেয় আশ্রমে বরাবর যাওয়া হউক।" কারণ বুঝিতে বাকি রহিল না। গুজরাটী যাত্রীর দল আগে গিয়া মার্কণ্ডেয় আশ্রমের ঘরগুলি দখল করিয়া রাখিলে আমাদের কষ্টের সীমা থাকিবে না। হয় ত উন্মুক্ত পাহাড়ে রাত্রিযাপন করিতে বাধ্য হইতে হইবে।

বলা বাহুল্য, আমাদের মত গৃহী যাত্রীর পক্ষে ইহা আদৌ সহজসাধ্য ছিল না, যমুনোত্তরী দর্শন করিতে গেলে মার্কণ্ডেয় আশ্রমে একরাত্রি বিশ্রাম করিয়া পরদিন প্রাতে যাওয়াই নানা কারণে সঙ্গত, ইহা জানিয়া অবধি আমরা সেই উপায়ই অবলম্বন করিব স্থির করিয়াছিলাম। অগত্যা আগের চটী উদ্দেশেই সকলের যাওয়া সাব্যস্ত হইল। দ্বিপ্রহরের ক্ষুৎপিপাসা রাত্রির ভাবনায় দমন রাখিয়া এখান হইতে আগে চলিলাম। আরও চারি মাইল আগে মার্কণ্ডেয় আশ্রম। দিন থাকিতে কোনও না কোন সময়ে অবশ্যই সেখানে উপস্থিত হইতে পারিব, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়া হনুমান চটী পরিত্যাগ করিলাম।

দলের মধ্যে আমিই দ্রুতগামী ছিলাম। ভগবান ও ফতে সিং সাবধান করিয়া দিল, আজিকার পথ হয় ত অনেক স্থলে ধ্বসিয়া থাকিবে, সুতরাং ডাণ্ডি ও সওয়ার লইয়া গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে তাহাদের বেশী বিলম্ব হইতে পারে, এমত অবস্থায় গুজরাটী যাত্রিদলকে পশ্চাতে রাখিয়া আগেকার চটীর ঘর দ্রুত'দখলের জন্য আমার উপরেই ভার পড়িল। সত্য বলিতে কি, এক মাইল পথ আগে যাইতে না যাইতেই গুজরাটী দলের সহিত ক্রমশঃই সাক্ষাৎ হইতে লাগিল। দেখিলাম, পাহাড়ের গায়ের সংকীর্ণ পথের অবস্থা আজিকার দিনে খুবই সাংঘাতিক। অধিকাংশ স্থানেই উপর হইতে "ধ্বস্ ভাঙ্গা" রাশি রাশি প্রস্তরখণ্ড গড়াইয়া আসিয়া পথের উপরেই স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে। সে সকল স্থান অতিক্রম করিয়া আগে অগ্রসর হওয়া কতদূর বিপজ্জনক, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই উপলব্ধি করিয়া থাকিবেন। গুজরাটী দলের অধিকাংশই 'কাণ্ডি' সাহায্যে পথ চলিতেছিলেন। কাণ্ডিওয়ালা এ সকল স্থানে তাঁহাদিগকে কাণ্ডি হইতে নামাইয়া দিয়াছে। যাত্রিগণের প্রত্যেককেই ডান দিকে পাহাড়ের গায়ে হাতের উপর ভর দিয়াই এই কঠিন অসংলগ্ন প্রস্তরখণ্ডের উপর পদক্ষেপ

করিতে হইতেছে। একটু অসাবধানেই পদদ্বয় গড়াইয়া নীচে নামিয়া যাইতে পারে। পাশে দাঁড়াইবার এমন একটু স্থান নাই, যেখানে এই সকল যাত্রীকে কাণ্ডিওয়ালা হাত ধরিয়া পার করিয়া দেয়। যাত্রীর দুর্দ্দশা পাশের যাত্রী ভিন্ন দেখিবার কেহই ছিল না। পথের ভীষণতা ক্ষণেকের জন্য মনকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। আমাদের স্ত্রীলোক সহযাত্রীরা পশ্চাতে এই পথ ধরিয়াই ত আসিতেছেন ! জানি না, কে তাঁহাদের সহায় হইবে। এই বিপদের পথ পার হইয়া কোন যাত্রী হাঁফ ছাড়িতেছেন, কেহ বা অন্তরে ভয় ও মুখে হাসি ফুটাইয়া অপরকে সাহস দিতেছেন—"ইচ্ছা করিয়াই ত এই দুরারোহ যমুনোত্তরী তীর্থপথের পথিক হইয়াছি, সুতরাং কঠিন স্থানগুলি হাসিমুখে পার হইব" ইত্যাদি কতই না সান্ত্বনার আভাস চোখে মুখে সুস্পষ্ট ফুটিয়া উঠিতেছে। খুবই সন্তর্পণে আমি ইহাদিগকে, একে একে অতিক্রম করিলাম। শেষের যাত্রী আমার দ্রুত গমনের অর্থ বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কারণ, আমাকে আগে যাইতে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপ লোগোঁ খানা পীনা বনায়া নহিঁ ?" আমি বলিলাম, "মার্কণ্ডেয় আশ্রমে পৌঁছিয়া সেখানেই আহারাদি করিবার ইচ্ছা আছে।"

এইরূপে আগে যাইতে যাইতে সত্যই এবার একা হইয়া পড়িলাম। প্রায় দুই মাইল পর্য্যন্ত এই পথের অবস্থা অতীব বিপজ্জনক মনে হইল। এক এক স্থানে শুধু ধ্বস-ভাঙ্গা স্তূপীকৃত প্রস্তরখণ্ড নহে, একসঙ্গে অনেক-গুলি ঝরণা নামিয়া আসায় উঁচুনীচু পথগুলিকে অত্যন্ত পিচ্ছিল, আবার কোথাও বা অত্যধিক মাটীর অংশে বিলক্ষণ কর্দ্দমাক্ত করিয়া রাখিয়াছে। সে সকল স্থানের আঁকা-বাঁকা পথে আবার খাড়া চড়াই থাকায় উঠিতে নামিতে উভয় সময়েই যথেষ্ট সাবধানতার আবশ্যক করে। যাহা হউক, খুবই সন্তর্পণে দুই পাহাড়ের মধ্যস্থল দিয়া নিঃশব্দে অগ্রসর হইতেছিলাম।

এক স্থানে প্রস্তরগাত্রে "যমুনোত্তরী ৭ মাইল" লিখিত দেখিয়া ক্রমেই গন্তব্য স্থানের সমীপবর্ত্তী হইতেছি জানিতে পারিয়া মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলাম, টিহিরী-রাজের তরফ হইতে নিযুক্ত কুলীর দল নিতান্ত সাংঘাতিক রাস্তাগুলিকে মধ্যে মধ্যে মেরামত করিয়া দিতেছিল, কিন্তু সে মেরামত অতি সামান্য বলিয়া মনে হইল। বর্ষার প্রবল স্রোতে আবার তাহা যে এখনকার মত সমান দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবে না, তাহা কিরূপে বলা যাইতে পারে ?

আজিকার পথে দুই দিকে দুই রূপে পাহাড় প্রত্যক্ষ করিলাম। বামদিকে মুণ্ডিতকেশ, সমাধিমগ্ন যোগীর মত পাহাড়ের বিরাট দেহখানি একবারে নগ্নাবস্থায় পড়িয়া আছে, কেবল প্রশস্ত ললাটে মাঝে মাঝে তুষারের বিস্তৃতি বিভূতির মতই ঝক্ ঝক্ করিতেছিল, আর দক্ষিণ ভাগে ঠিক ইহার বিপরীত অর্থাৎ বৃহদাকার বৃক্ষলতাদি-শোভিত উপবনের পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য বিস্তৃতি লাভ করিয়া রহিয়াছে। পাশাপাশি পাহাড়ের এ প্রকার বিভিন্ন রূপ এত দিন পর্য্যন্ত কই দেখি নাই।

স্থান হিসাবে রুচির পার্থক্যও অনেক স্থলে দৃষ্টিগোচর হয়। বুঝি বা সেই কারণে আজ লোকালয় হইতে এত দূরে এই হিমগিরি-নির্ঝরিণীর পবিত্র তীর্থসান্নিধ্যে উপস্থিত হইয়া রোগ-শোক-তাপ-ক্লিষ্ট মানবের অন্তর এই ভাবে ধুইয়া মুছিয়াই পবিত্রতায় ভরিয়া উঠে !

ক্ষুধা-তৃষ্ণায় নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলাম। চোখের সম্মুখে তুষার-শৃঙ্গের উপরে লক্ষ্য রাখিয়া চিহ্নিত পথে দুই ঘণ্টা কাল অতিক্রম করিয়াও ৪ মাইল দূরের মার্কণ্ডেয় আশ্রমে এখনও পৌঁছিতে পারিলাম না। পথে এমন এক জন যাত্রী বা পাহাড়ীর দর্শনও আজ দিন বুঝিয়া কি এতই দুর্ল্লভ হইয়া উঠিয়াছে ? কোন জঙ্গলের পথ ধরি নাই ত ? এইরূপ নানা প্রশ্নে মনকে সংশয়াকুল ও চিন্তিত রাখিয়া, অন্যমনস্কভাবে বেলা তিনটা আন্দাজ সময়ে দুই দিকে ধাবিত দুইটি পথের সন্নিকটে উপস্থিত হইলাম।

সম্মুখেই গন্তব্য পথ মনে করিয়া উপরের দিকে কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছি, শরীর ও মন ক্ষুধা-তৃষ্ণায় বিলক্ষণ প্রপীড়িত! চটী পর্য্যন্ত না পৌঁছিলে প্রতীকার নাই, হঠাৎ পশ্চাদ্দিকে দূর হইতে "বাবু! বাবু!" ধ্বনি কর্ণে পৌঁছিল। ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলাম, এক পাহাড়ী অঙ্গুলী-সঙ্কেতে দাঁড়াইতে বলিতেছে। এই নিভৃত পার্ব্বত্য-পথে মনুষ্যকর্ণের আহ্বান সে সময়ে কত মিষ্ট বলিয়াই না মনে হইল! নিকটে আসিলে দেখিলাম, লোকটি অপর কেহ নহে, এক পাহাড়ী ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা মাত্র। বালিকা প্রথমেই আমাকে যুক্তকরে সেলাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপ্ কাঁহা জাতে হ্যাঁয়? আপ্‌কা রাস্তা নীচে ছুট্ গয়া।" এ কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, "নীচে কই কোন গ্রামের চিহ্ন দেখিতে পাই নাই, তাই এ পথে আসিতেছিলাম। 'মার্কণ্ডেয় আশ্রম' আর কত দূরে?" সে বলিল,"আইয়ে, আপকো পথ দিখায়কে লে চলে।" এই নিরক্ষর পাহাড়ী বালিকার পরোপকারবুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। প্রথমে ত রাস্তার ভুল ধরিয়াই দিল, তার পর অযাচিত-ভাবে সঙ্গে লইয়া মার্কণ্ডেয় আশ্রম পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া দিবে, এ যে পথহারা পথিকের পক্ষে একবারেই ধারণাতীত! বালিকা যৌবনোন্মুখী,এই নির্জ্জন পার্ব্বত্যপথে যাত্রী ভুলাইয়া কোন দুরভিসন্ধিতে অন্যত্র লইয়া যাইবার মতলব করিয়াছে কি না (অন্যত্র হইলে সেইরূপ সন্দেহই হইয়া থাকে), বুঝিবার জন্য তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার তাহার মুখের পানে চাহিলাম। 'কপালকুণ্ডলা'র সেই ভাষা—'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ?' সেই উপন্যাসের বর্ণনাকাহিনীর মত সে সময়ে আমার ঠিক মনে হইল, কই, এ পাহাড়ী বালিকার চোখে মুখে কোনখানে এতটুকু লজ্জা বা সঙ্কোচ কিছুই ত দেখা যাইতেছে না। এ যে শুধু অসহায় পরিশ্রান্ত তীর্থপথ-যাত্রীদের একমাত্র সহায়ক—সারল্য ও সৎসাহসের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি।

নিঃশব্দে তাহার সহিত ফিরিয়া আসিয়া নীচের পথে নামিয়া চলিলাম। বালিকাই প্রথমে আবার কথা তুলিল, "আপ্ উপর মে জহা জাতে রহে, উস্ গাঁও কা নাম 'খরশালী' হ্যায়। উস্ গাঁও মে জানে সে লৌটনা পড়্তা।" পথ ভুলিয়া যে দিকে যাইতেছিলাম, সে দিকের গ্রামের নাম 'খরশালী'! আরও শুনিলাম, ঐ গ্রামে এক্ষণে থাকিবার স্থান পাওয়া যাইত না। কারণ, "শীতলা মায়ী কী প্রকোপ হ্যায়।" ইহার জন্যই বালিকাটি আমাকে দূর হইতে ডাকিতে বাধ্য হইয়াছে। সহর হইতে এত দূরে এমন পার্ব্বত্য-ঝরণা-প্রবাহিত স্বাস্থ্যকর গ্রামে আবার শীতলা মায়ীর প্রকোপ হইয়াছে শুনিয়া ক্ষণেকের জন্য মনটা অন্যমনস্ক হইল। বেলা সাড়ে তিনটা আন্দাজ সময়ে 'মার্কণ্ডেয় আশ্রমে' উপস্থিত হইলাম। বালিকাটি এবার কিন্তু চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে একবার জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু, এক আধেলা ভিক্ষা দিজিয়ে গা?" এক মাইল পথ সঙ্গে আনিয়া একটি অর্দ্ধ পয়সার জন্য এই সকরুণ মিনতি, আজিকার যুগে নিতান্ত অসহায়, অজানা তীর্থপথ-যাত্রীদের জন্য এমন করিয়া কে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে, জানি না। বখ্‌শিস্-স্বরূপ আমি কেবল পকেট হইতে একটি দুয়ানি মাত্র বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলাম। প্রথমে সে উহা লইতে চাহিল না, বলিল, "আপ কেয়া দেতে হ্যায়?" চটীর লোকে যখন ইহার মর্ম্ম তাহাকে বুঝাইয়া দিল, সে যেন আনন্দে বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে বার বার সেলাম ঠুকিয়া একবারেই বিদায় লইল।

অনাহারে, তৃষ্ণায় সে দিন আমার শুষ্ক কণ্ঠ হইতে প্রথমে কথা বাহির হয় নাই। দোকান হইতে অর্দ্ধপোয়া চিনি সংগ্রহ করিয়া তাহার সরবৎ পানান্তে প্রকৃতিস্থ হইলাম। এ দিকে আমার সহযাত্রিগণ কত-ক্ষণে আসিয়া পৌঁছিবেন, তাহাও এক্ষণে চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে।

দীর্ঘ তেরো মাইল পথ, পথের শেষ অংশে কেবলই আজ ধ্বসভাঙ্গা নগ্ন পাহাড়, দেখিতে অনেকটা তিব্বতের কৈলাস-তীর্থের আশপাশের মতই মনে হইল। এই মার্কণ্ডেয় আশ্রমের ধর্ম্মশালাটিকে কেহ কেহ "জানকী বাঈর ধর্ম্মশালা" বলিয়া থাকেন। শুনিলাম, বোম্বাইনিবাসী 'জানকী বাঈ' ইহা বহু অর্থব্যয়ে নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। অতি দুর্গম, কঠিনতম তীর্থে যেখানে কালীকম্‌লীওয়ালারও দৃষ্টির অভাব, সে সকল শীতবহুল স্থানের এই ধর্ম্মশালা অসহায় যাত্রিগণের পক্ষে কত-দূর আশ্রয়, তাহা এক মুখে বলিবার নহে।

ধর্ম্মশালার ইমারত পাকা, দ্বিতল, উপরে ও নীচে দুই খানি করিয়া মোট চারিখানি ছোট ছোট ঘর। ঘরগুলির সংলগ্ন সম্মুখভাগে প্রশস্ত বারান্দা, সুতরাং ঘরে যাত্রী ভরিয়া গেলে এই বারান্দায়ও যাত্রিগণ স্থান পাইতে পারেন। তবে উপরের মেঝেতে সমস্তই 'তক্তা' বিছানো আছে। একটু জল ফেলিলেই নীচে পড়িয়া থাকে। অনেক কষ্টে নীচের একখানি ঘর খালি পাইলাম। তাহাতেই লাঠি, জামা, গায়ের কাপড় ইত্যাদি যেথা-সেথা ছড়াইয়া রাখিয়া ঘরখানি দখল হইয়াছে (নতুবা অন্য যাত্রী ভরিয়া যায়!), এরূপভাবে ব্যবস্থা রাখিয়া, আমার সহযাত্রিগণের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

সন্ধ্যা পাঁচটা আন্দাজ সময়ে বৃদ্ধা দিদি, দাদা ও বৌদিদি প্রভৃতি সকলেই একে একে আসিয়া দর্শন দিলেন। সকলের মুখ শুষ্ক, পদদ্বয় নিতান্ত অবসন্ন। আর বোঝাওয়ালাদের ত কথাই নাই বোঝা স্কন্ধে তাহারা তখন কত দূরে কে জানে। রাত্রির অন্ধকারে নয় ঘটিকা আন্দাজ সময়ে হাঁফাইতে হাঁফাইতে বোঝা নামাইয়া তাহারা যখন আপনাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিল, তার পর আমাদের দিনগত পাপক্ষয়ের আয়োজন। বলিতে কি, সে দিনকার দুঃখ-ক্লেশ আমাদের

মত সমতলদেশবাসীর পক্ষে নিতান্ত অসহনীয় বলিয়াই সকলের মনে হইয়াছিল।

পরদিন ১৪ই বৈশাখ, অক্ষয়তৃতীয়ার শুভ পুণ্য বাসরে যমুনোত্তরীর মন্দিরদ্বার সাধারণের জন্য সর্ব্বপ্রথম উন্মুক্ত করা হয়। এ দিনে আমরা মার্কণ্ডেয় আশ্রমে সম্পূর্ণ বিশ্রাম লইয়াছিলাম। ধর্ম্মশালার সম্মুখভাগে কিছু দূরেই যমুনা নদীর তুষার-শীতল ধারা তর তর বেগে নীচে নামিয়া যাইতেছে। একটু উপরিভাগে এক প্রস্তর-গহ্বরে ক্ষীণ উষ্ণপ্রস্রবণ ঝির ঝির শব্দে জমিয়া জমিয়া যাত্রিগণের স্নান ইত্যাদির জল জোগাইয়া থাকে। এই জলে বিলক্ষণ গন্ধকের গন্ধ বিদ্যমান। আশেপাশে দুই তিন বিঘা আন্দাজ গম, যব ও সরিষার ক্ষেত্রভূমি। সরিষার ফুলকে আমরা এ দিনে ভাজি করিয়া খাইয়াছিলাম। মসৌরী হইতে প্রায় ৯২ মাইল দূরের এই লোকালয়-বিহীন চটীতে দোকানে চাউল, আটা প্রভৃতি সমস্ত আহার্য্য দ্রব্যই একপ্রকার সুলভ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। চাউল ও আটা প্রতি সের পাঁচ আনা, ঘৃত, সুজী, চিনি ও আলুর দর প্রতি সেরে যথাক্রমে দুই টাকা, আট আনা, ছয় আনা ও এক আনা মাত্র। কেরোসিন তৈল প্রতি বোতল আট আনা ও দুগ্ধ প্রতি সের ছয় আনা মাত্র। এ দিকের পথে, ঝরণার জলে অড়হর ডাইল আদৌ সিদ্ধ হয় না। সুতরাং দাল খাওয়ার সাধে বঞ্চিত থাকিতে হয়।

কোন চটীতে এক দিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম লইলেই কুলিগণকে, দরের চুক্তি হিসাবে আহার্য্য যোগাইতে হয়। অগত্যা আমাদের ডাণ্ডিওয়ালা ও বোঝাওয়ালার প্রত্যেক কুলিকেই ।৶০ আনা হিসাবে ১৫ জনকে মোট ৪৷৶০ এখানে অতিরিক্ত দিতে হইল।

পরদিন প্রভাতে সকলেরই যমুনোত্তরী দর্শনের কথা। সে পথ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও স্থানে স্থানে বিশেষভাবে তুষারাবৃত বলিয়া যাত্রিগণ

ডাণ্ডি সহযোগে সেখানে যাইতে অক্ষম। অগত্যা ভগবান্ সিং ও ঐ-স্থানের অন্যান্য যাত্রীর পরামর্শ মত, আমাদের সহযাত্রী চারি জন স্ত্রীলোকের জন্য চারিখানি ‘কাণ্ডির’ ব্যবস্থা করা হইল। মনুষ্যস্কন্ধের এই যান-সাহায্যে সঙ্কীর্ণ পথ অতিক্রম করা যাত্রীদের পক্ষে বরং সহজ, ডাণ্ডি লইয়া চারি জন লোকের পাশাপাশি যাইবার উপায় নাই। কাণ্ডিওয়ালা অনেকেই এই চটীতে যাত্রী লইবার জন্য ব্যস্ত। যমুনোত্তরী দর্শন করাইয়া পরদিন আবার এই স্থানে ফিরাইয়া আনিবে, এইরূপ চুক্তিতে প্রতি কাণ্ডি পিছু ১৷।৴ দর স্থির করিয়া আমরা বেলা দশটা আন্দাজ সময়ে সকলে রওনা হইলাম। ডাণ্ডি ও ডাণ্ডিবাহক চটীতেই রহিয়া গেল, কেবল ফতে সিং ও আরও তিন জন মাত্র বাহক আমাদের সঙ্গে সঙ্গে পথিমধ্যে সাহায্য করিয়া আগে লইয়া যাইবে, এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করায়, আমরা তাহাদিগকে সঙ্গে লওয়া আবশ্যক মনে করিলাম, বোঝার প্রয়োজনে বোঝাওয়ালাও সঙ্গে চলিল, তবে অনাবশ্যক বোধে বিছানা পত্র ও কয়েকটি বাসন-পত্র ভিন্ন অন্য সকল আসবাবই ডাণ্ডিওয়ালার জিম্মায় চটীতে ছাড়িয়া দিয়া অনেকাংশেই বোঝা হাল্‌কা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

এ স্থলে একটি কথা পাঠকবর্গকে জানাইয়া দেওয়া আবশ্যক মনে করি। সাধারণতঃ এ সকল স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র “মচ্ছড়ের” (শুধু মাছি বা-পিশু নহে) উপদ্রবে যাত্রিগণ প্রায়ই উত্ত্যক্ত হইয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, অসাবধানতা বশতঃ আমি এ যাবৎ ষ্টকিং বা মোজা ব্যবহার না করিয়াই এ পথে চলিয়া আসিতেছিলাম। গত কল্য এই মচ্ছড়-জাতীয় ক্ষুদ্র জীবের দংশনে আমার পদদ্বয়ের অনাবৃত স্থান হইতে অলক্ষ্যে স্থানে স্থানে রক্ত বাহির হইয়াছিল। শুনিলাম, এই ক্ষত বেশী হইলে শুধু যে পথ চলা অসাধ্য হইবে, তাহা নহে, দুষ্ট ক্ষত শীঘ্র সারিবার উপায় থাকে না। এজন্য এখন হইতে অবশ্য এ বিষয়ে সাবধান হওয়া আবশ্যক

মনে করিলাম। আজিকার দিনে আমাদের সহযাত্রিণী অর্থাৎ বৃদ্ধা দিদি, বৌদিদি, বন্ধু পত্নী ও জ্ঞাতি-পত্নী প্রত্যেকেই কাণ্ডির উপরে প্রথম সওয়ার হইলেন। সর্ব্বশরীর কাণ্ডির মধ্যে বসাইয়া দিয়া, মনুষ্যপৃষ্ঠে বোঝার মত এক ভাবে জীবন্ত বসিয়া বসিয়া শরীর নিতান্ত অসাড় হইয়া যায়, কিন্তু নিরুপায়! এই বাহন ভিন্ন এই সকল পথে স্ত্রীলোকের ত আর কোন গতি নাই। সকলেই একে একে নিঃশব্দে আগের পথে অগ্রসর হইলাম।

পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্য দিয়া দুরন্ত চড়াই উৎরাই পথ এতদূর অতিক্রম করিয়া আসিলাম, মনে করিলে কষ্টের অবধি নাই, শেষে কি এই চারি মাইল মাত্র বিপজ্জনক রাস্তার ব্যবধানে আমাদের চির-আকাঙ্ক্ষিত যমুনোত্তরী দর্শন অসম্পূর্ণ রহিবে? ইহা কখনই সম্ভবপর মনে হইল না। অর্দ্ধ মাইল আন্দাজ আগে আসিয়া গান্ধারী নদীর পুল পার হইলাম। চারি জন কাণ্ডিওয়ালার প্রত্যেকেই সুস্থকায় ও বলিষ্ঠ। তথাপি আজিকার দুরারোহ প্রস্তরখণ্ডের স্তূপের মধ্যে স্কন্ধে মানুষের বোঝা লইয়া উঁচু-নীচু পথে উঠা-নামা করিতে প্রত্যেকেই বিলক্ষণ গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া উঠিল। চারি জন সওয়ারের মধ্যে বৃদ্ধা দিদিই একমাত্র ক্ষীণ-শরীরা, সুতরাং ওজনে সর্ব্বাপেক্ষা হাল্কা। আর আর সওয়ার-ত্রয়ের ওজন বড় কম ছিল না। বিশেষ করিয়া আমার পূজনীয়া বৌদিদির সমধিক স্থূল-শরীরের ভার কাণ্ডিওয়ালার পক্ষে ক্রমশঃই অসহ্য হইয়া উঠিল। প্রত্যেক পনেরো মিনিট যাইতে না যাইতেই সে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে। তাহার এই মুহুর্মুহু বিশ্রামের ফলে সকলেরই অগ্রগমনে বাধা জন্মিল। অবশেষে বৃদ্ধা দিদির (হাল্কা ওজনের) বাহকের উপরেই সকলেরই নজর গেল। বিশেষ করিয়া বৌদিদির কাণ্ডিওয়ালা বলিতে আরম্ভ করিল, "দর যখন সকলেরই সমান, তখন হাল্কা মানুষ লইয়া একা সেই বা কেন বরাবর আগে

যাইবে?" ভারী সওয়ার অদল-বদল করিয়া না লইলে আগে যাওয়া সে সময়ে 'মুশ্‌কিল' ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায় দেখিয়া, আমরা এ প্রস্তাবে সায় দিলাম। ফলে বৃদ্ধা দিদির বাহকের সহিত অনেক বিবাদ-বচসার পরে সে সওয়ার বদল করিতে স্বীকার পাইল। পরিণাম ইহাই হইল, সকলেই বৃদ্ধা-দিদিকে কেবল স্কন্ধে লইতে চাহে। দিদির পক্ষে প্রত্যেকবার নামিয়া নামিয়া সকলের স্কন্ধে উঠা এক দিকে যেমন অধিকতর বিরক্তিকর, অন্যদিকে ভারী শরীরে বৌদিদি আমার (যাহারই স্কন্ধে উঠেন) দুঃখের কথা বলিতে কি, ক্রমশঃই পিছাইয়া পড়িতে লাগিলেন। তাঁহার জন্য সকলেই দাঁড়াইয়া যাইতে বাধ্য হয়েন। এইরূপ অবস্থায় বৌদিদিই ক্রমে বাঁকিয়া বসিলেন, "আমার ভারী ওজনের জন্যই ত এই বিবাদ, আমার ত আর স্বস্তির সীমা নাই! ঝুড়ীর মধ্যে ঠাসা ফুল-কপির মত একভাবে বসিয়া বসিয়া আমার 'গা-গতর' ইহার মধ্যেই ব্যথায় ভরিয়া উঠিয়াছে!" সঙ্গে সঙ্গে কাণ্ডি হইতে নামিয়া পড়িয়া "পদব্রজে যাইতে যে অনেক সুখ" এ কথা বার বার উচ্চারণ করিতে বিস্মৃত হইলেন না। আমরা পদব্রজের যাত্রী, বেশ স্বচ্ছন্দ-চিত্তেই ইঁহাদের এই কৌতুক-রঙ্গ দেখিতে দেখিতে আগে যাইতেছিলাম, কিন্তু বৌদিদির কথায় সে সময়ে হাস্য সম্বরণ করিতে অক্ষম হইলাম।

বৌদিদি পদব্রজেই চলিলেন। কাণ্ডিওয়ালা খালিবোঝায় চলিতে থাকে দেখিয়া আমার অগ্রজ মহাশয় (সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন) বৌদিদির পরিবর্ত্তে নিজেই কাণ্ডির উপর চাপিয়া বসিলেন। বোধ হয়, কাণ্ডিচড়ার সুখ ও মজুরীর সার্থকতা সে সময়ে তাঁহার মনে আসিয়া এককালীন উপস্থিত হইয়াছিল। সওয়ার বদল করিয়া বাহক কতকটা স্বস্তি অনুভব করিলেও নিশ্চয় বলিতে পারি, বাহক-স্কন্ধে বসিয়া অগ্রজ

মহাশয়ের বৌদিদির প্রতি বারম্বার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি সে সময়ে তাঁহার পদব্রজে যাত্রার পক্ষে বিলক্ষণ সহায়তা করিয়াছিল।

সরু রাস্তার উপরে অনেক স্থলেই বরফ জমিয়া পথ পিচ্ছিল করিয়া রাখিয়াছে। বৃদ্ধা দিদিকে স্কন্ধে রাখিয়াই কাণ্ডিবাহক স্বচ্ছন্দে সে সব স্থল অতিক্রম করিয়া চলিল। কাণ্ডি উঠিতে বিরক্ত হইলেও বরফের মধ্যে পা দিতে দিদি কিন্তু পারত পক্ষে রাজী নহেন। এজন্য কাণ্ডির উপরে নীরবে বসিয়া থাকা তিনি আরামপ্রদ মনে করিলেন। অপর সহযাত্রিণী এ স্থলে কাণ্ডি হইতে নামিয়া পদব্রজেই যাইতে বাধ্য হয়েন! বরফের পিচ্ছিল পথ পার হইতে কাণ্ডিওয়ালার হস্তধারণ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই! এইবার সম্মুখেই এক আকাশ-স্পর্শী পাহাড়ে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। এ-পাহাড়েও নানা জাতীয় বৃক্ষই দেখিলাম, সকল বৃক্ষই বিলক্ষণ শৈবাল-পরিপূর্ণ। উপরে উঠিয়া পাহাড়ের দৃশ্য ক্রমশঃই যেন অধিকতর মনোরম বলিয়া মনে হইল। আশে পাশে সর্ব্বত্রই পুষ্পবৃক্ষের শোভা—কোথায় সারি সারি নয়ন-রঞ্জক বৃহদাকার স্থলপদ্মের মত অগণিত পুষ্পরাশি পাহাড়ের এক দিক্ আলো করিয়াছে। কোথায় বা ভগবানের বিচিত্র মহিমা! বৃক্ষ একেবারেই পত্রহীন, কিন্তু তাহার শাখায় শাখায় নানা বর্ণের কুসুমসম্ভার যাত্রিগণের চিত্তে যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দের উদ্রেক করিতেছে। ক্রমশঃই তুষারের রাজ্যে আসিয়া পড়িলাম। এই সকল পুষ্পবৃক্ষের কোলে কোলে পুঞ্জীভূত তুষাররাশি খণ্ড খণ্ড ভাবে ছড়াইয়া চতুর্দ্দিকে কেবল শ্বেত সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়াছে। এরূপ অভিনব দৃশ্য আর কোথায়ও দেখিয়াছি বলিয়া কাহারও মনে হইল না। এ যে কেবল তুষারেরই প্রত্যক্ষ সজীবতা! এখানেও স্থানে স্থানে "রডোড্রেন্‌ড্রাম্" বৃক্ষে নয়ন-মনোহর অজস্র রক্ত-জবার সৌন্দর্য্য, আবার কোথায়ও বা কাশবৃক্ষের মত শ্বেতপুষ্প-শোভিত

বৃক্ষের উপবন। তুষারকণামণ্ডিত হইয়া এ স্থানের প্রত্যেক পুষ্পই যেন সতেজ ও চির-নবীন ভাবে বিকাশ রহিয়াছে। শিখরের স্তূপীকৃত তুষারপুঞ্জের উপরে তখন রৌদ্র-কিরণ ঝক্ ঝক্ করিতেছিল। শ্বেত-সৌন্দর্য্যের সেরূপ উজ্জ্বলতা ভাষায় বর্ণনীয় নহে। যিনি প্রত্যক্ষ দেখিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছেন, তিনিই বিশেষভাবে ইহার মাধুর্য্য বুঝিয়া থাকিবেন। এই তুষার-সমুদ্রের মধ্য হইতে এক স্থানে, পাহাড়ের গা দিয়া বহুদূরব্যাপী তুষারধারা ফেনপুঞ্জের ন্যায় কেমন এক সর্পাকৃতি উজ্জ্বল শ্বেত-রেখা নীচে নামাইয়া দিয়াছে, চোখের সম্মুখে সে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-সমাবেশ। শিখরের কাছাকাছি এই পাহাড়ের পার্শ্ব-দেশে, বামদিকে এক ক্ষুদ্র মন্দিরমধ্যে "ভৈরবনাথজীর" দর্শন পাইলাম। "ইহার কৃপাকটাক্ষ বিনা যমুনোত্তরী-দর্শন অসম্ভব" ভগবান্ সিং এ কথা আমাদিগকে বিশেষভাবে জানাইয়া দিল। কাশী থাকিতে গেলে যেমন কাশী-কী কোতোয়াল ভৈরবনাথের শরণ লইতে হয়, আজ শুভ-ক্ষণে কাশী হইতে এত দূরে সেই ভৈরবনাথের উদ্দেশেই সকলেই প্রণত-মস্তক হইয়া আবার আগে চলিলাম। উপরে উঠিয়া এইবার বাঁকের মুখে দক্ষিণ ভাগে কি দেখিলাম! সম্মুখেই দিগন্তপ্রসারী আর এক পাহাড় উত্তরাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। আমরা তিন মাইলব্যাপী যে পাহাড় অতিক্রম করিয়া উপরে উঠিলাম, এ পাহাড়টি তদপেক্ষা আরও উচ্চ। বিস্ময়ের বিষয় এই, উপর হইতে নীচের দিক্ পর্য্যন্ত ইহার সমস্ত গাত্রই একেবারে তুষারাবৃত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বিরাট আয়তন অখণ্ড রজতপ্রভাসমন্বিত এই উজ্জ্বল সৌন্দর্য্যরাশি চোখের এত সন্নিকটে ঝলমল করিতেছে, এ দৃশ্যে সকলেরই চক্ষু সে সময়ে অপ-লক নেত্রে চাহিয়া চাহিয়া যেন ঝলসিয়া গেল। এমন বুক-ভরা-সৌন্দর্য্য কাহার না দেখিবার সাধ হয়! মনে পড়িল, তিব্বতে কৈলাস-যাত্রার

পথ। মাবণ-হ্রদের তীরে তীরে "গুরেলা-মান্ধাতা"কে এইরূপ সর্ব্বাঙ্গে তুষারাবৃত দেখিয়াছি। তাহার সৌন্দর্য্য সে সময়ে ক্ষণেকের জন্য মনকে অন্যমনস্ক করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু খর্ব্বাকৃতি নগ্ন পাহাড়ের সে রূপের সহিত যমুনোত্তরীর এই আকাশস্পর্শী বিশালায়তন দেহের সৌন্দর্য্যের কখনই তুলনা করা চলে না।

এ কান্তি যেন প্রকাণ্ড স্বচ্ছ-হীরকের মত সদাই উদ্ভাসিত রহিয়াছে। দেশ, আত্মীয়-স্বজন, পল্লী-কুটীর, নির্ব্বাসন সবই যেন নিমেষমধ্যে ভুলিয়া গেলাম। লোকালয়হীন পার্ব্বত্য-পথের এই দুরতিক্রম্য অভিযান আজ যেন সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছে, মনে হইল। ভগবান্ বলিল, "এই রজত-গিরির পাদদেশ পর্য্যন্তই মানুষের গতি সীমাবদ্ধ, উপরের দৃশ্য এখান হইতেই প্রত্যক্ষ করিয়া লউন।" এইবার উৎরাই পথে নামিতে সুরু করিলাম। পথ চলার বিরাম নাই, তথাপি দারুণ শীতে সকলেরই শরীর কণ্টকিত। কাণ্ডির উপরে চুপচাপ একভাবে বসিয়া যাত্রিগণ অধিকতর শীতভোগ করিতেছিলেন। এইবার বাধ্য হইয়া নীচে নামিতে হইল। দূরে মন্দির ও ধর্ম্মশালা দেখা যাইতেছে, কিন্তু পথের অধিকাংশ স্থানেই উৎরাইএর উপর আবার তুষার জমিয়া আছে। নামিতে গেলে পদব্রজে খুবই সাবধানে যাইতে হয়। বলা বাহুল্য, একটু অন্যমনস্ক হইয়া এই তুষারের উৎরাই রাস্তা কাহারও নামিবার উপায় নাই। সময় বুঝিয়া এই সময়ে এক পশলা শিলা-বৃষ্টি হইয়া গেল। অসহ্য শীতে আপাদ-মস্তক আবৃত করিয়া ক্ষণকাল সকলেই দাঁড়াইয়া রহিলাম।

ভৈরবনাথের কৃপাকটাক্ষ স্মরণ করিয়া আমরা নিরাপদে যখন যমুনোত্তরী আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তখন অপরাহ্ণ তিনটা বাজিয়া গিয়াছে।

চতুর্থ পর্ব্ব

যমুনোত্তরী

এই কি সেই চির-উচ্ছল যমুনা নদীর মহা-মহিমময়ী পবিত্র পুণ্যধারা, যেখান হইতে সর্ব্বপ্রথম ইহার সুবিমল উৎস আবেগ-ভরে তুষারের প্রচণ্ড পাহাড় প্রকম্পিত করিয়া সুদূর বৃন্দাবন পানে ছুটিয়া চলিয়াছে? এই প্রস্রবণই ত ক্রমে নদীর আকারে সমতল ভূমিতে নামিয়া আসিয়া উভয় তটের স্থানগুলিকে তীর্থে পরিণত করে? কালো জলের এ শ্যাম-শোভাই ত বাঁকা শ্যামের চিত্ত হরণ করিয়াছিল! ইহারই শেষ স্রোত সেই পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, হিন্দুর কাছে দুইয়েরই ধারা সমান পবিত্র। "গঙ্গা চ যমুনা চৈব সমে ত্রৈলোক্য-পাবনে।" আজ অমরা সেই পুণ্যতোয়ারই প্রথম উৎস-সান্নিধ্যে উপস্থিত হইয়া ভক্তি-নত চিত্তে চারিদিক্ দেখিয়া লইলাম। "যমুনোত্তরীমাহাত্ম্যে" লিখিত আছে,—

"যত্র বহ্নিঃ পুরা বিপ্র তপস্তেপে সুদারুণম্।
অত্রৈব তপসা প্রাপ্তং দিগীশত্বং তদাগ্নিনা॥"

অর্থাৎ যেখানে অগ্নি কঠিন তপস্যা দ্বারা "দিক্‌পাল" পদলাভ করেন—এই কি সেই তপস্তেজোময় হিমগিরির এক নির্জ্জন তুষার-প্রান্ত, যেখানে অগ্নি লক্ লক্ জিহ্বায় তুষার-গলিত হিম-শীতল জলের মধ্যেও আপনার জলন্ত মহিমা এখনও বিকাশ রাখিয়াছেন? দুরন্ত শীতে মানুষ এখানে অসাড় হইয়া যায়, তাঁহাদিগকে বাঁচাইবার জন্য পরমকারুণিক সৃষ্টিকর্ত্তার এ কি এক

অদ্ভুত, কৌশল! অত্যধিক শীতে প্রথমেই আমরা যমুনা নদীর পুল পার হইয়া, এক গরম কুণ্ডের আশে পাশে নিজ নিজ শরীর গরম করিয়া লইলাম। ততক্ষণে বোঝাওয়ালারা সকলেই ধীরে ধীরে আসিয়া পৌঁছিল।

সুখের বিষয়, এখানে একখানি দ্বিতল ধর্ম্মশালা দেখিয়া রাত্রিবাসের সুবিধা হইবে মনে করিয়া আশ্বস্ত হইলাম। পাকা ইমারত, ছাদে পাথরের টালি;—সম্মুখে আচ্ছাদনযুক্ত বারান্দা (কেবল সম্মুখদিক্ খোলা) দেখিয়া সিঁড়ি বহিয়া উপরে উঠিলাম। উদ্দেশ্য, ঘর যদি খালি পাওয়া যায়। উপরে চারিখানি ঘরের একটি ঘরও খালি দেখিলাম না। নীচেও ঠিক তাই, অগত্যা উপরের এক দিকের বারান্দায় আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ সকল স্থানে ঘরের মেজেতে কাঠের তক্তাই বিছানো থাকে, উপরে জল ফেলিতে গেলেই পাছে নীচের ঘরে গড়াইয়া যায়,—এ আশঙ্কায় কোন যাত্রীরই জল ফেলিবার উপায় নাই। যাত্রীর মধ্যে কতক দাক্ষিণাত্য-প্রদেশী,—কতক হিন্দুস্থানী, বিশেষ করিয়া সুলতানপুর জেলার লোকই বেশী দেখিলাম। উপরের একটি ঘরে দুই জন মাত্র সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম-মাখা কৌপীনবস্ত সাধু দেখিয়া প্রথমে আমাদের ইচ্ছা হইয়াছিল, ঐ ঘরেরই এক পার্শ্বে আমরা রাত্রি কাটাইব। ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত সাধুদ্বয়ের রোষ-কষায়িত নেত্র সে সময়ে আমাদের কাহারও (বিশেষ করিয়া সহযাত্রিনীদিগের) ভাল লাগে নাই।

এ দিনে "মার্কণ্ডেয় আশ্রম" হইতেই আমরা আহারাদি সম্পন্ন করিয়া লইয়াছিলাম। সুতরাং আসবাবপত্রাদি রাখিয়া

নিশ্চিন্তমনে আজ কেবল সকলেই আশ-পাশ ঘুরিয়া দেখিলাম। ধর্ম্মশালার প্রস্তরগাত্রে এক স্থানে দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত আছে, "ধর্ম্মশালেয়ং ১৯৮১ বিক্রমাব্দে তদনুসারং ১৯৩৫ ইসাব্দে জিলা মুরাদাবাদান্তর্গত ঠাকুর-দ্বারানগরনিবাসী শ্রীমতা সাহু রামরত্নাত্মজেন সাহু রঘুনন্দন শর্ম্মাণ শ্রীমত্যাঃ সরস্বতী দেব্যাঃ স্মারকরূপেণ সকলযাত্রিজনসুখার্থায় বিনির্ম্মিতা।" সকল যাত্রিজনসুখার্থের নিমিত্ত সরস্বতী দেবীর স্মারকচিহ্নস্বরূপ ইং ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে রঘুনন্দন সাহু কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে, মোটামুটি ইহাই জানা গেল। মুরাদাবাদ জেলার এই মহানুভব ব্যক্তি প্রত্যেক যাত্রীর নিকটেই যে ধন্যবাদ লাভ করিয়া থাকেন, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইলাম।

ধর্ম্মশালার বাহিরে আসিয়া উহারই সংলগ্ন উত্তর কোণের পাহাড়ের গা দিয়া যেখান হইতে যমুনা নদী ঝরণার আকারে প্রবাহিতা হইতেছেন, সে স্থানটি দেখিলাম, তুষারের চাপে একদম আবৃত। ধর্ম্মশালা হইতে একটু পশ্চিমদিক্ ঝুঁকিয়াই ইনি নিম্নাভিমুখী হইয়াছেন, এই জন্যই ওপার হইতে পুল পার হইয়া ধর্ম্মশালায় পৌঁছিতে হয়। ধর্ম্মশালার ঠিক সম্মুখভাগে (পশ্চিমে) তিনটি ছোট ছোট কুণ্ড, তাহার প্রত্যেকটিতেই গরম জলের প্রবাহ দৃষ্ট হয়। পাণ্ডা বলিয়াছিল, একটির নাম "গোমুখী কুণ্ড" আর একটি "সূর্য্যমুখী কুণ্ড" আর একটিকে "গোরকডিবি" অর্থাৎ গোরক্ষনাথের তপস্যাস্থান বলা হইয়া থাকে। যাত্রিগণ এখানে বসিয়া কেহ কেহ সন্ধ্যাবন্দনাদি শেষ করিতেছিলেন। বাহিরে বিলক্ষণ বাতাস বহিতেছিল। সে বাতাস এতই আর্দ্র যে, আমাদের শীতবস্ত্র সমস্তই যেন ভিজিয়া রহিয়াছে মনে হইল। এই গরম কুণ্ডের নিকটে যাত্রীরা আরামের জন্য ইচ্ছা করিয়াই উপবেশন করিতে চাহেন।

ধর্ম্মশালার বামভাগে একটু দূরে পাহাড়ের নিম্নেই সারি সারি আরও তিনটি কুণ্ডের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল। এই স্থানের প্রত্যেক কুণ্ডেরই জল এত অধিক গরম যে, হাত দিয়া রাখা অসহ্য মনে হয়। জিজ্ঞাসায় জানিলাম, এগুলি "নারদকুণ্ড," "সূর্য্যকুণ্ড" ও "গৌরীকুণ্ড"। ভগবান্ বলিল, "এই কুণ্ডের জলে শুধু পুণ্যার্জ্জন নহে, অনায়াসলব্ধ মহাপ্রসাদেরও ব্যবস্থা আছে" দেখিলাম, কোন কোন যাত্রী 'এই কুণ্ডে গামছার এক কোণ উপর হইতে হাত দিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে, অপর অংশে চাউল ও আলু বাঁধা-অবস্থায় আপনা হইতেই জলে সিদ্ধ হইতেছে। সাধারণতঃ অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যেই এই অভিনব উপায়ে চাউল অন্নরূপে পরিণত হইয়া থাকে, সুতরাং জলের উত্তাপের পরিমাণ বড় কম নহে। বৈজ্ঞানিকগণ ইহার ১৯৪'০৭ ডিগ্রী উত্তাপ মাপিয়া দেখিয়াছেন। পার্শ্বেই পাহাড়ের অভ্যন্তরস্থ সরু গহ্বর-বিশিষ্ট স্থানে গরম জলের নিরন্তর "টগ্-বগ্" ফোটার শব্দ (শুধু প্রবাহ নহে) যাত্রিগণের কর্ণে ভীষণতার মত কি এক অব্যক্ত শব্দ প্রচার করিতেছে শুনিলে শুধু বিস্ময় নহে, এই হিম-শীতল নির্জ্জন তুষার-প্রদেশে আতঙ্কেরও সৃষ্টি করে। বুকভরা বেদনার ন্যায় এই মর্ম্ম-গীতি পর্ব্বতের কন্দরে কন্দরে যুগ-যুগান্তর ধরিয়া কি জন্য উত্থিত হইতেছে, ইহার নিগূঢ়-তত্ত্ব তত্ত্বান্বেষিগণ উদ্‌ঘাটিত করিতে এখনও অসমর্থ। উপরে বিরাট-ভাবে রাশি রাশি তুষারের বিস্তৃতি আর সেই পাহাড়েরই অভ্যন্তরে নিম্নভাগের এই উষ্ণ-প্রবাহ, সৃষ্টির প্রহেলিকার মত আমাদিগের প্রত্যেকের প্রাণে কি এক অনমুমেয় অনুভূতি আনিয়া দিল। ভগবান্ সিং বলিতে লাগিল, "এখানে মহর্ষি গৌতম তপস্যা করিয়াছিলেন।" তপস্যার সহিত এই গরম জলের প্রবাহগুলির কিরূপ

সম্বন্ধ বুঝিতে না পারিলেও, ইহা নিশ্চিত সত্য যে, হিন্দুশাস্ত্রসিদ্ধান্ত অনুসারে এই লোকালয়বর্জ্জিত হিমগিরির তুষারসমাচ্ছন্ন পুণ্য-পীঠে দেবতা, ঋষি, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নরাদির যত কিছু লীলা, সম্পদ্ বা ঐশ্বর্য্যরাজির উল্লেখ দৃষ্ট হয়, ঋষি-প্রতিম পিতৃপুরুষগণ সেই সেই তপোদ্ভূত পবিত্র স্থানের বিচিত্র শাশ্বত মহিমায় আজীবন আকৃষ্ট ও মোহিত হইয়া গিয়াছেন। এ স্থানের অপরিসীম সৌন্দর্য্য সেই চির জাগ্রত পবিত্র মহিমারই এক জ্বলন্ত মূর্ত্তিমান নিদর্শনরূপে আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইল। এ যে সেই মুনিজন-মনোহারী চির-দুর্ল্লভ পবিত্রতম তপস্যারই এক নিভৃত নিলয়, এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ রহিল না। স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারি, মনুষ্যমধ্যে এমন কেহ নাই, যিনি এই আকাশস্পর্শী হিমাচল-শোভী সৌন্দর্য্যের মধুরতায় আপনাকে ক্ষণেকের জন্য অন্যমনস্ক না রাখিয়া থাকিতে পারেন! ওই সুবিশাল রজত-গিরির পাদদেশে পুণ্যতোয়া যমুনা নদীর এক দিকে উষ্ণ ও অন্য দিকে তুষার-শীতল প্রবাহ—দুই-ই যাত্রীর কাছে সমানভাবে আনন্দ ও বিস্ময়ের সৃষ্টি করিতেছে।

আমার পূজনীয় অগ্রজ মহাশয়ের অনুরোধে এই পবিত্র যমুনোত্তরী-দর্শনে সে সময়ে মৎ-কর্ত্তৃক একটি কবিতা রচিত হয়, তাহা এ স্থলে পাঠক-পাঠিকা সমক্ষে উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না—

কবিতাটি এই :—

"বক্ষে কেন গো তুষারের হার
চক্ষে উষ্ণ জল,
এ কি বিপরীত রীতি মা! তোমার
পূত বারি নিরমল!

চারিদিক্ হ'তে হিম-প্রভঞ্জন
কণ্টকিত তনু করে অনুক্ষণ
গৌতমাদি মুনি কি মহিমা জানি
করে তপ অবিরল!
সূর্য্য, গৌরী নারদাদি আসি
ভক্ ভক্ জ্বলে জলে হিম নাশি
তাঁদের কুণ্ড প্রকাশে কি ভাব
উথলিয়া গিরিতল?
কি টানে কোথায় গেছ অনুরাগে
কি আবেগে বেগ ও হৃদয়ে জাগে
গিরিকন্দর চূর্ণি উঠিছে
তরঙ্গ ছল ছল?
দুধারে বিশাল রজতের কায়া
দুই বাহু ঘিরি প্রসারিছে মায়া
মুনি-মনোহারী ওরূপ-মাধুরী
সৃষ্টির শতদল!
এ যমুনা যদি যায় গো ছুটিয়া
বৃন্দাবন-বনে পড়ে গো লুটিয়া,
পীতবাস হরি ধরি শ্রীঅঙ্গে
আনন্দে টলমল;
আত্মহারা শেষ, কোথা পরিণতি
পতিত-পাবনী সুরধুনী সতী
যেথা বয় সুখে তরঙ্গেরি গতি
মিলিয়াছে নিরমল!

সে যমুনা আজ নয়নের আগে
হিমগিরি-শিরে রূপ ধরি জাগে
ডুবে যা' রে মন, চেয়ে দেখ্ আঁখি
নাই হেথা হলাহল।
শুধু পূত সুধা নির্ঝরের ধারা
নীচে নেমে যায় পাগলের পারা
ভরি অঞ্জলি তুলে দে রে শিরে
চির সাধনার ফল!
সার্থক হোক্ পথ চলা মোর
কাটুক বিষয়-বিষ-নেশা ঘোর
শ্রদ্ধায় হিয়া উঠুক উজলি
ঝরুক নয়নে জল!" *

এই যমুনোত্তরী সমুদ্রগর্ভ হইতে প্রায় ১০৮০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত। ধর্ম্মগ্রন্থে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী এই তিন পুণ্যপ্রবাহিণীরই কথায় অনেক কিছু মাহাত্ম্যের উল্লেখ দৃষ্ট হইয়া থাকে। তীর্থপথের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিতে বসিয়া, পাঠকবর্গের ধৈর্য্যচ্যুতি আশঙ্কায় সে বিষয়ের আলোচনা এ ক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন বলিয়াই মনে করি। যাঁহারা উপাখ্যান পাঠে অনুরক্ত বা অভ্যস্ত, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে এই তীর্থ-সলিল সম্বন্ধে সবিশেষ জানিয়া লইতে সমর্থ হইবেন। আমি শুধু এ স্থলে এই সূর্য্যনন্দিনী যমুনার অবতরণ সম্বন্ধে কাশী-কেদারখণ্ডের দু-একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ক্ষান্ত হইলাম—"এবমুক্তা তদা

* কবিতাটি "যমুনোত্তরী দর্শনে" নাম দিয়া 'মাসিক বসুমতীতে' সে সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল।—লেখক।

ত্তেন হিমবন্তমুপাগতা। শিবমারাধ্য তত্রস্থং তদাজ্ঞাবশবর্ত্তিনী ॥”... “ভবেদিতি বরং প্রাপ্য জাতাহং ভূপ্রবাহিণী—” ১০৯...১১১ শ্লোকাঃ একাদশাধ্যায়ঃ—ব্রহ্মার বরে শিবের আরাধনা করিতে ইনি হিমালয়ে গমনপূর্ব্বক তথা হইতে ভূমণ্ডলে প্রবাহিতা হয়েন। বলা বাহুল্য, যেখান হইতে ইঁহার উৎপত্তি ও অবতরণ, পর্ব্বতের সেই চির-নির্জ্জন তুষার-প্রদেশে ধর্ম্মশালার দক্ষিণ ভাগে একটি ক্ষুদ্র মন্দির শোভা পাইতেছিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে এই মন্দিরের পূজারী মহাশয় ঘন ঘন শঙ্খ ফুকারিয়া “মায়ের আরতি হইবে, দর্শনেচ্ছু-যাত্রী চলিয়া আইস।” এ কথা বার বার জানাইয়া দিলেন। আমরা সকলেই একে একে মন্দিরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম।

মন্দিরমধ্যে এক দিকে শ্বেতবর্ণা গঙ্গা ও অপর দিকে কৃষ্ণবর্ণা যমুনার প্রস্তর-মূর্ত্তি পাশাপাশি বিরাজ করিতেছে। যমুনামূর্ত্তির কোলে আবার ত্রিলোক-পাবন শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি ও তন্নিম্নে হনুমান্‌জীর মূর্ত্তি শোভা পাইতেছিল। পঞ্চপ্রদীপ হস্তে দাঁড়াইয়া এ দেশের পূজারী ব্রাহ্মণ আরতি ও সঙ্গে সঙ্গে হিন্দী ভাষায় ভাবগদ্গদচিত্তে বন্দনা সুরু করিলেন। পার্শ্বে এক জন খঞ্জনী ও অপর এক জন শঙ্খ বাজাইয়া, এই বন্দনা-গীতির সহিত সমানভাবে সুর-যোজনা করিয়া এই নিভৃত পর্ব্বত-কন্দরের পবিত্র মন্দির মুখরিত রাখিয়াছিল। ঢাক-ঢোল কাঁসর-ঘণ্টা প্রভৃতির আড়ম্বর না থাকিলেও এই নির্জ্জন পবিত্রতম মন্দিরমধ্যে কেবলমাত্র জন কয়েক যাত্রি-সঙ্গে এ দিনকার আরতি-দর্শন ও নীরবে বন্দনা-শ্রবণ এতই মধুর ও উপভোগ্য মনে হইয়াছিল যে, এখন লিখিতেও লেখনী কম্পিত মনে হইতেছে। পথের দুর্গমতা স্মরণ করিয়া শেষ অবধি এই কঠিন তীর্থ-সান্নিধ্যে নিরাপদে পৌঁছিতে সমর্থ হইব কি না, এ বিষয়ে পূর্ব্ব হইতেই আমাদের একটা দুশ্চিন্তা ছিল;

বারান্দায় আশ্রয়লাভের সঙ্গে সঙ্গেই সে দুশ্চিন্তা একেবারেই অন্তর্হিত হইয়াছে। ধর্ম্মশালার সম্মুখভাগে 'পট্‌কা' বাজীর মত ফট্-ফট্ শব্দে যখন অনেকগুলি শুষ্ক-কাষ্ঠে এককালীন আগুন জ্বলিয়া উঠিল, ধর্ম্মশালার সকল যাত্রীই বাহিরে আসিয়া সে সময়ে কিছুক্ষণের জন্য শীত নিবারণের সুযোগ পাইলেন। আহার্য্য দ্রব্যেরও অভাব নাই, বরং স্থানের তুলনায় ইহা যথেষ্ট সুলভ দেখিলাম। এই তুষারশীতল জন-বিরল তীর্থে প্রতি সের আটা চারি আনা, ঘৃত দুই টাকা, চিনি তেরো আনা এবং আলু এক আনা মাত্র। রাত্রিতে লুচি ও আলুর তরকারী পরিপূর্ণ-মাত্রায় জলযোগান্তে সকলেই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলাম।

প্রভাতে ডাণ্ডিওয়ালা, কুলীগণের সর্দ্দার 'ফতেসিং' এবং বোঝাওয়ালা কুলীর তরফের 'কর্ণ সিং' উভয়েই পাঁচ ধামের এক ধাম—যমুনোত্তরীতীর্থে পৌঁছিবার দরুণ সর্ত্তমত প্রত্যেক কুলীরই ইনাম ও খিচুড়ী চাহিয়া বসিল। বলা বাহুল্য, আমরা প্রত্যেকের ইনাম এক টাকা এবং খিচুড়ির জন্য সাত আনা হিসাবে (সে স্থানের আটা প্রভৃতির দরের হিসাবমত) সকলেরই প্রাপ্য চুক্তি করিলাম। এই কুলীগণই ত আমাদের এক ধাম যাত্রা সম্পূর্ণ করিল। ডাণ্ডিওয়ালা চারি জনকেও কিছু কিছু বখশিস্ দিয়া আমরা এখানকার দর্শন-পূজাদি যথাসম্ভব সত্বর সারিয়া লইতে উদ্যোগী হইলাম। ধর্ম্মশালা হইতে কতক নীচে নামিয়া বসুধারার তপ্তকুণ্ড, সেইখানে যাত্রিগণের সাধারণতঃ স্নানের বিধি আছে। স্নানার্থী যাত্রী প্রথমতঃ এই তপ্তকুণ্ডে স্নান করিয়া তার পর মায়ের পূজার্চ্চনা করিয়া থাকেন। "যমুনোত্তরী-মাহাত্ম্যে" এই তপ্তকুণ্ড সম্বন্ধে লিখিত আছে,—

"দিব্যং সরশ্চ তত্রাস্তি তপ্তোদং পাপিদুর্গমম্।
তত্র বৈ স্নানমাত্রেণ লভতে পরমং পদম্॥"

এই তপ্তকুণ্ডটির চতুর্দ্দিকেই সিঁড়ির আকারে প্রস্তর সুসজ্জিত আছে। জলে নামিয়া কোমর পর্য্যন্ত ডুবাইয়া রাখিতে, এই প্রচণ্ড শীতে বেশ আরামপ্রদ বলিয়াই আমাদের মনে হইল, কিন্তু ডুব দিতে গেলেই জলের উত্তাপে শরীর কষ্ট বোধ করে। যাহা হউক, সকলেই যথারীতি স্নানান্তে প্রথম যমুনা-মাতার মুখারবিন্দে পূজা শেষ করিলাম। বলা বাহুল্য, তীর্থগুরুই এ সকল পূজা সম্পন্ন করাইয়া থাকেন। সেখান হইতে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া গঙ্গা-যমুনার পূজাদি শেষ করিতে বেলা দশটা বাজিয়া গেল। মন্দিরের পূজারীর "ষোল আনা দক্ষিণা"র প্রতি বেশ দৃষ্টি আছে। ইহার অধিক দিতে পারিলে যাত্রীর যে শুধু ভবিষ্যৎ-জীবনেই মুক্তি, তাহা নহে, পূজারীর হাত হইতেও অতি শীঘ্র মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। নতুবা কতক্ষণে ইঁহাদের প্রকৃত সন্তোষবিধান সম্ভবপর হয়, বলা সুকঠিন।

বসুধারার তপ্তকুণ্ডে পিতৃপুরুষদিগের পিণ্ডদানেরও নিয়ম আছে শুনিয়া, পূজাশেষে বৃদ্ধা দিদি, আমি ও আমার পূজনীয় অগ্রজ মহাশয় এ বিষয়ে অগ্রণী হইলাম। প্রথমে পিণ্ডদানের চাউল এ স্থানের প্রথানুসারে সূর্য্যকুণ্ডে সিদ্ধ করিয়া লওয়া হইল। তার পর সেই অন্ন তিল, গুড় প্রভৃতির সহিত মাখিয়া তিন জনেই বসুধারায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বসুধারার উষ্ণ প্রবাহ (বসুধারার কুণ্ড হইতে একটু নীচে) সেখানে নামিয়া আসিয়া তুষার-শীতল যমুনার ধারায় সম্মিলিত হইয়াছে, সেই উচ্ছল কল-কল-নিনাদিনীর পবিত্র সঙ্গম-স্থলে পিতৃপুরুষগণের যথারীতি পিণ্ডদান সম্পন্ন করিয়া যখন উপরে আসিলাম, তখন বেলা বারোটা আন্দাজ হইবে। এইবার পাণ্ডাঠাকুর ব্রাহ্মণভোজনের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। তাঁহারা পাঁচ ভাই একযোগে এ স্থানের যাত্রিগণের পূজা শেষ করাইতে নিযুক্ত আছেন জানিয়া, পাঁচ জনের ভোজন ও

তদ্দক্ষিণা বাবদ আমরা প্রত্যেককেই এক টাকা হিসাবে গণিয়া দিয়া সেখানকার তীর্থকৃত্য একপ্রকার সারিয়া লইলাম। প্রাপ্য গণ্ডা বুঝিয়া লইয়া পাণ্ডাঠাকুর শেষের দিকে আবার "সুফলের" জন্য "ষোল আনা" চাহিয়া লইতে বিস্মৃত হইলেন না।

সূর্য্যকুণ্ডের জলে সে দিনকার 'মহাপ্রসাদ' ও আলুসিদ্ধ ভক্ষণ এক অপূর্ব্ব মধুর পবিত্র আস্বাদরূপে আমাদের সকলেরই রসনা আজও যেন আর্দ্র করিয়া রাখিয়াছে। আমার এ উক্তি পাঠকবর্গ হয় ত 'অতিশয়োক্তি'র মত মনে করিতে পারেন, কিন্তু নিঃসঙ্কোচে আজ আপনাদিগকে এই কথাই জানাইব, মসৌরী হইতে মাত্র ৯৩ মাইল দূরবর্ত্তী পবিত্র তীর্থস্থানের অফুরন্ত মহিমা ও সৌন্দর্য্যের নিদর্শন এই "যমুনোত্তরী"—সর্ব্বদিক্ দিয়াই মানুষকে যুগ-যুগান্তর হইতে কোন্ এক অদ্ভুত অজ্ঞাত রাজ্যের সন্ধান দিতেছে, তাহা স্মরণ করিলে স্বতঃপ্রলুব্ধ মন আজও সকলের অগ্রে সেই পথের পথিক হইয়া ছুটিয়া যাইতে চাহে। জানি না, সে রাজ্যের সে আলোকের ঝল্‌মল পবিত্র উজ্জ্বলতা আর কোথায়ও দেখিতে পাইব কি না।

এই যমুনোত্তরীর আশ-পাশ হইতে কচিৎ দু'একটি পাহাড়ী পাখীর ডাক শুনা গেল, তাহা বেশীর ভাগ বৈকালের দিকে। কোনটির শব্দ কথঞ্চিৎ কর্কশ, আবার কোনটির সুর দুই তিন মিনিট কাল একসঙ্গে স্থায়ী। সে ডাকে কেবল এ স্থানের কঠিন নীরবতা সূচিত করে, সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীদের চমক ভাঙ্গিয়া দেয়। আহারান্তে এ দিন আমরা বেলা দুইটা আন্দাজ সময়ে বাহির হইলাম। যমুনা পার হইয়া দেখি, বাম-ভাগে একটি আচ্ছাদন-হীন পাকা ঘর ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। জিজ্ঞাসায় জানিলাম, উহা এককালে ধর্ম্মশালারূপেই ব্যবহৃত হইত। প্রচণ্ড তুষারপাতে উপরের আচ্ছাদনটি চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। হঠাৎ কোন সময়ে হয় ত বৃহৎ ধর্ম্মশালাটিরও (যেখানে আমরা ছিলাম) অবস্থা এই-রূপে লয় পাইতে পারে! নিয়ত তুষার-পাতের রাজ্যে মানুষ কতটুকু শক্তিমান? সন্ধ্যা পাঁচটায় আমরা "মার্কণ্ডেয় আশ্রমে" ফিরিয়া আসিয়া কাণ্ডিওয়ালীদের পাওনা চুক্তি করিলাম। ডাণ্ডি-যাত্রিদ্বয়ের এই ভাড়া অতিরিক্ত পড়িল।

পরদিন দশ মাইল দূরে "ওজিরি" আসিয়া রাত্রিযাপন করিলাম। সারা রাত্রি বৃষ্টিপাত হইল। পুরাতন পথে ফেরৎকালে যতই মনে হইতেছিল, কত দিনে আবার গঙ্গোত্তরীর নূতন পথ ধরিতে পারিব, ততই যেন বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইল। দিনের বেলা সর্ব্বক্ষণই বৃষ্টির উৎপাত সব দিক্ দিয়াই ক্লেশের কারণ। বোঝাওয়ালা ভিজিতে ভিজিতে

বোঝা লইয়া চলে। এ স্থলে আসবাবপত্র, বিশেষ বিছানা প্রভৃতিকে বৃষ্টি হইতে বাঁচাইবার জন্য সর্ব্বপ্রথম লক্ষ্য রাখিতে হয়। (বলা বাহুল্য, এই জন্যই এ পথে অতিরিক্ত অয়েলক্লথ সঙ্গে লওয়া আবশ্যক)। কুলীগণ পরিশ্রান্ত অবস্থায় যেখানে সেখানে ভিজা স্থানের উপরেই পৃষ্ঠের বোঝা নামাইয়া দিয়া আপনাদের শ্রান্তি দুর করিয়া থাকে। তাহার উপর ডাণ্ডিওয়ালা ফতে সিংএর শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িল। জ্বরাবস্থায় সওয়ার বসাইয়া ডাণ্ডি লইয়া চলা এক দিকে যেমন কষ্টকর, অন্য দিকে চলার পথে বিলম্ব বড়ই অসহ্য হইয়া উঠে। ওজিরি হইতে দ্বিতীয় দিনে মাত্র ৯ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া "গঙ্গানি" পৌঁছিলাম। সারা পথে কোথাও মেঘ, কোথাও রৌদ্র—আলো-ছায়ার অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। সমতল-দেশবাসীর চক্ষুতে সেও এক নূতন দৃশ্য। কখনও দেখিলাম, পাহাড়ের কোলে খণ্ড খণ্ড শুভ্র মেঘ যেন শুইয়া রহিয়াছে, কোথাও সূর্য্য-কিরণ-স্নাত এই মেঘে আগুন লাগিয়া যেন অনর্গল ধূম্র বাহির হইতেছে, কোথায়ও বা স্বচ্ছ সুনীল আকাশের তলে বর্ষাধৌত পাহাড়ের পাশ দিয়া দুর দিগন্তের শেষ সীমা পর্য্যন্ত রং-বে-রংএর মেঘে বিচিত্রবর্ণের সমাবেশ দেখাইতেছে। প্রকৃতির সংসারে সেও এক অভিনব শ্রীসম্পন্ন নূতন সম্পদ্ সন্দেহ নাই।

গঙ্গানির ধর্ম্মশালাটি যাত্রাপথ হইতে কিছু নীচে। ইমারত পাকা হইলেও, ইহার অবস্থা আমাদের দেশের 'চাম্‌চিকার' বাসা-ঘর বা গোয়াল-ঘরের মত। এই ঘরের সম্মুখে লম্বা বারান্দাও আছে। বারান্দা হইতে কিছু দূরে অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ধারায় যমুনা নদী কল-কল শব্দে ছুটিয়া চলিয়াছে। ও-পারেও ধূম্র পাহাড় সমানভাবে সুবিস্তৃত রহিয়াছে। দক্ষিণভাগে কিয়দ্দূরেই একটি কুণ্ড, তাহাতে এক হাত মাত্র পরিষ্কার জলে সে সময়ে অনেকগুলি মৎস্য (রোহিত মৎস্যের মত) অবাধে খেলিয়া বেড়াইতেছে দেখিলাম। কুণ্ডের সম্মুখে একটি ছোট

মন্দিরে গঙ্গা ও যমুনার প্রস্তরমূর্ত্তি বাহির হইতেই বেশ দেখা যাইতেছিল। প্রত্যহই এখানে পূজারতির ব্যবস্থা আছে মনে হয়। পূজারী ব্রাহ্মণের প্রমুখাৎ অবগত হইলাম, "এ স্থানে মহাতেজা জমদগ্নি মুনি তপস্যা করিয়াছিলেন। এই কুণ্ডের জলের সহিত 'উত্তর-কাশী'র গঙ্গার ধারা সম্মিলিত আছে।" জমদগ্নির তপস্যাপ্রভাবে উত্তরকাশী হইতে গঙ্গার ধারা এই কুণ্ডমধ্য দিয়া প্রবাহিতা হইয়াছেন কি না, জানিবার উপায় নাই। বিরাটকায় পর্ব্বতের বেষ্টনীমধ্যে অভ্যন্তরে কোথা হইতে এই স্বচ্ছ জলের প্রস্রবণ চলিয়া আসিতেছে, কে বলিবে? তবে পাহাড়ের পাশ দিয়া মানুষ-নির্ম্মিত পথের দূরত্ব মাপিলে এখান হইতে উত্তর-কাশী প্রায় একুশ মাইল হইতেছে। কুণ্ডটির ঠিক উত্তরে একখানি দ্বিতল মাটীর ঘরের নীচে একটি দোকান, তাহাতে চাউল, আটা, ঘৃত, চিনি ও সর্ব্বপ্রকার দালই বিক্রয়ার্থ মজুত রহিয়াছে। উপরের ঘরে দোকানদার নিজেই বাস করে। এ পথে কিছু দূর পর্য্যন্ত ঝরণার জলে দাল সিদ্ধ হয় শুনিয়া আমরা কিছু কিছু দাল খরিদ করিয়া রাখিলাম। পরদিন অর্থাৎ ১৯শে বৈশাখ মঙ্গলবার প্রভাতে সাড়ে ছয়টা আন্দাজ সময়ে এই গঙ্গানি পরিত্যাগ করিয়া ঘণ্টাকালমধ্যেই "সিমল" চটী আসিয়া উপস্থিত হইলাম। যমুনোত্তরী হইতে ফিরিয়া গঙ্গোত্তরীর পথ ধরিতে গেলে যাত্রিগণ এই চটী পর্য্যন্তই অর্থাৎ প্রায় ২৮৸০ মাইল পুরাতন পথে আসিতে বাধ্য হয়েন।

নীচের রাস্তা ছাড়িয়া এইবার উপরের চড়াই-পথে উঠিতে হইবে! যাঁহারা কেবলমাত্র গঙ্গোত্তরী যাইতে ইচ্ছুক, ধরাসু হইতে গঙ্গার ধারে ধারে যে পথ চলিয়া গিয়াছে, সেই পথে তাঁহারা সাধারণতঃ গিয়া থাকেন, পাঠকগণ ইতিপূর্ব্বে সে কথা অবগত হইয়াছেন। এই সিমল চটী হইতে ধরাসুর দূরত্ব প্রায় সাড়ে তেইশ মাইল। এই পথে না গিয়া অন্য পথে

আমরা "নাকুরী" নামক স্থানে ধরাসু-গঙ্গোত্তরীর পথেই সম্মিলিত হইব, ইহাই অবগত হইলাম। ধরাসু হইতে আবার নাকুরীর দূরত্ব তেরো মাইল আন্দাজ হইবে। সুতরাং এক হিসাবে প্রায় সাড়ে ছত্রিশ মাইল (২৩॥×১৩) পথ বাঁচাইবার জন্য এই সিমল চটীর উপরের রাস্তা আবিষ্কৃত হইয়া থাকিবে। কিন্তু এই চটী হইতে নাকুরী পৌছিতে প্রায় সাড়ে বারো মাইল আগে যাইতে হয়। কাযেই মোট সাড়ে ছত্রিশ হইতে সাড়ে বারো বাদ দিলে প্রকৃতপক্ষে চব্বিশ মাইল পার্ব্বত্যপথই বাঁচাইতে পারা গিয়াছে, ইহা সমতলদেশবাসী যাত্রীর পক্ষে বড় কম কথা নহে!

যমুনা নদীকে এখান হইতে পশ্চাতে রাখিয়া গঙ্গার তীর নাকুরী পর্য্যন্ত যাইতে এই উপরের পথ আমাদিগকে যথেষ্ট কষ্ট দিয়াছে। শাস্ত্রমতে—"গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যং পৃথিব্যা জঘনং স্মৃতম্" * এই উক্তির নিগূঢ় রহস্য বুঝিবার অগ্রে এই গঙ্গাযমুনার মধ্যভাগের চড়াই-উৎরাই পথে উভয় স্থলেই আমরা এত অধিক পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, তাহা লেখনীলেখ্য নহে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রথমতঃ চারি মাইল আন্দাজ চড়াই উঠিতে বেলা ১১টা বাজিয়া গেল, কাজেই এ স্থানে একটি দোকানদারের ছপ্পর-ঘরে (নাম শুনিলাম "জঙ্গল" চটী) দ্বিপ্রহরের ভোজন শীঘ্র শীঘ্র শেষ করিয়া লওয়া হইল। এই জঙ্গলে প্রতিসের চারি আনা হিসাবে উৎকৃষ্ট দধি সংগ্রহ হইয়াছিল। আহারাদির পরে আবার প্রায় ৫ মাইল চড়াই শেষ করিয়া এই জঙ্গলাকীর্ণ পথে যখন উৎরাই নামিতে সুরু করিলাম, তখন প্রত্যেক যাত্রীই পা পিছলাইয়া পদে পদে ভূপতিত হইতে বাধ্য হইলেন। গাছের পাতা রাস্তার চিহ্ন পর্য্যন্ত লোপ করিয়া দিয়াছিল।

* জঘনং অর্থে নাভেরধভাগঃ ইতি নীলকণ্ঠঃ
মহাভারত, বনপর্ব্ব ৮৫ অধ্যায়।

তাহা ছাড়া মাটীর সহিত ছোট ছোট এক প্রকার কাঁকর এমন ভাবে মিশ্রিত যে, পা ফেলিবার সঙ্গে সঙ্গে সকলকেই প্রায় একই দশায় উপনীত হইতে হয়! ডাণ্ডিওয়ালা ডাণ্ডি সমেত পা পিছলাইয়া দুই বার পড়িয়া গেল। সুখের বিষয়, সওয়ারের আঘাত সেরূপ কঠিন হয় নাই। বৃদ্ধা দিদি জুতা খুলিয়া (জুতার নীচে রবার, সুতরাং পদস্খলনের আশঙ্কা) অনাবৃত পদেই খুব সাবধানতার সহিত নীচে নামিতেছিলেন, তাহাতেও নিস্তার ছিল না। "ইহাই হইল 'সিঙুঠা'র প্রসিদ্ধ উৎরাই পথ।" ভগবান্ দুইবার এই কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে নিজেই পড়িয়া গেল। বৃদ্ধা দিদির এবারের আঘাত কিছু বেশী মনে হওয়ায় কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন। তিনি বলিলেন, কে যেন তাঁহার মস্তক ধরিয়া ঘুরাইয়া দিল! "শুক্‌না ডাঙ্গায় আছাড় খাইবার" সাধ থাকিলে পাঠক-গণ, এই সিঙুঠার উৎরাই পথে ক্ষণেকের জন্য উপস্থিত হইলে অনায়াসেই ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিবেন, এ কথা স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারি।

মসৌরী হইতে যমুনোত্তরী পর্য্যন্ত ৯৬ মাইল পথের মধ্যে আমাদের দুইটি মাত্র ভীষণ চড়াই পথের স্মরণ ছিল। একটি ৫৬ মাইল আসিয়া "কুম্‌রানা" চটীর আগে এবং অপরটি একবারে শেষের দিকে অর্থাৎ "মার্কণ্ডেয় আশ্রম" হইতে যমুনোত্তরী পৌঁছিবার দিকে, এই দুই চড়াই পথই দুরারোহ মনে হইয়াছিল, এতদতিরিক্ত "হনুমান চটী" হইতে "মার্কণ্ডেয় আশ্রম" পর্য্যন্ত ধ্বস-ভাঙ্গা প্রস্তররাশির মধ্যেও অনেকটা আশঙ্কার কারণ ছিল। তার পর অন্তকার এই সিঙুঠার উৎরাই আরও সাংঘাতিক। দীর্ঘ সাড়ে তিন মাইল উৎরাই শেষ করিয়া যখন ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হইলাম, তখন অপরাহ্ণ পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে।

ধর্ম্মশালাটি দ্বিতল, পাকা ইমারত। তবে সম্মুখদিক্ একবারেই খোলা। নীচে একটি দোকান-ঘর, তীর্থ-যাত্রীর আহার্য্য দ্রব্যের

অভাব পূরণ করিতেছে। সিঙুঠা গ্রামটি অনেক উচ্চে, পাহাড়ের কোলে, এখান হইতে সুস্পষ্ট দেখা যায়। দোকানে চাউল, আটা, ঘৃত, চিনি প্রভৃতি সমস্তই পাওয়া গেল। প্রতি সের দুগ্ধের দাম চারি আনা এবং প্রতি সের আলু তিন আনা। এখান হইতে আলুর দর মহার্ঘ্য হইতে চলিল। একটু নীচেই একটি নাতি-প্রশস্ত ঝরণা নামিয়া গিয়াছে। দুরন্ত চড়াই-উৎরাই পথে আজিকার অপরিসীম ক্লেশ, রাত্রির বিশ্রামে দূরীভূত হইল। বৃদ্ধা দিদি, দাদা, বৌদিদি প্রভৃতি সকলেই নিদ্রা যাইবার অগ্রে পদদ্বয়ে গরম সরিষা তৈল মালিশ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পার্ব্বত্য-পথ অতিক্রম করিবার ইহাও যে একটি অমোঘ দেশী ঔষধ, এ প্রদেশে সহজেই তাহা বুঝা যায়।

প্রভাতে সাতটায় বাহির হইয়া বেলা সাড়ে আটটা আন্দাজ সময়ে সাড়ে তিন মাইল দূরে "নাকুরী" পৌছিলাম। এই স্থানেই ধরাসু-গঙ্গোত্রীর রাস্তা সম্মিলিত হইল এত দিন পরে আবার গঙ্গা-মায়ীর দর্শনলাভ করিয়া সকলেই আনন্দিত হইলাম। ইহারই মনোরম তট-সংযুক্ত একটু প্রশস্ত স্থানে জনৈক স্বামীজী একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উপস্থিত তাঁহার শিষ্য (ব্রহ্মচারিবিশেষ) এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেবতার পূজাকার্য্য চালাইয়া আসিতেছেন। আশে-পাশে আম, নেবু ও পেয়ারার কয়েকটি গাছ কতকটা বাগানের মত এবং কতকটা বা গোলাপ, চামেলি, পান, এলাচি প্রভৃতি রকমারী বৃক্ষে শোভিত হওয়ায়, স্থানটিতে শুধু যে মনুষ্য-সমাগমের চিহ্ন প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা নহে, যমুনোত্তরীর চির-দুর্গম জঙ্গলাকীর্ণ পথের অন্ত হইয়াছে মনে করিয়া সকলেই যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। পার্শ্বে অনতিদূরেই একটি "ডাক-বাংলো"। সেখানে টিহিরী-রাজ মধ্যে মধ্যে পদার্পণ করিয়া থাকেন শুনিলাম। ভুটিয়াদিগের অনেকগুলি তাঁবু দেখিলাম। ভুটান হইতে ইহারা ব্যবসায় উদ্দেশে

প্রতি বৎসরেই আগমন করে। উপর হইতে লবণ, উল, ভেড়ার লোম ইত্যাদি আনিয়া তৎপরিবর্ত্তে গম, আটা, চাউল, দাল প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া লইয়া যায়। গঙ্গোত্রীর নিকটবর্ত্তী "হরশিলা" নামক শীত-বহুল স্থানে ইহাদের প্রধান 'আড্ডা'। এখান হইতে তিন মাইল দূরে "ঢুণ্ডা" গ্রামেও ইহারা ব্যবসায়ার্থ আসিয়া থাকে।

গঙ্গাবক্ষে পরপারে যাইবার একটি মজবুত দড়ির পুল। ওপারে গ্রামান্তর ("আঠালী" প্রভৃতি) হইতে এখানে লোক-চলাচলের সুবিধার জন্যই ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে। আর ছয় মাইল আগে যাইতে পারিলে "উত্তর-কাশী" পৌছিব জানিয়া সকলেই দ্রুতগতি এ স্থান পরিত্যাগ করিলাম।

প্রায় তিন মাইল পথ গঙ্গার তীরে তীরে চলিয়া আসিলাম। পথের ধারে কেবলই বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রভূমি বাঙ্গালাদেশের কথাই মনে আনিয়া দিল। বেলা সাড়ে দশটা আন্দাজ সময়ে "উত্তর-কাশীর" সমীপবর্ত্তী হইলাম। প্রথমেই বামভাগ হইতে ঝরণার আকারে একটি নাতিপ্রশস্ত নদীকে গঙ্গার সহিত মিলিত হইতে দেখিয়া, জিজ্ঞাসায় জানা গেল, উত্তর-কাশীর উত্তর ভাগে ইহাই "বরণা" নদী। সুদূর কাশীর মত এখানেও উত্তরে বরণা ও দক্ষিণভাগে "অসি" প্রবাহিতা জানিয়া, আনন্দ ও বিস্ময়ে যুগপৎ সকলেরই হৃদয় ভরিয়া উঠিল। ভগবান্ বলিল, শুধু ইহাই নহে, ঐ দেখুন! পুণ্যতোয়া ভাগীরথী কাশীর মতই এই উত্তর-কাশীকে বেড় দিয়া উল্লাসে উত্তরাভিমুখেই ছুটিয়া চলিয়াছেন। এখানেও ইহার তীরে তীরে "মণিকর্ণিকা", "কেদারঘাট", "অসিঘাট" প্রভৃতি ঘাট-সমূহ এবং "বিশ্বনাথ", "অন্নপূর্ণা", "কেদার" "কালভৈরব", এমন কি, "ঢুণ্ডিরাজ গণেশ" প্রভৃতি কাশীর দেবতাবৃন্দও আনন্দে বিরাজমান। এই নির্জ্জন হিমগিরির পুণ্য-পূত তপঃপ্রদেশে সকল দিক্ দিয়াই কাশীর সহিত এইরূপ



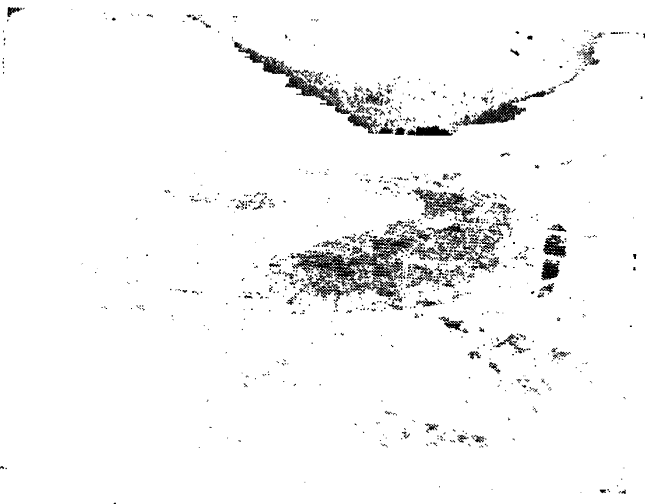
বনের একটি দৃশ্য



উত্তর-কাশীতে অম্বাজী ও অম্বিকেশ্বরজীর মন্দির



পাহাড়ের পার্শ্ববর্ত্তী রাস্তা



উত্তর-কাশী যাইতে গঙ্গার উপর দড়ির পুল

সৌসাদৃশ্য কত দিন হইতে এইভাবে চলিয়া আসিতেছে, এ সূক্ষ্ম গোপন তত্ত্বের এ কি এক অদ্ভুত মনোরম সৃষ্টি-রহস্য! বারাণসীর পূজা ও গৌরবের যাহা কিছু, সমস্তই এখানে বিদ্যমান—একই মুক্তি-মন্ত্রের এই সাধন-পীঠ দর্শন করিবার আশায় অস্থির হইলাম। আনন্দে সকলেই ঝরণার জল স্পর্শ করিয়া মস্তকে ধারণ করতঃ ধীরে ধীরে হৃতভম্বের মত অগ্রসর হইলাম।

মন বলিতেছিল, সেই কাশী আর এই উত্তর-কাশী—উভয় তীর্থের মাঝখানে প্রভেদ কোনখানে কত দিক্ দিয়াই না আজ চোখের আগে ফুটিয়া উঠে! শাস্ত্র খুঁজিলে শুধু পুরাণ বা কাশীখণ্ডে নহে, রামায়ণ-মহাভারতাদি প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থে, এমন কি, বেদে উপনিষদে * পর্য্যন্ত অবিমুক্ত কাশীক্ষেত্রের উল্লেখ দেখা যায়। আর এই উত্তর-কাশীর কথা কেবলমাত্র উত্তরাখণ্ডের তীর্থপুস্তকেই লিপিবদ্ধ আছে। সুতরাং উত্তরকাশী অপেক্ষা কাশীর প্রাচীনতা অনেক বেশী, এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ থাকিলেও, বাহ্য দৃষ্টিতে এই উভয় মুক্তিক্ষেত্রের স্বরূপ যাত্রীর চক্ষুতে অনেকাংশেই আজ পার্থক্য জানাইয়া দেয়। কোথায় এই পুণ্যপূত, মনোরম, নির্জ্জন ভাগীরথী-তট—যেখানে জনকয়েক মাত্র সাধুসন্ত তপস্যাকেই হৃদয়ের সাধন-মন্ত্র মনে করিয়া নিরুদ্বেগে কেবল মুক্তি-অন্বেষণেই আপনাকে ব্যাপৃত রাখিয়াছে, চোখের আগে শুধু প্রকৃতির বিরাট-রূপ বিশালকায় পাহাড়পর্ব্বত ভিন্ন দেখিবার কিছুই নাই, কাণে নিয়তই কুলু-কুলু-নিনাদিনী সুর-তরঙ্গিণীর সুমধুর গীত-ধ্বনি, মনকে কেবল অজানা দেশের নূতন বারতাই সূচিত করিতে

*অথর্ব্ববেদ, জাবালোপনিষদ্ প্রভৃতি পাঠ করিলে পাঠকগণ এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ দেখিতে পাইবেন।

থাকে, সংসারের কল-কোলাহল হইতে দূরে সরিয়া আসিয়া এ
হিমগিরি-গর্ভের সাধন-সুন্দর স্থান উত্তরকাশী আর সেই কাশী প্রাচী
ও পবিত্র মুক্তিক্ষেত্র—এই একই গঙ্গার পবিত্র তীরে অবস্থি
হইলেও স্থান ও রুচিভেদে আমরা আজ সেখানে কি দেখিতে পাই
নানা হাব-ভাব-চাহনি-বিশিষ্ট, ভোগবাসনা-পরিপুষ্ট বিলাস-বিলাসিনী
গণের একায়েক লীলা ও রঙ্গ দেখিবার বিচিত্র নাট্যশালার মত
সন্ধ্যারতি-বন্দনার মাঝখানেও সেখানকার ঘাটে ঘাটে,—ইহাদের
লোলুপ পাপ-রসনা চরিতার্থের নিমিত্ত কেবলই কটু, তিক্ত, তী
গন্ধেরই সরস (?) উপাদান সৃষ্ট হইতেছে! লজ্জার কথা বলিতে বি
অমুক ভট্টাচার্য্যের "ঘি'য়ে ভাজা Salted বাদাম", অমুক চাটার্জ্জি
"অবাক্ জলপান চানা ভাজা" প্রভৃতি জিহ্বারোচক "মুক্তির বাণী" (
কাণের আগে মূলমন্ত্রের মত অনর্গল কোন্ রুচির জয় ঘোষণা করি
বেড়ায়, তাহা লিখিতে গেলে এই ভ্রমণবৃত্তান্তে কেবল অবান্তর কথা
আসিয়া পড়ে।

উত্তর-কাশীর সীমানা মধ্যে চলিয়া আসিতে প্রথমেই বামদি
লালবর্ণের গুচ্ছ গুচ্ছ গোলাপ ফুলের উপর নজর পড়িল। ইহাও সে
শ্বেতবর্ণের 'লতানে' গোলাপ বৃক্ষেরই মত পাহাড়ের কোলে স্থানে স্থা
ঝোপ করিয়া রাখিয়াছে। সাদা গোলাপে একটি করিয়া পাপড়ী থা
ইহার পাপড়ী কিন্তু ডবল দেখিলাম। ফুলগুলি পরিপূর্ণ-সৌন্দর্য্যে আপ
হইতেই যেন শাখাগুলিকে নত করিয়া দিয়াছে। কলুষনাশিনী গঙ্গার তী
তীরে কয়েকটি পুষ্পবাগিচা ও তন্মধ্যকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘরগুলি দেখাই
ভগবান্ বলিল, এ সকল স্থানই বেশীর ভাগ গৈরিকধারীদের তপো
বলিলে অত্যুক্তি হয় না। দেখিতে দেখিতে আমরা ধর্ম্মশালার সমীপব
হইলাম। কালীকম্লীওয়ালার এই সুবৃহৎ দ্বিতল ধর্ম্মশালাটি আমা

চোখে যেন নূতন ঠেকিল। উপরে ও নীচে বড় বড় ঘর লইয়া প্রায় চল্লিশখানির কম নহে। ঘরগুলির ভিতর ও বাহির উভয় দিকেই প্রশস্ত লম্বা বারান্দা। একমাত্র ভিতরের বারান্দার মধ্যেই বহু লোকের রাত্রিযাপন চলিতে পারে। নীচে এক দিকে সারি সারি রান্নাঘর। বাটীর বহির্ভাগে পাইখানা প্রভৃতিরও সুব্যবস্থা আছে। ভিতরভাগের প্রশস্ত আঙ্গিনা দেখিলেই ইহার প্রকাণ্ডতা সহজেই অনুমিত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, আমরা উপরের একখানি প্রশস্ত ঘরে আশ্রয় পাইলাম। অধ্যক্ষ মহাশয় ঘরে বিছাইবার একখানি বৃহৎ সতরঞ্চি এবং বহির্বারান্দায় বসিবার একখানি স্বতন্ত্র কম্বল অযাচিতভাবেই পাঠাইয়া দিলেন। এ সকল সুব্যবস্থা যাত্রীর চোখে কতই না সুন্দর! ধর্ম্মশালার বাহিরেই একটি বড় দোকান, তাহাতে প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যই পাওয়া যায় আটা, চাউল, ঘৃত, চিনি হইতে সুজী, মিছরী, কিশ্‌মিশ্‌, এমন কি, কাগজ, কলম, পেন্সিল প্রভৃতি যাঁহার যাহা আবশ্যক, সমস্তই কিনিতে পাইবেন। আলুর সের চারি আনা, ইহাই এ সকল প্রদেশের একমাত্র তরকারী, অনেক কষ্টে এখানে তিন সের আন্দাজ একটি কুমড়া (বিলাতী) আট আনা মূল্যে সংগ্রহ করিলাম। রুচি বদ্‌লাইবার জন্য ইহাই তখন উপাদেয় মনে হইল। পোস্তদানা দেখিয়া দোকান হইতে উহাও এক পোয়া (চারি আনা মূল্যে) খরিদ করিয়া লইতে বিস্মৃত হইলাম না। এখনও ত এ দিকের পার্ব্বত্য-পথে বহু দিন থাকিতে হইবে। কোন না কোন সময়ে ইহার সদ্ব্যবহার চলিতে পারে। এখানে 'পোষ্টাফিস্' আছে জানিয়া সে সময়ে সকলেই নিজ নিজ বাটীতে যমুনোত্তরী হইতে নির্ব্বিঘ্নে এ স্থানে পৌছান সংবাদ দেওয়া আবশ্যক মনে করিলাম। আহারাদির পরে এইবার আমরা একবার আশপাশ বেড়াইবার জন্য সকলেই বাহির হইলাম। দশ বিশ ঘর বসতবাড়ী,

কয়েকটি রকমারী দোকান, কোথায় বা কথঞ্চিৎ ক্ষেত্রভূমি (তাহাতে তখন তামাকের চাষ দেওয়া ছিল), দু' একটি 'আরি' ফলের গাছ, ইহাই দেখিতে দেখিতে আমরা একটি ছোট স্কুল ময়দানের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। এখানে কাশীর এক পরিচিত মুখ বাঙ্গালী দণ্ডীর (নাম পুরুষোত্তমতীর্থ) সহিত হঠাৎ সাক্ষাৎ হইল। ইনি এখানে দুই বৎসর হইল আসিয়াছেন এবং আশ্রম তৈয়ারের জন্যই বিশেষ ব্যস্ত আছেন। উত্তর-কাশীতে বাঙ্গালী দণ্ডী বা সাধুর সংখ্যা কত জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, তাঁহারা চারি জন, রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রমের পাঁচ জন এবং গঙ্গার পরপারেও আরও চারি জন সাধু লইয়া মোট তেরো জন বাঙ্গালী এখানে রহিয়াছেন।

কালী-কমলীওয়ালার সত্র ভিন্ন এখানে আরও তিনটি, একটি জয়পুর রাজের, একটি পঞ্জাব সিন্ধুপ্রদেশীয় ও আর একটি দণ্ডীর সত্র বিদ্যমান প্রত্যেক সত্রেই দণ্ডী বা সাধুদিগের আহারের ব্যবস্থা আছে। কেবল দণ্ডীর সত্রে দণ্ডীরাই মাত্র আহার পাইয়া থাকেন। বয়োবৃদ্ধিবশত যাঁহারা সত্রে উপস্থিত হইতে অক্ষম, তাঁহাদিগেরও আশ্রমে 'সিধা' (চাউল ইত্যাদি) পাঠানোর নিয়ম আছে। হিমগিরির এই নির্জ্জন পবিত্র পুণ্য-পীঠে যাঁহারা এই সকল সাধু মহাত্মার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, এক দিকে তাঁহারা যেমন ধন্য, অন্য দিকে চতুর্দ্দিক্ পাহাড় বেষ্টিত এই অপরূপ শ্রী-সম্পন্ন মুক্তিক্ষেত্রে বাস করিতে পাইয়া সাধুগণও আপনাদিগকে যেন ধন্য মনে করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই। শীত ঋতু আসিবার সঙ্গে সঙ্গে এই সকল পাহাড়ের উপরে নীচে সর্ব্বত্রই তুষার বৃত হয়, তখন চতুর্দ্দিকেই ইহার অমল-ধবল উজ্জ্বলতা শুধু যে স্থানের শ্রীসম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়া থাকে, তাহা নহে, সুরনর-মুনি-বন্দিতা সুরধুনী তীরে বসিয়া সাধুগণও এ দৃশ্যে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারেন না

সন্ধ্যার পূর্ব্বক্ষণে এ দিন আমরা কেদারঘাটের নির্জ্জন উপকূলে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া, কত কথাই না আলোচনা করিয়াছিলাম। বেশ মনে আছে, আমার অগ্রজ মহাশয় প্রসঙ্গক্রমে সে সময়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, "বল দেখি, এই যে আমরা নিরন্তর পাহাড়, নদী, নির্ঝরের মধ্য দিয়া বরাবর চলিয়া আসিতেছি, এ সকল দেখিয়া শুনিয়া আজ আমাদের মনের গতি কিরূপ অবস্থায় পৌঁছিয়াছে?" তদুত্তরে আমি দশ লাইন মাত্র কবিতার আকারে তাঁহাকে এই কথাই শুনাইয়াছিলাম,—

দিশেহারা নদীর কূলে মন কেন আজ আপন-হারা,
ও সে নদীর মতই তাহার গতি—প্রাণের মাঝে প্রেমের ধারা।
নদী যেমন বাগ্‌ মানে না, অকূল পানে যাচ্ছে ছুটে—
যতই কেন আকাশ-ঠেকা ধূম্র পাহাড় পায়ে লুটে!
মনের গতি সেই মত আজ ছুট্‌ছে অচিন্‌ দেশের পানে
ভোগ-বাসনার পাহাড় ঠেলি যাচ্ছে ভেসে কেমন টানে!
মর্ত্ত্যভূমে স্বর্গ যেমন, হিমগিরির তুষারমাঝে,
তেমনি এ মোর মলিন হিয়া উঠলো রেঙ্গে নবীন সাজে!
আপন. স্বজন, কেউ কোথা নাই, আসক্তি আজ কোথায় ছাড়া,
"চল্‌ আগে চল্‌", পরাণ কেবল ক্ষণে ক্ষণে দিচ্ছে তাড়া!

পরদিন প্রভাতে স্নানাহ্নিক সমাপনান্তে সকলেই বিশ্বনাথ-দর্শনে বহির্গত হইলাম। কাশীর মত এখানে প্রথমে ঢুণ্ডিরাজ গণেশের পূজা করিতে হয়। মন্দিরে সুবৃহৎ জ্যোতির্লিঙ্গ। সাধারণতঃ এ সকল স্থানে মন্দিরের দরজা প্রায়ই ছোট দেখিলাম। যাত্রীর ভিড় আদৌ নাই, এ জন্য পূজা করিতে বসিয়া কাশীর বিশ্বনাথ-মন্দিরের মত মানুষে মানুষে ধাক্কা খাইবার আশঙ্কা নাই। বেশ নিবিষ্টচিত্তে আপনি আপনার ইচ্ছা

ও শক্তিমত পূজা করিতে পারিবেন; পাণ্ডা বা পূজারীর কিছুমাত্র অত্যাচার নাই বলিলেই হয়। সম্মুখে মন্দির-বাহিরে শিবশক্তির এক সুবৃহৎ স্তম্ভ শোভা পাইতেছে। ইহাই এ স্থানে এক নূতন, আশ্চর্য্য ও পবিত্র দৃশ্য। স্তম্ভ-গাত্রটি আগাগোড়া পিত্তল দিয়া ঢাকা। উপরিভাগে একটি কুঠার ও তদুপরি আবার একটি প্রকাণ্ড ত্রিশূল বিদ্যমান। পূজারী মহাশয় বলিলেন, "পরশুরামের স্তবে সন্তুষ্টা শিবশক্তিরূপা ভগবতী তাঁহাকে এই কুঠার প্রদান করিয়াছিলেন।" স্তম্ভগাত্রে টানা-টান অক্ষরে কিছু লেখা রহিয়াছে, ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। তবে কোন্ ভাষায় কি-ই বা লিখিত হইয়াছে, প্রত্নতাত্ত্বিকগণ আজও ইহার মর্ম্ম-উদ্‌ঘাটনে অসমর্থ (?) শুনিলাম। এ স্থানের পূজা সমাপনান্তে আমরা একে একে আর আর মন্দিরে "অন্নপূর্ণা", "দত্তাত্রেয়", "গোপেশ্বর", "পরশুরাম" ও "কেদারনাথ" প্রভৃতি দেবতাগণের দর্শনাদি শেষ করিলাম। সর্ব্বশেষে জয়পুররাজের প্রতিষ্ঠিত মন্দির-সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। মন্দিরটি জয়পুর-মহারাজার এক অতুলনীয় কীর্ত্তি। ইংরাজী ১৯০: খৃষ্টাব্দে এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানে "অম্বিকেশ্বর" শিবমূর্ত্তি ও "অম্বাজী" দেবীমূর্ত্তি এবং আরও অনেকগুলি দেব-দেবী বিরাজ করিতেছেন।

দ্বিপ্রহরে আহারাদির পরে দারুণ বৃষ্টিপাত হইল। সে বৃষ্টিতে ধর্ম্মশালা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বাহির হইবার উপায় ছিল না। অগত্যা এ দিনেও এ স্থানে রাত্রিযাপন করিতে বাধ্য হইলাম। সর্ত্তমত সকল কুলীকেই আহারের জন্য অতিরিক্ত মূল্য স্বীকার করিতে হইল।

সন্ধ্যার পরে এখানকার প্রায় প্রত্যেক ধর্ম্মশালায় "গরুড় ভগবান্‌জীর প্রসাদ বিতরণ, যেন নিত্য-নৈমিত্তিক অনুষ্ঠানের মত প্রত্যেক যাত্রীরই হস্তগত হইয়া থাকে! আর এক বিষয় লক্ষ্য করিলাম, কাশী

মত এখানেও ঢক্কা বাজাইয়া শবের শোভাযাত্রা করার প্রথা আছে। উত্তর-কাশীর আশে-পাশে আরও অনেক কিছু দেখিবার থাকিলেও আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে এ স্থানে বেশী দিন থাকা ঘটিল না। পাহাড়ের উপরিভাগে "রেণুকা" দেবীর (জমদগ্নি ঋষির পত্নী) মন্দির এবং দুই মাইল দূরে "লাক্ষা-গৃহ" বা পঞ্চপাণ্ডবদিগের জতুগৃহ ও তৎসংলগ্ন সুড়ঙ্গ প্রভৃতি দর্শন না করিয়াই পরদিন প্রভাতে এ স্থান হইতে আগে অগ্রসর হইলাম।

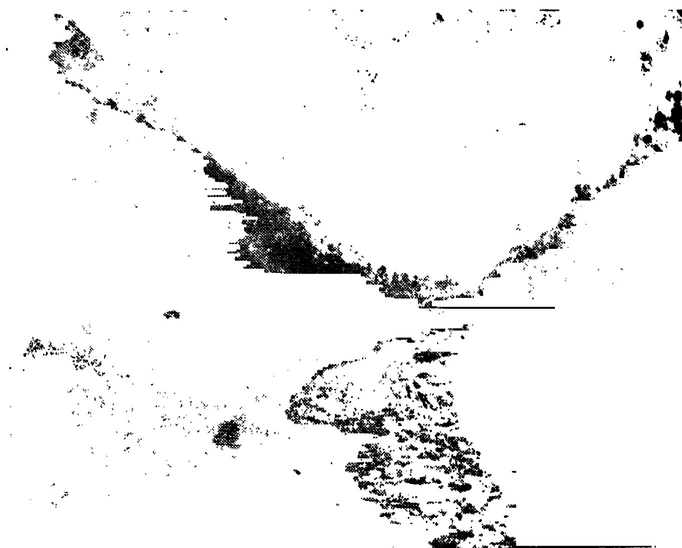
উত্তর-কাশী আসিয়া পর্য্যন্ত ডাণ্ডিওয়ালা ফতে সিং পুনঃ পুনঃ জানাইয়া আসিতেছিল, "এত দিনে এদিক্‌কার দুর্গম কঠিনতম পথের শেষ করিয়া সুগম পথে উপস্থিত হইতে পারিয়াছি।" উদ্দেশ্য—সহযাত্রিণী স্ত্রীলোক-গণকে খুবই সাবধানে আনার জন্য কিছু বখশিস সঞ্চয়। বলা বাহুল্য, এ বিষয়ে তাহার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ক্রমশঃই আমরা উপলব্ধি করিতেছিলাম। এক দিকে সে যেমন মিষ্টভাষী ও দলের সর্দ্দারবিশেষ, অন্যদিকে ডাণ্ডির উপরে আরোহীর সুখ-স্বচ্ছন্দতার প্রতি তাহার যথেষ্ট দৃষ্টি আছে, এমত অবস্থায় স্ত্রীলোক সওয়ারকে মিষ্টবচনে আপ্যায়িত করিয়া মধ্যে মধ্যে সে যে কিছু আদায় করিয়া লইবে, বিচিত্র কি ?

উত্তর-কাশীর আগে 'অসি' নদী পার হইয়া দুই তিন মাইল যাইতে না যাইতে, দূরে চোখের সম্মুখে উত্তর ভাগের তুষার-শুভ্র পাহাড়ের দৃশ্য-গুলি ছবির মতই কয়েক বার উদ্ভাসিত হইল। দক্ষিণভাগে কুলুকুলু-নিনাদিনী ভাগীরথীর পুণ্যপ্রবাহ। তাহারই ওপারে আকাশচুম্বী ধূম্র পাহাড়ের গায়ে গায়ে সর্ব্বত্রই এক্ষণে জরদা রংয়ের অজস্র কাঞ্চনপুষ্প ফুটিয়া রহিয়াছে দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইলাম। সে এক অপরূপ বিচিত্র দৃশ্য। লোকালয়-বর্জ্জিত পাহাড়ের দেশে অযত্ন-সম্ভূত এ অগণিত পুষ্প-বৃক্ষ কে আনিয়া দিল ? তিন মাইল অতিক্রম করিয়া 'নাগানি'

চটী ও তথাকার 'ডাক বাংলো' পশ্চাতে রাখিলাম। এইবার রাস্তা কতকটা পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া গিয়াছে। ক্রমান্বয়ে ৯ মাইল পথ আগে গিয়া এদিনে "মনেরি" আসিয়া রাত্রিযাপনের স্থির হইল। এখানে দুইটি পাকা ধর্ম্মশালা; একটিতে চারিখানি ঘর ও তৎসংলগ্ন বারান্দা, অপরটিতে উপরে ও নীচে একখানি করিয়া ঘর ও সম্মুখে বারান্দা ছিল। আহার-কালে এখানে তরকারীরূপে 'আলুশাক' ও উত্তর-কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরের সংলগ্ন ডুমুর-বৃক্ষ হইতে সংগৃহীত ডুমুরের 'ডালনা' এক অপূর্ব্ব রুচিকর বস্তু বলিয়া সে দিন মনে হইয়াছিল।

পরদিন প্রভাতে পাঁচ মাইল পথ অগ্রসর হইয়া "কুমালটি" চটী পার হইলাম। এখান হইতে আড়াই মাইল আন্দাজ পথ চলিয়া আসিলে দক্ষিণ-ভাগে গঙ্গাবক্ষে পুল ও ওপারে যাইবার রাস্তা দেখিয়া জিজ্ঞাসায় জানিলাম, ঐ পথ বরাবর "কেদারনাথ" অভিমুখে গিয়াছে। এ স্থানের নাম "মনলা" বা "বেলা-টিপ্‌রী"। গঙ্গোত্রী দেখিয়া আমাদিগকে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া ঐ পথ ধরিতে হইবে। এখান হইতে 'ভাটোয়ারী'র দূরত্ব মাত্র দেড় মাইল। এ পথটুকুর বেশীর ভাগই জঙ্গল, তন্মধ্যে "কুইস্থা" নামক পাহাড়ী বৃক্ষই অতিরিক্ত দেখা যায়। স্থানে স্থানে শ্বেতবর্ণের লতানে গোলাপের কুঞ্জ এবং কোথায়ও বা বিছুটীর ঘন-সন্নিবিষ্ট জঙ্গল ভেদ করিয়া খুব সাবধানে আগে যাইতে হয়। এক স্থানে আমাদের মাথার উপরেই এক বিরাটকায় উচ্চ পাহাড়ের প্রকাণ্ড 'চটান' সর্পের মতই ভীষণ ফণা বিস্তার করিয়া ভীতি উৎপাদন করিতেছে। এইরূপ বিচিত্র দৃশ্য দেখিতে দেখিতে বেলা এগারোটা আন্দাজ সময়ে আমরা "ভাটোয়ারী" আসিয়া উপস্থিত হইলাম।"

এক দিক্‌ দিয়া এ স্থানের বিশেষত্ব দেখা যায়। তীর্থযাত্রী যত কিছু মাল-পত্র-আসবাবাদি কুলীর স্কন্ধে লইয়া যান, তাহা সমস্তই



"মনেরি"র নিকটে গঙ্গার দৃশ্য





তুষারশোভী-পাহাড় ও পাইন বন—হরশিলা



এখানে ওজন করাইয়া কুলীগণের মজুরী হইতে নির্দ্দিষ্ট হারে মাশুল লইবার জন্য "টিহিরী-রাজ-সরকার" এখানেই 'আস্তানা' বসাইয়াছেন। শুনিলাম, মজুরী হইতে কুলীদিগকে প্রতি টাকায় ⁄০ এক আনা হিসাবে মাশুল গণিতে হয়। ডাণ্ডি, কাণ্ডি, ঝঁাপান, ঘোড়া, গরু, মহিষ ইত্যাদিতে বা নিজ স্কন্ধে সওয়ার বা বোঝা লইয়া আসিবার দরুণ কুলীগণ যত টাকাই মজুরী হিসাবে অর্জ্জন করিবে, এই নিয়মে তাহারা কর দিয়া তবে আগে যাইতে পারিবে। ফতে সিং পাঁচ ধাম যাইতে যাত্রীর সহিত ২২০৲ টাকা হিসাবে প্রতি ডাণ্ডি মজুরী ঠিক করিয়াছিল, সুতরাং প্রতি ডাণ্ডি পিছু তাহাকে দুই শত কুড়ি আনাই মাশুল গণিয়া দিতে হইল। এইরূপে আবার কর্ণ সিং প্রভৃতি বোঝাওয়ালা আমাদের সমস্ত মালপত্র ওজন করাইয়া সর্ত্তমত ৪০৲ টাকা মণ হিসাবে সমস্ত মজুরীর উপরে প্রতি টাকায় ⁄০ এক আনা হিসাবে উসুল দিয়া—'ছাড়পত্র' গ্রহণ করিল। সরকারের এই মাশুল হইতে কাহারও অব্যাহতি-লাভের উপায় নাই। দুই তিন জন কর্ম্মচারী রসীদ-বহি লইয়া সর্ব্বদাই নূতন যাত্রীর প্রতি নজর রাখিয়াছে। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া মোটামুটি জানিতে পারিলাম যে, এ বিভাগে সরকার বাহাদুরের প্রতি বৎসরেই প্রায় দুই তিন হাজার টাকা আদায় হইয়া থাকে। রসীদ-বহিতে অতিরিক্ত দুইখানি রসীদের মধ্যে কুলীর স্বাক্ষরিত একখানি রসীদ যাত্রীর নিকটে এবং যাত্রীর স্বাক্ষরিত একখানি রসীদ কুলীর নিকটে দিবার ব্যবস্থা আছে শুনিলাম। সরকার বাহাদুর এই সকল আদায়ী টাকা হইতে যাত্রীর সুবিধার্থে রাস্তা ইত্যাদির সংস্কার করিয়া থাকেন। দুঃখের কথা বলিতে কি, যে হিসাবে ইহা আদায়ের সুব্যবস্থা চোখে পড়িল, সে অনুপাতে তীর্থ-যাত্রীর কঠিনতম পথগুলি যথারীতি সংস্কার বা সুগম করা হইয়া

থাকে কি না, এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। যমুনোত্তরীর ধ্বস্-ভাঙ্গা পথগুলির বা "সিঙ্ঠার" পাতাঢাকা অস্পষ্ট কঠিন উৎরাই-পথের অবস্থা স্মরণ করিলে স্বাধীন টিহিরী-রাজের সে দিকে কতদূর লক্ষ্য আছে, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপর কেহই উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন না। এই সকল রসীদ-পত্রে কুলীগণের নাম, ধাম, মালের ওজন, মজুরী প্রভৃতি সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকায়, যাত্রী-দের পক্ষে এক উপকার ইহাই দেখা যায়, যাত্রীদের সহিত কুলীগণ মজুরী ইত্যাদি লইয়া কোন প্রকার উচ্চবাচ্য করিতে পারে না, অধিকন্তু মালপত্র লইয়া কোন কুলী অন্যত্র পলাইয়া গেলে (কদাচিৎ গিয়া থাকে), সহজেই তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করা যায়।

এখানকার ধর্ম্মশালাটি পাকা ও দ্বিতল। উপরে ও নীচে চারিখানি করিয়া ছোট ছোট ঘর আছে। তৎসংলগ্ন প্রশস্ত বারান্দায় বহু যাত্রীর সমাবেশ হইতে পারে। তত্রাপি যমুনোত্তরীর যাত্রিসংখ্যা অপেক্ষা এ পথে অধিক যাত্রীর সমাগম বলিয়া অনেক সময়ে ধর্ম্মশালায় স্থান লাভ করা কঠিন মনে হয়। বহু কষ্টে আমরা উপরের একখানি ছোট ঘর খালি পাইয়াছিলাম। তাহাতেই কোন প্রকারে রাত্রি-যাপন করা হইল।

সূর্য্যদেব এক সময়ে এখানে দেবাদিদেব মহাদেবের তপস্যা করিয়া-ছিলেন বলিয়া এ স্থানের অপর একটি নাম "ভাস্কর-প্রয়াগ।" "ভাস্করেশ্বর" শিব ও তাঁহার মন্দির অদ্যাবধি ইহার প্রাচীনত্ব সূচিত করিতেছে। ধর্ম্মশালা হইতে উত্তরে একটু নীচে নামিলেই গঙ্গা। সেখানে যাত্রিগণ সচরাচর স্নান করিয়া থাকেন। কাশীর মত সেখানে দুই চারি জন 'ঘাটিয়াল' ব্রাহ্মণ স্নানকালে সঙ্কল্প ও পূজা ইত্যাদি করাইয়া থাকেন। 'নব্‌লা' নদী এখানে গঙ্গার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। ওপারে

ধূসর বর্ণের অত্যুচ্চ পাহাড় হইতে শঙ্খের আকারে এক ঝরণা নীচে নামিয়া আসিয়াছে, তাহাকে "শঙ্খ-ধারা" বলা হয়।

ধর্ম্মশালার সম্মুখেই দুই তিনখানি দোকান। দোকানে আহার্য্য দ্রব্য হইতে কেরোসিন তৈল, সাবান, কাগজ-কলম প্রভৃতি কতক কতক মনিহারী দ্রব্য পাওয়া যায়। উৎকৃষ্ট সুগন্ধিযুক্ত চাউল আমরা এখানে প্রতি সের ।৶০ ছয় আনা হিসাবে সংগ্রহ করিয়াছিলাম।

এ যাবৎ পদব্রজে চলিয়া আসিয়া পূজনীয়া বৌদিদি কিছু পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, বিশেষতঃ যমুনোত্তরী পথের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মশকাক্রান্ত হইয়া তাঁহার পদদ্বয়ে দুষ্ট ক্ষত দেখা দেওয়ায়, তাঁহার জন্য আমরা সকলেই একখানি ডাণ্ডির প্রয়োজন মনে করিলাম। অনেক অনুসন্ধানে এ স্থানের জনৈক পাহাড়ীর নিকট হইতে ১৫ টাকা মূল্যে একখানি পুরাতন ডাণ্ডি কিনিতে পাওয়া গেল। তার পর সওয়ার বহন করিবার চারি জন কুলী এককালীন মোট ৭০ টাকা মজুরী স্বীকারে এখান হইতে গঙ্গোত্তরী হইয়া কেদারনাথ তক বরাবর পৌঁছিয়া দিবে, একরূপ ঠিক হইয়া গেল। এই নূতন কুলীদিগের নাম, ধাম, মজুরী ইত্যাদি সরকারী বহিতে লিখাইয়া দিয়া যথারীতি মাশুল দেওয়া হইলে পরদিন প্রত্যুষে নিশ্চিন্তচিত্তে এইবার তিনখানি ডাণ্ডির স্ত্রীলোক-সওয়ার সহ আমরা একে একে ভাটোয়ারী হইতে গঙ্গোত্তরী অভিমুখে রওনা হইলাম।

গঙ্গার তীরে তীরে প্রায় ৬ মাইল পথ চলিয়া আসিয়া গঙ্গাবক্ষের দোদুল্যমান লৌহ-সেতু পার হইতেই সম্মুখে "সতীনারায়ণ" চটীর লম্বা ছপ্পর ঘর দৃষ্ট হইল। এখান হইতে দুই মাইল আন্দাজ পথ আগাগোড়াই কেবল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চট্টানের মুখ-বিবর দিয়াই যেন যাইতে হয়। শুধু মুখ-বিবর বলা যথেষ্ট নহে, পদ-দ্বয়ের নীচেকার

"চোখা-চোখা" তীক্ষ্ণ প্রস্তরখণ্ডগুলি তীক্ষ্ণধার দন্তের মতই পায়ে বিদ্ধ হইতেছিল! খুবই ধীরে ধীরে এ সকল স্থান অতিক্রম করিতে হয়, নতুবা 'হোঁচট' খাইয়া বামদিকে প্রবল-স্রোতা গঙ্গাগর্ভে পতিত হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা। এই সকল চট্টানের গায়ে গায়ে মালতী প্রভৃতি নানা প্রকার লতা-বৃক্ষ সর্পের মত বেষ্টন করিয়াই উপরে উঠিয়াছে। সর্ব্বসমেত ৯ মাইল আন্দাজ আসিয়া "গাঙ্গনানি" পৌছিলাম। গাঙ্গনানি স্থানটি প্রাকৃতিক দৃশ্য হিসাবে অধিকতর গাম্ভীর্য্যময় মনে হইল। ধর্ম্মশালা পৌছিতে প্রথমে দুইটি গরম জলের ঝরণা পাহাড়ের গা দিয়া নামিয়া আসিতে দেখা যায়। উপরে "ঋষিকুণ্ড" ও তৎসংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র মন্দির বিদ্যমান। শুনিলাম, পরাশর ঋষি এককালে এখানে তপস্যা করিয়াছিলেন। তার পর সেতু-*সাহায্যে গঙ্গা পার হইয়া, একটি বৃহদাকার ঝরণার সম্মুখে ইহার অনর্গল প্রচণ্ড শব্দ, যাত্রিগণকে একেবারেই আত্মবিস্মৃত করিয়া দিয়া থাকে। ধর্ম্মশালার সম্মুখেই আকাশস্পর্শী প্রকাণ্ড পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে গায়ে সর্ব্বত্রই কেবল অগণিত রক্তপুষ্প (বুরাসফুল) শোভা বিস্তার করিয়া আছে। মাথার উপরে কেবল মধ্যে মধ্যে খণ্ড খণ্ড তুষারের উজ্জ্বল বিস্তৃতি—সবগুলিই যেন যাত্রীদের চোখে যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময়ের সৃষ্টি করিতেছে।

ধর্ম্মশালা দ্বিতল, উপরে ও নীচে বহু ঘর, ভিতরভাগে প্রশস্ত বারান্দা। বেলা এগারোটা আন্দাজ সময়ে আমরা উপরের একখানি ঘরে আশ্রয়-লাভ করিলাম। কুলীরা বোঝা লইয়া তখনও আসিয়া পৌছে নাই। প্রায় প্রত্যহই তাহারা আমাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছিবার অনেক পরে

* মোটা মোটা লৌহ-তার দিয়া এই সেতু নির্ম্মিত।

পৌঁছিত। এ জন্য আহারাদির কার্য্য শীঘ্র সম্পন্ন করিতে যথেষ্ট বিলম্ব ও অসুবিধা ভোগ হইলেও, কোনপ্রকার প্রতিবিধান চলিত না। আহারাদির পরে অপরাহ্ণ হইতেই আজ নূতন উৎপাত। প্রবল মেঘে আকাশ ছাইয়া ফেলিল এবং সঙ্গে সঙ্গে বর্ষার মত নিদারুণ বৃষ্টিপাতে কোন যাত্রীকেই ধর্ম্মশালা হইতে বাহির হইতে দিল না। সারা রাত্রি বৃষ্টিপাত হইলেও প্রভাতে আকাশ পরিষ্কার হইল না; বরং মেঘ ও বৃষ্টির আড়ম্বর দেখিয়া আমরা এখানেই আজ যথাশীঘ্র আহারাদি শেষ করিয়া লইয়া আগে যাইবার মনস্থ করিলাম। আর্দ্র বাতাসে শীতও যেন সকলকে আড়ষ্ট করিয়া ফেলিল। যাহা হউক, যথাশীঘ্র আহারাদি শেষ করিয়া আমরা এ-দিনে বেলা ১১টা আন্দাজ সময়ে যাত্রা করিলাম। মাথার উপরে বৃষ্টি লইয়া এক হাতে ছাতা ও অন্য হাতে দীর্ঘ যষ্টি সঙ্গে, উঁচু-নীচু পার্ব্বত্য-পথে ক্রমান্বয়ে পাঁচ মাইল পর্য্যন্ত চলিয়া আসিলাম। এই গাঙ্গনানি হইতে গঙ্গোত্রীর দূরত্ব প্রায় ৩০ মাইল হইবে। এক স্থানের পথ বৃষ্টি হওয়ায় অত্যন্ত পিচ্ছিল, সঙ্গে সঙ্গে কঠিন উৎরাই, মধ্যে এক অতি পুরাতন জীর্ণ লৌহসেতু পার হইতে সকল যাত্রীই যথেষ্ট বেগ পাইলেন। এই সঙ্গীন পুলটির সন্নিকটেই আর একটি নূতন লৌহসেতু নির্ম্মিত হইতেছিল। জিজ্ঞাসায় সেখানকার কুলীগণ জানাইল, কলিকাতার জনৈক 'শেঠজী' পুল নির্ম্মাণ-কল্পে এককালীন দশ হাজার টাকা টিহিরী-রাজের হস্তে দান করিয়াছেন। তাই এখানে একটি এবং উপরে যাইতে 'ভৈরবঘাটির' নিকটে আর একটি এই প্রকার পুল নির্ম্মিত হইতেছে। এই স্থানকে "লোহরীনাগ" বলা হয়। এখান হইতে রাস্তার আশপাশের দৃশ্য ক্রমশঃই যেন ভীষণ হইতে ভীষণতর মনে হইল। দুধারেই কঠিনকায় আকাশস্পর্শী নগ্ন পর্ব্বতগুলির চাপে, প্রবলস্রোতা হইয়াও মা জাহ্নবী এখানে আপনার পরিসর কম করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ক্রোধে উন্মাদিনীর মত বিপুল

গর্জ্জনে তাই তাঁহার প্রচণ্ড প্রবাহ ক্ষণে ক্ষণে আছাড়িয়া পড়িতেছে। ক্ষুদ্রশক্তি মনুষ্যের কর্ণ এখানে একেবারেই বধির। অভ্রভেদী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চট্টানগুলি এক একটি বিকটাকার দৈত্যের মতই মুখব্যাদান করিয়া জলের উদ্দামগতি হ্রাস করিবার জন্য দুধারেই যেন ব্যর্থ-প্রয়াসে সারি সারি দাঁড়াইয়া আছে। এ সকল পথে কোথায়ও গঙ্গার একদম তীরে উপল-খণ্ডের উপর দিয়া নামিয়া গিয়াছি, আবার কোথায়ও বা চড়াই-পথে কতক উপরে উঠিয়া নিজেকে ক্ষুদ্র মনে হওয়ায়, প্রাণটুকু যেন ঐ প্রখর-গামিনী গঙ্গার সহিতই মিশাইয়া দিতে ইচ্ছা হইয়াছে! পাহাড়ের রংও স্থানে স্থানে বিভিন্ন দেখিলাম। কয়লার মত 'কুচ্‌কুচে' কালোর উপরে আবার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অভ্রের মত উজ্জ্বল শ্বেতাভ বস্তু-মিশ্রিত পাহাড়ের দৃশ্যে আমরা এ দিনে মোহিত হইয়াছি।

স্থানবিশেষে এই নির্জ্জন পাহাড়-পুরীর নৈসর্গিক গুরুগম্ভীর দৃশ্যগুলি আমাদিগের প্রত্যেককেই স্তব্ধ, বিস্মিত, কখনও বা আতঙ্কে অভিভূত করিয়া দিয়াছিল, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই শেষের ৪ মাইল পথে পরিশ্রান্তচিত্তে আবার সর্ব্বশেষে চড়াই ভাঙ্গিতে হইয়াছিল। দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ ঘণ্টাকাল নিয়ত চলিয়া আসিয়া অপরাহ্ণ সাড়ে চারি ঘটিকার সময়ে আমরা "সুখী" নামক চটীতে উপস্থিত হইলাম। দুঃখের বিষয়, সুখীর ধর্ম্মশালায় আমরা আদৌ সুখী হইতে পারি নাই। ধর্ম্মশালাটি পাকা ও দ্বিতল হইলেও উপরে ও নীচে সমস্ত ঘরই তখন যাত্রি-পরিপূর্ণ ছিল। নীচেকার একখানি ঘরে শুধু তালাবদ্ধ দেখিয়া রক্ষককে কারণ জিজ্ঞাসা করা হইল। তিনি বলিলেন, "ঐ ঘরে আসবাবাদি বন্ধ রাখিয়া এক দল যাত্রী আগে গিয়াছে। দু একদিনমধ্যেই ফিরিয়া আসিবে।" এ কথাটা আমাদের আদৌ ভাল লাগিল না। লোভের বশবর্ত্তী হইয়াই সম্ভবতঃ রক্ষক মহাশয় এইরূপে অন্য যাত্রীকে কষ্ট দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া থাকিবেন।

ঘরগুলির সংলগ্ন বারান্দা থাকিলেও, তাহার সম্মুখদিক্ যে একেবারেই খোলা! দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সেখান হইতে চতুর্দ্দিক চাহিয়া দেখিলাম, সর্ব্বত্রই কেবল মধ্যে মধ্যে জমাট তুষারখণ্ড ছড়াইয়া আছে। সারাদিনের বৃষ্টিপাতে বাহিরের আর্দ্র বাতাস তখন সকলেরই শরীরে বিলক্ষণ কম্পন আনিতেছিল। দিব্যদৃষ্টিতে বুঝিতে পারিলাম, রাত্রিকালে এই উন্মুক্ত বারান্দায় কালযাপন ও কঠিন শীত ভোগ করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। অগত্যা শেষবার রক্ষক মহাশয়কে "নরমে গরমে" অনেক কিছু বলিয়া একখানি বড় সতরঞ্চি দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিলাম। কিছুক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া সে একখানি লম্বা সতরঞ্চি আনিয়া দিল।

কোন প্রকারে জলযোগ সমাপন করিয়া সে রাত্রি সেই বারান্দায় অনিদ্রায় বসিয়া কাটাইতে হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রচণ্ড শীত, তদুপরি আকাশের দুর্য্যোগ ও সঙ্গে সঙ্গে তুষারস্পর্শী আর্দ্র বাতাসের প্রবল হুঙ্কারে আমরা সেই রক্ষক-দত্ত সতরঞ্চিখানি (বিছানার পরিবর্ত্তে) সম্মুখের উন্মুক্ত স্থানে 'আড়' করিয়া বাঁধিয়া আপনাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলাম।

এখানে একখানি দোকান। তাহাতে সকল জিনিষই পাওয়া যায়। তবে কেরোসিন তৈল অত্যন্ত মহার্ঘ, প্রতি বোতল বারো আনা মাত্র!

ধর্ম্মশালাটির আশপাশ বেশীর ভাগ 'চুলু' বৃক্ষে ভরা। নিকটেই ঝরণার প্রশস্ত ধারা যাত্রীদের জলকষ্ট নিবারণ করিয়া থাকে। প্রত্যূষে এখান হইতে আরও এক মাইল আন্দাজ উপরে উঠিয়া চড়াই-পথের শেষ হইল। চারি দিকেই পাহাড়ের মাথায় খণ্ড খণ্ড তুষারগুলি রাঙ্গা-রবির সংস্পর্শে তখন 'উজ্জ্বল-মধুরে' মিশাইয়া বেশ সুন্দর দেখাইতেছিল। এই-বার উৎরাই পথে নামিতে সুরু করিলাম। যতই নামিতে থাকি, ততই আবার এক্ষণে অন্যরূপ দৃশ্য প্রতিভাত হইল। দু'ধারের সে প্রকাণ্ড

চট্টান কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। প্রশস্ত স্থান দেখিয়া প্রবল-স্রোতা ভাগীরথী এখানে অপেক্ষাকৃত ধীর-গামিনী। জল কাচের ন্যায় স্বচ্ছ। শতধা বিভক্ত হইয়াই নামিয়া গিয়াছে। এক স্থানে এক ফার্লং-ব্যাপী রাস্তার উপরে ফেনপুঞ্জসদৃশ তুষাররাশি অতিক্রম করিয়া তিন মাইল দূরে 'ঝালা' গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এ স্থানে কালীকমলী-ওয়ালার পাকা ধর্ম্মশালা ও পঞ্জাবীদের স্বতন্ত্র একটি ধর্ম্মশালা দেখা গেল।

পঞ্জাবীরাও এখানে 'সদাব্রত' দিয়া থাকে। এ স্থান হইতে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া একটি নাতিপ্রশস্ত স্থানে অগণিত 'নুড়ি'র (প্রস্তরখণ্ড) বিস্তার চোখে পড়িল। পশ্চিমদিক্ হইতে আগত দুইটি বৃহদাকার ঝর-ণার পুল পার হইয়া আমরা পুনর্ব্বার গঙ্গাধারের রাস্তা ধরিলাম। এখানে প্রায় অর্দ্ধ-মাইল স্থানের বিস্তৃতির মধ্যে গঙ্গার দুই তিনটি নাতিপ্রশস্ত ধারা আঁকিয়া-বাঁকিয়া এমন ভাবে প্রবাহিত হইয়াছে যে, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে উপর হইতে সেই দিকেই কেবল চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। আঁকা-বাঁকা স্বচ্ছনীল জলের মধ্যে মধ্যে আবার শ্বেতবর্ণের ছোট ছোট অসংখ্য প্রস্তরখণ্ডের উজ্জ্বলতা দূর হইতে দেখিতে যে এত সুন্দর হইতে পারে, ইহা পূর্ব্বে ধারণা করিতে পারি নাই। দুই তিন স্থানে পর পর ফেনা-য়িত তুষারপুঞ্জের উপর দিয়া যাইতে আমাদের মধ্যে প্রায় সকলেই অল্প-বিস্তর আছাড় খাইলেন। কাহারও কাহারও হাতে বা কব্জিতে একটু আধটু আঘাত সহ্য করিতে হইল। এই সকল তুষারের উপরে 'খাঁজ' বা চিহ্ন করা থাকিলে এরূপে পড়িবার আশঙ্কা থাকিত না। এ সময়ে এক দল হিন্দুস্থানীয় স্ত্রীলোক যাত্রীর একটি গান বেশ শ্রুতি-সুখকর মনে হইয়া-ছিল। গানের শেষ চরণে "হো গয়ে ভব-সাগর সে পার—" এই কথা-টার উপরে তাহারা পুনঃ পুনঃ জোর দিয়াই সুর ধরিতেছিল। যেন সেই

কথাটাই তাহাদের অপরিসীম আনন্দলাভের হেতু! স্বদেশ-আত্মীয়-স্বজন-পরিত্যক্ত এই দুরধিগম্য পার্ব্বত্য-পথ যতই তাহারা অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে, তাহাদের মনে ততই যেন চির-দুস্তর ভবসাগরের পারে পৌঁছিবার ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে, এ অনুভূতি প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা সে সময়ে কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক হইয়াছিলাম, এ কথা অত্যুক্তি নহে।

ঝালা হইতে তিন মাইল আন্দাজ আসিয়া 'বগেরি' পড়িল। এ স্থানটি কেবল ভুটিয়াদিগেরই জন্য। ব্যবসায় উদ্দেশে ইহারা যে এ স্থানটিকে একটি কেন্দ্রস্থল করিয়া রাখিয়াছে, তাহা পথিপার্শ্বে তাহাদের সারি সারি দুধারের ঘরগুলিই প্রমাণ করিয়া দেয়। এখান হইতে একটু আগে যাইতেই "হরিশিলা" পৌঁছিলাম। চতুর্দ্দিক্ পাহাড়-বেষ্টিত এ প্রশস্ত স্থানটি অতীব রমণীয় বলিয়াই মনে হইল। এখানে "লক্ষ্মীনারায়ণজীর" মন্দির একটি দ্রষ্টব্য স্থান জানিয়া রাস্তা হইতে দক্ষিণভাগে কতকটা ময়দান—কতকটা বা ক্ষেত্রভূমি পার হইয়া,—গঙ্গার দিকে অগ্রসর হইলাম। গঙ্গার পবিত্র তটদেশেই এই মন্দির ও তৎসংলগ্ন ধর্ম্মশালা দেখিয়া স্বতঃই থাকিবার প্রবৃত্তি জন্মে। মন্দিরের দ্বারদেশে প্রবেশ করিতেই চোখের আগে দুই দিকের দুই মূর্ত্তি নজরে পড়ে। একটি গরুড়জীর ও অপরটি হনুমানজীর। ভিতরের চতুর্ভুজ নারায়ণ ও লক্ষ্মীমূর্ত্তি দেখিতে আরও সুন্দর। মন্দিরের সংলগ্ন আরও কয়েকখানি ঘর দেখিয়া জিজ্ঞাসায় জানিতে পারিলাম, এগুলি ধর্ম্মশালারূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সম্বৎ ১৯৭৭ বিক্রমাব্দে মহারাজ নরেন্দ্রশাহের রাজত্বকালে এই মন্দিরাদি "রাজারাম ব্রহ্মচারী" কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। পার্শ্বদেশে আরও একটি 'শিবমন্দির' পরবৎসরে নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া উক্ত ব্রহ্মচারী মহাশয় 'হরশিলা' নামের-ই সার্থকতা করিয়াছেন সন্দেহ নাই। পূজারী মহাশয় বলিলেন, "আপনারা যে সকল ক্ষেত্রভূমি পার হইয়া এখানে আসিলেন, তৎসমস্তই

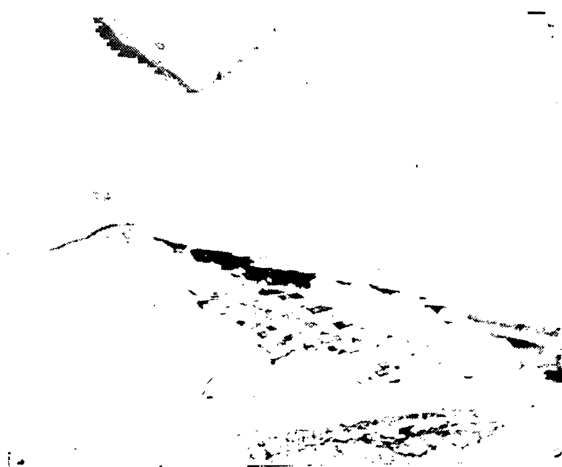
এই দেবতাগণের সেবার্থে এই দাতা উৎসর্গ করিয়াছেন।" পাহাড়ীদের মধ্যেও এতদঞ্চলে এরূপ দাতা বর্ত্তমান জানিয়া আনন্দ হইল। যথাশীঘ্র দর্শনাদি শেষ করিয়া লইয়া, আগে যাইতে মন না সরিলেও আমরা এ দিনে এ স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। যাইতে যাইতে এই হরশিলায় টিহিরী-রাজের একটি বাংলো ও তৎসংলগ্ন উদ্যানের প্রতিও আমাদের দৃষ্টি পড়ে। উদ্যানে তখন আপেল্ ও ন্যাসপাতি প্রভৃতি বৃক্ষে অজস্র সাদা রংএর ফুল প্রস্ফুটিত থাকায়, এ নির্জ্জন পাহাড়তলী যেন আলো করিয়া রাখিয়াছিল। এখান হইতে আরও তিন মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বেলা দশটা আন্দাজ সময়ে "ধরালী" উপস্থিত হইলাম :

"ধরালী" হইতে গঙ্গোত্তরীর দূরত্ব প্রায় বারো মাইল হইবে। "সুখী" পাহাড় হইতে এক্ষণে আমরা বরফের স্তরের মধ্যেই আসিয়া পড়িয়াছি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পাহাড়ের গায়ে, মাথায় কেবলই এই শুভ্রোজ্জ্বল তুষারখণ্ডের বিস্তৃতি! দিন বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি যেন ক্ষণে ক্ষণে নবরূপ ধারণ করিতে থাকে। ধর্ম্মশালার পূর্ব্বভাগে নিকটবর্ত্তী একটি পাহাড়ের আপাদমস্তক এই তুষারের একবারেই কেমন আবৃত দেখিলাম! ঠিক যেন প্রকাণ্ড একখানি হীরক রৌদ্র-কিরণে ঝক্-ঝক্ করিতেছে। এ দৃশ্য সমতলদেশবাসী আমাদিগকে একেবারেই উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দিল। প্রকৃতির রাজ্যে ইহাই ত এখানকার অপরূপ, নূতন ও বিচিত্র বস্তু। বৃক্ষ-লতা-বর্জ্জিত নগ্ন পাহাড়ের শিরোদেশে, এ ভূষণ—বিভূতির মতই সাধক-চক্ষুতে পবিত্র ও সুন্দর মনে হয়।

কলুষনাশিনী গঙ্গা এখানে ধর্ম্মশালার পশ্চিমভাগে প্রবাহিতা। কাচ-স্বচ্ছ নির্ম্মল জল ; উচ্ছলগতিতে তাহা হইতে নিরন্তর কলকল শব্দ উত্থিত হইতেছে। ওপারে পাহাড়ের গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘরগুলি দূর হইতে খেলা-ঘরের মত শোভা পাইতেছিল। শুনিলাম, গঙ্গোত্রীর পাণ্ডাগণ ঐখানে



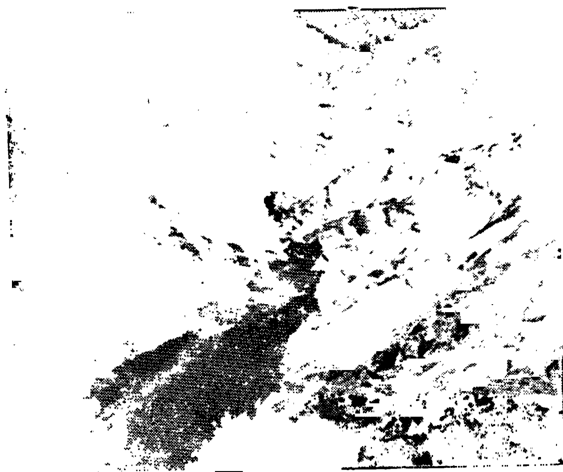
গাঙ্গনানির নিকটে "ঋষিকুণ্ড" (উষ্ণ জলের প্রস্রবণ)



গঙ্গাতটে কাষ্ঠ-নির্ম্মিত কুটীর-শ্রেণী (ঝালা গ্রাম)



গঙ্গাবক্ষে তারের পুল (গাঙ্গনানি)



"ভৈরবঘাটীর" উচ্চ অধিত্যকা হইতে নিম্নে গঙ্গার দৃশ্য

বাস করেন। সর্ব্বতাপ-হরা মায়ের পবিত্র তটে, সৌন্দর্য্য-বেষ্টিত এই উন্নত হিম-গিরি-শিরে বাস মায়ের পূজারিগণের পক্ষে যথোপযুক্ত স্থানই মনে হয়। এদিনে আমরা এখানেই রাত্রিযাপন করিয়া, পরদিন অর্থাৎ ২৭শে বৈশাখ বুধবার প্রত্যূষে গঙ্গোত্রী উদ্দেশ্যে পুনরায় বহির্গত হইলাম। বেলা সাড়ে সাতটা আন্দাজ সময়ে গঙ্গা-বক্ষে পুলের পার্শ্বেই এক চটী দেখিয়া জিজ্ঞাসায় জানিলাম, ইহার নাম "জাংলা চটী।" ধরালী হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় চারি মাইল। এ পথে চলিয়া আসিতে তিন চারি স্থানে অল্প অল্প তুষারের স্তূপ অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। পুল পার হইয়া গঙ্গাকে দক্ষিণে রাখিলাম। এইবার কতকটা পূর্ব্বাভিমুখ হইয়াই চড়াই-পথে ক্রমশঃ উপরে উঠিয়া চলিতেছি। পাহাড়ের গায়ে এ স্থানের পাইন-বনগুলি দেখিতে অতীব সুন্দর। স্থানের সংস্পর্শে ইহারাও যেন দৃশ্যের গাম্ভীর্য্য বাড়াইয়া দিয়াছে! বিশালকায় পাহাড়ের গা দিয়া উপরে উঠিতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চট্টানের নিম্নদেশে মায়ের প্রবাহ-শব্দ কোথায়ও অস্পষ্ট, কোথাও মধুর, আবার কোথাও বা প্রচণ্ডরূপে যাত্রীর কাণ বধির করিয়া দিয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধ করিতেছে। কিছু দূর আগে গিয়া বামভাগে উপরে যাইবার আর একটি রাস্তা দেখিলাম। ভগবান বলিল, "উহা তিব্বতাভিমুখে যাইবার পথ। ভুটিয়াগণ ঐ পথে এ প্রদেশে যাতায়াত করিয়া থাকে। কৈলাস ও মানস তীর্থে যাইতে গেলে যাত্রিগণ এই পথ দিয়াই কদাচিৎ কেহ কেহ গিয়া থাকেন। তবে এ পথ আমাদের পক্ষে অতীব সাংঘাতিক ও বহু আয়াসসাধ্য বলিয়া শুনিয়া আসিতেছি।* অধিকাংশ স্থলই বিলক্ষণ তুষারপিচ্ছিল বলিয়া একমাত্র ভুটিয়াগণেরই এ

* এ পথে অতি দুর্গম "নিলং" (Nelang pass) পাস্ অতিক্রম করিয়া "কৈলাস" যাইতে হয়।

সকল পথে যাইবার সাহস আছে।" লেখক যে কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই সে তীর্থ দর্শনের সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিল, আমাদের সহযাত্রী ভগবান্ তাহা এখানে আসিয়াই প্রথম জানিতে পারিল। সাধু-সন্ন্যাসী ছাড়া আমাদের মত সমতলদেশবাসী গৃহী যাত্রী যে কৈলাস যাত্রা করিতে সমর্থ, ইহা তখনও পর্য্যন্ত তাহার ধারণার অতীত ছিল। তাই সে হতভম্বের মত জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, "আপনারা কোন্ পথ দিয়া কৈলাসে গিয়াছিলেন?" "সেখানে কি দেখিলেন?" "মানসসরোবরে নীলপদ্ম দেখিতে কেমন" ইত্যাদি প্রশ্নের যথাসম্ভব উত্তর * শুনিয়াও সে যেন বিশ্বাস করিতে পারিল না। ফল কথা, কৈলাস তীর্থ যে পাহাড়ীদের পক্ষেও বিলক্ষণ ভয়াবহ, এ কথা বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না।

নীচের রাস্তা ধরিয়া এ পথে আমরা এক খরস্রোতা নদীর পুল পার হইলাম। নদীটির নাম শুনিলাম—"জাহ্নবী"। এই জাহ্নবীর স্রোতোগর্জ্জন এতই ভয়াবহ যে, ইহার জন্যই এতদঞ্চলে এই নদী ভয়ঙ্করীরূপে পাহাড়ীদের নিকট বিখ্যাত হইয়াছে। পুলটির সাংঘাতিক ভগ্নাবস্থা হেতু তৎপার্শ্বেই আর একটি নূতন লৌহসেতু তখন নির্ম্মিত হইতেছিল। উপরের পথে যে আর একটি নূতন পুল নির্ম্মাণের কথা ইতিপূর্ব্বে শুনিয়া আসিয়াছি, তাহা যে ইহাই, ইহা বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না। এই ভৈরবঘাটীর কঠিন চড়াইপথে দুধারেই যেরূপ আকাশ-স্পর্শী ভীষণ পাহাড়, তাহাতে তন্মধ্যকার এই স্থান অর্থাৎ যেখানে এই প্রবল-স্রোতা জাহ্নবী নদী গঙ্গার সহিত প্রচণ্ডবেগে সম্মিলিত হইয়াছে, সে স্থানের অবিরাম উত্তাল-তরঙ্গ-নিনাদিত জল-কল্লোল মানুষকে কিরূপ ভীত, বিস্মিত

* এ সম্বন্ধে যদি কেহ সবিশেষ জানিতে ইচ্ছা করেন, তবে মৎপ্রণীত "মানসসরোবর ও কৈলাস" পুস্তক পাঠ করিবেন।—লেখক।

ও স্তব্ধ করিয়া দিয়া থাকে, তাহা প্রত্যক্ষদর্শী ভিন্ন অপর কেহই বুঝিতে সমর্থ হইবেন না, ইহা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে। আমরা ভাগীরথীকে দক্ষিণে রাখিয়াই আগে যাইতেছিলাম। বামদিকে পাহাড়ের গা বাহিয়া গেরুয়া রংএর রঞ্জিত একটি ঝরণার ক্ষীণধারা নীচে নামিয়াছে। "ভগবান সিংহ সেই ধারায় ললাটদেশ রঞ্জিত করিল। পাহাড়ের উপরিভাগে "ভৈরবনাথজী" বিরাজমান আছেন। এই ধারা তাঁহারই 'বিভূতি' ভিন্ন আর কিছুই নহে, একথা শ্রবণে আমরা সকলেই সে সময়ে এই পরম বিভূতি স্ব স্ব ললাটে লেপন করিয়াছিলাম। বেলা দশটা আন্দাজ সময়ে পাহাড়ের উপরিভাগের এই ভৈরবনাথজীর মন্দিরসমক্ষে উপস্থিত হইয়া পরিশ্রম বশতঃ সকলেই এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম লইতে বাধ্য হইলাম। মন্দিরের সুন্দর মূর্ত্তি সকলেরই মাথা নত করিয়া দিল। ভীষণ পার্ব্বত্য-পথের দুরধিগম্য স্থানে মধ্যে মধ্যে এইরূপ দেবমূর্ত্তিদর্শন যাত্রীর প্রাণে কতই না উৎসাহ আনন্দ আনিয়া দেয়! মন্দিরের আশে-পাশে কয়েকখানি ঘর ধর্ম্মশালার মতই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। একখানি মাত্র ক্ষুদ্র দোকান, তাহাতে চাউল, আটা, ঘৃত প্রভৃতি কিছু কিছু আহার্য্য দ্রব্য পাওয়া যায়। তবে থাকিবার অসুবিধা এই যে, এ স্থানে পানীয় জলের অত্যন্ত অভাব দেখিলাম। এক মাইল দুর হইতে একটি ক্ষীণধারা লম্বা লম্বা চীরাগাছকে নালার আকারে কাটিয়া তৎসাহায্যে ধরিয়া আনা হইয়াছে। নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিতে সে ধারার এতই ক্ষীণাবস্থা যে, তৃষ্ণা দুর করিবার জন্য এক অঞ্জলি জলের আশায় প্রত্যেক যাত্রীকেই ন্যূনপক্ষে পাঁচ মিনিট কাল অপেক্ষা করিতে হয়। এই দুঃখ নিবারণের নিমিত্ত কাণপুরের জনৈকা স্ত্রীলোক এ স্থানে ঐ জলসঞ্চয়ের একটি 'টঙ্কি' (চৌবাচ্ছার মত) নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, অল্পে অল্পে সঞ্চিত ঐ টঙ্কির মধ্যগত জল এতই অপরিষ্কার যে,

পান করা দূরের কথা, স্পর্শ করিতেই প্রত্যেকে যেন শিহরিয়া উঠেন। চড়াই পথের ক্লেশ দূর করিতে গিয়া, সকল প্রকার যাত্রীই ইহার যথেচ্ছ ব্যবহারে জলটুকু যে নিরন্তর দূষিত করিয়া রাখিতেছে—জলের অবস্থা দেখিয়া ইহা স্পষ্টই প্রতীতি জন্মে।

আর ৩ মাইল আগে যাইতে পারিলেই আমাদের গঙ্গোত্তরী পৌঁছিবার কথা, তাই আর কালবিলম্ব না করিয়াই এখান হইতে এবার উৎরাই পথে নামিতে সুরু করিলাম। আঁকিয়া-বাঁকিয়া এ পথ ক্রমশঃই উত্তরাভিমুখ হইয়াছে। দক্ষিণভাগে গঙ্গার ওপারে বিশালকায় পর্ব্বত-শিখরের স্থানে স্থানে ঘন-সন্নিবিষ্ট পাইন বৃক্ষগুলি দেখিতে ঠিক যেন ধ্যানমগ্ন যোগিশ্রেষ্ঠের জটাজূটেরই মত। এবং সেই জটাজূট-সংস্পৃষ্ট শুভ্রোজ্জ্বল তুষারের বিস্তৃতি, ফেনপুঞ্জের মত পাহাড়ের গা দিয়া সর্পাকৃতি যেখানে নীচে নামিয়া গঙ্গায় সম্মিলিত হইয়াছে, সে স্থান—বলিতে কি, সুমধুর 'গঙ্গাবতরণে'র প্রত্যক্ষ দৃশ্যের মত কত রূপেই না যাত্রিগণের নয়ন-মন চরিতার্থ করিয়া থাকে। উৎরাই-পথে কিছুদূর চলিয়া আসিতেই চোখের সম্মুখে উত্তর ভাগের তুষারের শুভ্র-সুন্দর শৃঙ্গগুলি সারি সারি অগণিত রজত-মন্দিরের সুবিমল জ্যোতির্বিস্তারের মত অকস্মাৎ ঝলসিয়া উঠিল। সূর্য্য-কিরণপ্রতিবিম্বিত সে এক অপূর্ব্ব নৈসর্গিক সুষমা। ঐ সুষমাই যেন সুর-নরমুনি-বাঞ্ছিত স্বর্গের চির-সুন্দর দিব্য নিকেতন! সংসারের অসার বাসনার মোহ-শয়নে নিয়তই যাঁহাদের নেত্র-যুগল তন্দ্রাজড়িত থাকে, বহির্জগতের এই অপরূপ শোভা-সন্দর্শনের সাক্ষাৎ সৌভাগ্য তাঁহাদের পক্ষে কখনই সম্ভবপর নহে। তাই ক্ষণেকের জন্য সে সময়ে দেশ, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব—সকলেরই উদ্দেশে কে যেন জোর করিয়াই অন্তরের মাঝখানে ধাক্কা দিয়া জানাইতে চাহিল, "ও রে ভ্রান্ত, হিম-গিরির এই চিত্র-বিচিত্র পবিত্র চলচ্চিত্রের সুন্দরতার

আকর্ষণে আজ পর্য্যন্ত কেহই মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে নাই!, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন প্রভৃতি যাঁহাদের কর্ম্মজীবনে বিরাট বিশাল মহাভারতের সৃষ্টি হইয়া গেল, তাঁহারাও কর্ম্মক্ষেত্রের শুভ অবসরে, এক সময়ে এই লোকালয়বর্জ্জিত পবিত্র পথকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ ও চরম মনে করিয়া 'মহাপ্রস্থানে' ধন্য হইয়াছিলেন! আজিকার দিনে মানুষ কেবল তুচ্ছ মানাপমান, ভোগবাসনা ও কামিনী-কাঞ্চনের আসক্তির মধ্যে নিয়তই প্রপীড়িত হইয়া বাস করা স্বাচ্ছন্দ্যজনক মনে করিয়া থাকে। নতুবা পথ ভুলিয়াও একবার এই সকল প্রত্যক্ষ-পবিত্র সত্যপথে অগ্রসর হইবার জন্য কয় জনকে আগ্রহান্বিত দেখা যায়?

আত্মহারার মত এইরূপ বিচিত্র দৃশ্য দেখিতে দেখিতে আগে চলিতেছিলাম। দুধারেই গঙ্গার তীরে তীরে এইবার অগণিত ঝাউ গাছের শ্রেণী। ধ্যানমগ্ন, ধীর, স্থির তাহারা যেন স্তিমিত লোচনেই মায়ের মহিমা-স্তবে সমাসীন! আশে পাশে চারিদিকেই কেবল খণ্ড খণ্ড তুষারের বিস্তৃতি। বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে রৌদ্রকিরণে তাহারা কেমন উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতেছে। এই একান্তনির্জ্জন পাহাড়পুরী দেবাদিদেব মহাদেবের শুভ্র অট্টহাস্যে যেন দিগ্‌দিগন্ত পরিপূর্ণ রাখিয়াছে! সংসারে দৈনন্দিন সুখ-দুঃখের ঘাত-প্রতিঘাতে নিরন্তর জর্জ্জরিত, কলুষিত চিত্ত আজ এই পবিত্র, স্বভাব-সুন্দর, বিরাট, গাম্ভীর্য্যময় দৃশ্যের মাঝখানে কোথায় যেন আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। একস্থানে একটি বৃহৎ ঝরণার পার্শ্বে বরফের স্তূপে রাস্তা ঢাকা ছিল। তাহা অতিক্রম করিবার সময়ে বামদিকের পাহাড়টিকে ঠিক যেন জগন্নাথদেবের সুবৃহৎ মন্দিরের মত ভ্রম হইল! রাস্তার ধারে ধারে স্থানে স্থানে বিলক্ষণ বিস্তৃত উপলখণ্ড বহু দুর পর্য্যন্ত নীচের স্থান আচ্ছাদন করিয়া রাখায়—মুনি-ঋষিগণের সমাধিস্থ হইবার এক একটি অন্ধকার নির্জ্জন

গুহা বলিয়াই মনে হয়। সকলের অলক্ষ্যে চক্ষুযুগল এক একবার এই সকল গুহার নিভৃত কন্দরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছিল, যদি কোন সাধু-মহাত্মার দর্শনলাভ ঘটে। নানা চিন্তায় অন্যমনস্ক হইয়া সেদিন বেলা বারটা অন্দাজ সময়ে আমরা সকলেই একে একে গঙ্গোত্তরীর পবিত্র মন্দির-সমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

ষষ্ঠ পর্ব্ব

২য় ধাম—গঙ্গোত্তরী

এই সেই হিমগিরি-নির্ঝরিণী, পূতসলিলা, সর্ব্বসন্তাপনাশিনী সুরধুনীর সুর-নর-মুনি-বাঞ্ছিত স্বচ্ছ সুশীতল প্রথম প্রবাহধারা। এ ধারা অদূরের ঐ উত্তরভাগস্থিত রজতগিরির অমল-ধবল পুণ্যময় পাদদেশ হইতেই নামিয়া আসিতেছে। কি উচ্ছলিত, তরঙ্গায়িত ইহার চঞ্চল গতি। কল-কল্লোল-মুখরিত হইয়া এই নিস্তব্ধ পাহাড়-প্রকৃতি যেন প্রাণময় করিয়া রাখিয়াছে! কত যুগযুগান্তরের এই অমৃতশীতল প্রবাহধারা এবং ইহার ঠিক উৎপত্তি স্থল কোন্‌খানে, তাহা নির্ণয় করা একেবারেই দুঃসাধ্য বলিলে হয়। এই সদ্যঃপাপসংহন্ত্রী মায়ের মহিমা হিন্দুর প্রত্যেক ধর্ম্মগ্রন্থেই শতমুখে প্রকীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং ইহার উৎপত্তি-স্থল বিচারের পূর্ব্বে একবার পুণ্য পীযূষ-ধারার বিশিষ্টতা সম্বন্ধে যদি আলোচনা করিতে অগ্রসর হই, তবে কোন্ কথাগুলি আমাদের প্রাণে বাজে ?

"গঙ্গয়া ন সমং তীর্থং পাবনং সর্ব্বদেহিনাম্।
যতোঽসৌ বাসুদেবস্য তনুরেব ন সংশয়ঃ॥"

ইনি সেই মঙ্গলময় বাসুদেবরই তনু, ইহাই তাঁহার প্রথম পরিচয় জানিয়া থাকি। এই 'সর্ব্বতীর্থময়ী' গঙ্গা কোথায় বাস করেন ? তদুত্তরে—"যাং দধার পুরা ব্রহ্মা ব্যাপারকলসে বিভুঃ" "মহাদেবস্য শিরসি বর্ত্ততে সরিদুত্তমা।" "স্ফুরদিন্দুকলাভাস্বজ্জটাটব্যাং বিরাজিনীম্।" প্রভৃতি শাস্ত্র-বচনে তাহা সুস্পষ্ট উক্ত রহিয়াছে। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার কমণ্ডলুমধ্যে অথবা

দেবাদিদেব মহাদেবের ঘন-সন্নিবিষ্ট জটামধ্যে যাঁহার বাস, তাঁহার উৎপত্তি মর্ত্ত্যের মানব চর্ম্মচক্ষুতে দর্শন করিবার সৌভাগ্য করিবে, এ আশা "পঙ্গুর গিরি লঙ্ঘনের" মতই দুরাশা নহে কি ?

শুনিলাম, এখান হইতে আরও ১৮ মাইল এই গঙ্গার তীরে তীরে উপরে যাইতে পারিলে, উজ্জ্বল তুষারের মধ্য দিয়া মায়ের এই প্রবাহধারা অধিকতর সূক্ষ্মরূপে নামিয়া আসিতে দেখা যায়। সে স্থানকে গো-মুখীধারা বলে।* আষাঢ়ের শেষভাগে তুষার কমিয়া গেলে কোন কোন সাধু-মহাত্মা এই গোমুখী-ধারা দেখিবার জন্য অসহ্য ক্লেশ স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু অনুসন্ধানে যত দূর জানা গিয়াছে, তাহাতে এই দুর্গম-তম স্থানে উপস্থিত হইয়া এ যাবৎ চর্ম্মচক্ষুতে কেহই সে গোমুখাকারে গুহার প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। অবশ্য "গো-মুখী" অর্থে গো-মুখাকার গুহা, ইহা কেবল 'লোকপ্রসিদ্ধি'ই চলিয়া আসিতেছে, শাস্ত্র-বচনের মধ্যে বিশেষ ভাবে এরূপ কিছু উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

রামায়ণ বা স্কন্দপুরাণান্তর্গত কেদার-খণ্ডের মধ্য হইতে এই গঙ্গাবতরণের অধ্যায় বিশেষভাবে পাঠ করিয়া সুস্পষ্টভাবে আমরা কতদূর জানিতে পারিয়াছি ?—মায়ের পুণ্য-প্রবাহ মর্ত্ত্যে আনিবার জন্য সগর-কুলোদ্ভব রাজর্ষি ভগীরথের হিমালয়-গমন, † ও উগ্র তপস্যার দ্বারা শিবকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে অভীষ্ট বরলাভ যথা,—

* বাচস্পত্যভিধান বা শব্দকল্পদ্রুম দৃষ্টে জানা যায়, "গোমুখী" অর্থে "হিমালয়াদ্‌-গঙ্গা-পতনে গোমুখাকারগুহা—ইতি লোক-প্রসিদ্ধিঃ।"

† "হিমালয়ং নগং গচ্ছ ভাবিকার্য্যপ্রবর্ত্তনে।"
কেদারখণ্ডে—ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

"ধারাং ত্রৈলোক্যপাপঘ্নীং গৃহাণ পিতৃমুক্তয়ে ॥
যস্যা দর্শনমাত্রেণ সর্ব্বে যান্তি শুভাং গতিম্ ॥"

এই ত্রৈলোক্য-পাপঘ্নী-ভাগীরথী যে দিন প্রথম প্রবাহরূপে প্রত্যক্ষ-প্রকাশ পাইলেন, সে দিনের সেই সুমহান্ শুভক্ষণে, স্বর্গ হইতে নামিয়া ইন্দ্র আদি দেবগণ এবং যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, মুনি-ঋষি প্রভৃতি সিদ্ধচারী সকলেই যেরূপ সমস্বরে রাজর্ষি ভগীরথের জয়গান গাহিয়াছিলেন, তাহা হইতেই আমরা ইহার গুরুত্ব বিশেষরূপেই উপলব্ধি করিয়া থাকি।

"ইন্দ্রোঽপি লোকপালৈশ্চ গঙ্গায়া দর্শনায় বৈ।
গায়ন্ত্যোঽপ্সরসাং শ্রেষ্ঠাস্তথা গন্ধর্ব্বসত্তমাঃ ॥"

"বভূবঃ সর্ব্বতো দিগ্‌ভ্যো জয় রাজন্ ভগীরথ।
রাজন্ জয়েতি সততং ঋষয়ঃ সিদ্ধচারণঃ ॥"

ইত্যাদি বচনই ইহার যথেষ্ট প্রমাণ।

এই মহোৎসব-সময়ের বাদ্যও ছিল নানাপ্রকার।

"নেদুঃ সর্ব্বাণি বাদ্যানি ভেরী ভাংকারকানি চ।
শঙ্খানাং চ মৃদঙ্গানাং গো-মুখানাং * তথৈব চ ॥"

সে সময়ে শঙ্খ, মৃদঙ্গ, গো-মুখ প্রভৃতি নানা প্রকার মাঙ্গলিক বাদ্য-ধ্বনি শ্রুত হইয়াছিল।

সেই মহীয়সী পুণ্যকাহিনীর সুমধুর স্মৃতি লইয়া আজ আমরা সকলেই একে একে এই অমল ধবল তুষার-কিরীট-পরিশোভিত হিম-গিরির তপঃপূত জাগ্রত মহাপীঠ-সন্নিধানে ভাগীরথীর প্রথম প্রবাহ-ধারা

* বাচস্পত্যভিধানে গোমুখম্ অর্থে বাদ্যভাণ্ডম্। পাঠকগণ—এই গোমুখ শব্দকে যেন 'গোমুখী' মনে না করেন—লেখক।

প্রত্যক্ষ করিলাম। হৃদয়ের দৈন্য, ক্লেদ সমস্তই মুছিয়া গিয়া মায়ের চরণে লুটাইয়া পড়িতে ইচ্ছা হইল। পাণ্ডাকে সঙ্গে লইয়া যথাবিধি সঙ্কল্পপূর্ব্বক স্নানের জন্য ব্যস্ত হইলাম।

মন্দিরের অল্প নীচেই গঙ্গা-পার্শ্বে "ভগীরথ শীলায়" সঙ্কল্প করিবার নিয়ম। দুঃখের বিষয়, গত বৎসরের বর্ষাগমে মায়ের প্রচণ্ড স্রোত সে শিলার চিহ্ন পর্য্যন্ত লোপ করিয়া দিয়াছে। শুধু শিলা নহে, উপরের গঙ্গা-মন্দির-সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র শিব-মন্দিরের আশ-পাশ ও সমুদায় ঘাটটি একবারেই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কোথায় যে লীন হইয়াছে, বলিবার উপায় নাই! পাণ্ডা ঠাকুর উপরের মন্দিরসংলগ্ন ভগ্নাবস্থা দেখাইয়া যথেষ্ট দুঃখ প্রকাশ করিলেন। তদুত্তরে আমরা কেবল সহানুভূতিই দেখাইলাম; মনে করিলাম, রাজর্ষি ভগীরথ যখন 'ব্রহ্মলোকে,' তখন তাঁহার ভগীরথ-শিলা যে গঙ্গাগর্ভে লীন হইবে, বিচিত্র কি? তবে মর্ত্ত্যবাসীর জন্য সর্ব্ব-সন্তাপনাশিনী যে ধারা তিনি মর্ত্ত্যে আনিয়া দিয়াছেন, তাহার উত্তাল-তরঙ্গ রোধ করিতে যদি কোন শক্তিমান বর্ত্তমান থাকেন, তবে সে এক মাত্র জঠাজূটধারী স্বয়ং স্বয়ম্ভু ভিন্ন আর কেহ নহেন! মানুষ তাহার নিজের ক্ষুদ্র শক্তি অনুযায়ী যাহা করিতে পারে, এই দুর্গম বিশালকায় পার্ব্বত্য প্রদেশে কেবল তাহাই করিয়াছে। সুশোভন মন্দির, বাসযোগ্য ধর্ম্মশালা ও যথাসম্ভব আহার্য্য দ্রব্যের দোকান, এ কয়টির ব্যবস্থাই তাহার পক্ষে কঠিন ও আয়াসসাধ্য মনে হয়। ভাঙ্গাগড়ার কর্ত্তা ভগবান্।

এই গঙ্গোত্তরী সমুদ্রগর্ভ হইতে প্রায় ১০ হাজার ৩ শত ফুট উচ্চে অবস্থিত। সুতরাং নিরন্তর তুষারসমাচ্ছন্ন হিমগিরির এ স্থানে শীতের আধিক্য যথেষ্ট বলিলেই হয়। মসৌরী হইতে এ যাবৎ আমরা পাহাড়ের পর পাহাড় অতিক্রম করিয়া একদম তুষারের রাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। শীতটা ক্রমশঃই যেন "গা-সহা গোছ" হইয়া গিয়াছিল। তথাপি যমুনোত্তরী

অপেক্ষা এ স্থানের শীত অনেক কম বলিয়াই মনে হইল। শীত অল্প বলিয়াই আমরা এখানে অবগাহন-স্নান করিবার সঙ্কল্প করিলাম। কাচ-স্বচ্ছ জলের দিকে তাকাইলে চক্ষু শীতল হয়, স্পর্শে শরীর-মন শিহরিয়া উঠে। হিমশীতলপ্রবাহ-ধারার পরিসর এখানে প্রায় ২০।২৫ হাত হইতে পারে, কিন্তু এত অধিক স্রোত যে, কোমর পর্য্যন্ত * জলে নামিতেই মনে হয় যেন মায়ের স্রোতে ভাসিয়া চলিলাম। কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করিয়া সকলেই যখন ডুব দিয়া উপরে উঠিলাম, দেহখানি যেন শরীর ছাড়িয়া টলিতে আরম্ভ করিয়াছে। সর্ব্বাঙ্গ মুছিবার পর তবে আয়ত্তের ভিতর শরীর ফিরিয়া পাইলাম। এই সেই পাপাপহারী সদ্য-পবিত্র জাহ্নবী-ধারার অমৃতস্পর্শ! যাহার সংস্পর্শে আসিয়া আধুনিক যুগের জ্ঞানগুরু স্বামী বিবেকানন্দ, বিংশ শতাব্দীর সভ্য-ভব্য নবরুচিসম্পন্ন বাবুদের সমক্ষে সেদিন প্রাণ খুলিয়া ঘোষণা করিয়া গেলেন, "এ ধারা পান করা মাত্র—লণ্ডন, প্যারী, রোম ও বার্লিনের ঐশ্বর্য্য, বিলাস, কর্ম্মপ্রবাহ, অগণিত জনস্রোত সবই যেন চক্ষুর সম্মুখে থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেত।.........কেবল শুনতাম, সুরতরঙ্গিণী শিরায় শিরায় সঞ্চরণ করছেন, আর গর্জ্জে গর্জ্জে ডাকছেন,—হর হর ব্যোম ব্যোম।"

স্নানান্তে উপরে আসিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মন্দিরটি অতি সুশোভন। শুনিলাম, জয়পুরের মহামহিম মহারাজ-বাহাদুর আজ চারি বৎসর হইল, প্রায় তিন লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। মন্দিরে বহু মূর্ত্তি বিরাজিত দেখিলাম। মধ্য-স্থলে গঙ্গাদেবীর সুবর্ণ-প্রতিমা, তদ্দক্ষিণে ও বামে যথাক্রমে লক্ষ্মী ও

* জলের গভীরতা ইহার বেশী নহে।

যমুনাদেবীর শ্বেত ও কৃষ্ণপ্রস্তরমূর্ত্তি ; ইহাদের নীচে লক্ষ্মী-মূর্ত্তির দক্ষিণে জাহ্নবীর শ্বেতপ্রস্তরমূর্ত্তি, তৎপার্শ্বে রৌপ্যনির্ম্মিত সরস্বতী, তৎপার্শ্বেই অন্নপূর্ণা ও ভগীরথের কৃষ্ণপ্রস্তর-মূর্ত্তি, সকলেই যেন হাস্যবদনে শোভা পাইতেছেন।

যাত্রীরা সকলেই এখানে আনন্দগদগদচিত্ত। কি যেন দুর্ল্লভ, পবিত্র মধুর বস্তু নিকটে পাইয়া তাহারা আপন আপন দেশ, আত্মীয়-স্বজন, মরতের শোকতাপ বিস্মৃতপ্রায়, একে একে এই বিশ্বপ্রকৃতির পর্ব্বতান্তরালে লুক্কায়িত স্বর্গের সৌন্দর্য্য-দুয়ারে 'ধর্ণা' দিয়া, শক্তি ও সামর্থ্যানুসারে শুধু বস্তু বা অর্থ দিয়া নহে, প্রাণ-মন পর্য্যন্ত সমর্পণ করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতে পারিতেছে না।

যথাশক্তি পূজা ও ব্রাহ্মণভোজনের দরুণ পাণ্ডাঠাকুরকে কথঞ্চিৎ দক্ষিণা প্রদান করিয়া আমরা এই গঙ্গোত্তরীর পবিত্র বারি আপন আপন হাল্কা এনামেলের পাত্রে (জগে) সকলেই ভরিয়া লইলাম। ভগবান্ এই পাত্রের মুখ আঁটিয়া লইবার জন্য (গালার দ্বারা) একটি লোকের নিকটে দিয়া আসিল। বলা বাহুল্য, সে লোক এই কার্য্যে সেথানে প্রত্যেক যাত্রীর নিকট হইতেই বেশ দু'পয়সা রোজগার করিয়া থাকে।

ধর্ম্মশালার অভাব নাই। একা কালীকমলীওয়ালারই সাতটি, জয়পুর রাজার একটি এবং রাজারাম ব্রহ্মচারীর একটি—সর্ব্বসমেত নয়টি ধর্ম্মশালায় বহু যাত্রীরই সমাবেশ হইতে পারে।

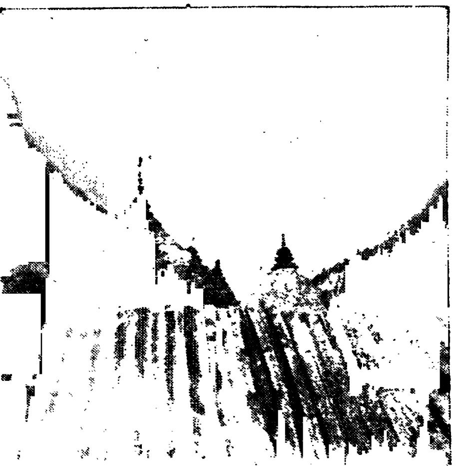
এখানে দুগ্ধ একেবারেই দুষ্প্রাপ্য। দোকানে চাউল, আটা, ঘৃত, চিনি প্রভৃতি পাওয়া যায়, তবে চাউল আদৌ ভাল নহে। প্রতি সেরে আট আনা খরচ করিয়াও সে চাউলে অন্নের আস্বাদ পাই নাই। কেরোসিন তৈল প্রতি বোতল এগারো আনা মাত্র! এ তীর্থে যাত্রীর সংখ্যা নিতান্ত কম নহে, সুতরাং স্থানের গুরুত্ব হিসাবে এখানে যাত্রীদের সুখ-সুবিধার

নিমিত্ত সরকারের তরফ হইতে ডাকঘরের ব্যবস্থা কেন হয় নাই, বুঝিলাম না।

আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত যমুনোত্তরী-পথের সুরাটী যাত্রিদলের সহিত পুনরায় এখানে সাক্ষাৎ হইল। দলের কর্ত্তা-ব্যক্তি (নাম কালিদাস-দ্বারকাদাস) ধনবান্, ধার্ম্মিক ও সদাশয় বলিয়াই মনে হইল। ইতিপূর্ব্বে তিনি "নাকুরী" নামক স্থানে "সোমেশ্বর" মন্দিরের মেরামত কার্য্যের জন্য এক শত টাকা এবং এইখানে ওপারে যাইবার এক পুল নির্ম্মাণকল্পে দুই শত টাকা দান করিয়াছেন শুনিলাম। ত্রিরাত্রি এ তীর্থে বাস করিয়া এক্ষণে অদ্যই আবার কেদার-বদরী উদ্দেশে যাত্রা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। যাত্রার পূর্ব্বে এবারে তাঁহার সহিত যথেষ্ট আলাপ-পরিচয়ের সুযোগ পাওয়া গিয়াছিল। বিভিন্ন প্রদেশীয় হইলেও, স্ত্রীলোক সহ আমরা এক সঙ্গে পাঁচ ধাম যাত্রার সহযাত্রী হইতে সাহস করিয়াছি, সংবাদে তিনি যথেষ্ট সাহস ও সহানুভূতি দেখাইয়া বলিলেন, "আপ লোঁগো কো ইস্ কঠিন যাত্রা মে বহুত হী তকলীফ উঠাওনা পড়েগা।" ভগবানের ইচ্ছা!

এই সুরাটী ভদ্রলোকের কথায় আমি বৈকালের দিকে এ দিন গঙ্গার ওপারের এক সাধু মহাত্মাকে দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। সাধুটির নাম "কৃষ্ণাশ্রম"। "পাহাড়ী নঙ্গা বাবা" নামেই ইঁহার খ্যাতি। দেখিলাম, কৃষ্ণকায় "গোলগাল" আকৃতি, মহাদেবের মতই এই নির্জ্জন হিমপ্রদেশে উলঙ্গাবস্থায় বসিয়া আছেন। প্রণাম জানাইলে তাঁহার প্রসন্ন বদনে বালকের মতই হাসি ফুটিয়া উঠিল! কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম, ইনি মৌন-ব্রতধারী। সুতরাং বিরক্তির ভয়ে প্রথমতঃ তাঁহাকে বেশী কিছু জিজ্ঞাসার সাহস করি নাই। আকার-ইঙ্গিত ও প্রশ্নে যখন তাঁহার সন্তোষভাব পরিস্ফুট হইল, তখন তাঁহাকে লইয়া অনেক কথাই আলোচনা হইয়াছিল।

কাশীতেই আমার উপস্থিত নিবাস জানিয়া তিনি আপনা হইতেই "কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের" কয়েকখানি নক্সা দেখাইয়া (হস্ত দ্বারা মাটীতে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে) বলিলেন, "কাশী হইতে মালব্যজী একবার আমাকে ভিত্তি স্থাপনের সময় ওখানে লইয়া গিয়াছিলেন; আবার সেখানে মন্দির প্রতিষ্ঠার সময়েও হয় ত লইয়া যাইবেন, এইরূপ তাঁহার সহিত কথা হইয়া আছে।" অধিকতর প্রসন্নচিত্তে তিনি অঙ্গুলী-সঙ্কেতে আমাকে নিকটস্থ একটি কাষ্ঠনির্ম্মিত ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের (মন্দিরাকারের) মধ্যে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। তাহাতেও মেঝের পরিবর্ত্তে তক্তাই বিছানো ছিল। তাহারই একখানি তক্তা উত্তোলন করতঃ নিম্নদেশে বিস্তৃত এক ব্যাঘ্র-চর্ম্মাসন দেখাইয়া জানাইলেন, "আমার জপতপ-সাধনার জন্য এই নির্জ্জন প্রকোষ্ঠ ও তন্মধ্যকার এই নিম্নপ্রদেশের গুহা নির্ম্মিত হইয়াছে। কাশীর জনৈক ডেপুটী কলেক্টর (নাম "রামেশ্বর দয়াল") প্রায় ৪৫০ টাকা ব্যয়ে ইহা সম্প্রতি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।" ইহাতে তাঁহার কতই যে আনন্দ, তাহা তাঁহার সে সময়কার প্রসন্ন নেত্রযুগল দেখিয়াই স্পষ্টতঃ উপলব্ধি হইল। উক্ত ডেপুটী মহোদয়ের ও মালব্যজীর কয়েকখানি চিঠিও সে সময়ে বাহির করিয়া আমাকে দেখাইলেন। সারল্যের প্রতিমূর্ত্তি এই উলঙ্গ সাধুর নিঃসঙ্কোচে এরূপ অকপট ব্যবহার সে সময়ে আমাকে তাঁহার প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধাকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। এক যাত্রী তাহার ব্যাধির উপশমমানসে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা জানাইল। তদুত্তরে তিনি কেবল তাঁহার উলঙ্গ দেহখানি দেখাইয়া সঙ্কেতে তাঁহার নিকটে যে কিছু নাই, এই ভাবই প্রকাশ করিলেন, এবং উপরের দিকেই হাত জোড়পূর্ব্বক প্রার্থনা করিবার উপদেশ দিলেন। এ-কথা সে-কথার পর আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, গোমুখীধারায় তিনি গিয়াছেন কি না? তদুত্তরে তিনি তিনবার সে ধারা দর্শনে গিয়াছেন



গঙ্গোত্রীর গঙ্গা-মন্দিরের পশ্চাৎ দৃশ্য



গঙ্গা-মন্দির—গঙ্গোত্রী

ষষ্ঠ পর্ব্ব—



তুষারপাতের পরের দৃশ্য—বামপার্শ্বে তুষারাবৃত গঙ্গামন্দিরের মস্তক দেখা যাইতেছে



মন্দির নিম্নে গঙ্গা প্রবাহিতা — গঙ্গোত্রী

জানিতে পারিলাম। ১৮ মাইল আগে তুষারের স্তূপ মধ্য হইতেই এই পবিত্র ধারা নির্গত হইয়াছে, ইহা তিনি স্পষ্টতঃই প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছেন। গোমুখাকারে গুহার দর্শন তাঁহার চক্ষুতে আদৌ পড়ে নাই এবং গোমুখ যে সেই ব্রহ্মলোকে, ইহাও তিনি ইঙ্গিতে না জানাইয়া থাকিতে পারিলেন না! দৈনন্দিন আহার সম্বন্ধেও তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসু হইলাম। তদুত্তরে তিনি বিলক্ষণ দুঃখ প্রকাশ করতঃ পোড়া পেটের উপরে হাত দিয়া সহজ সরল ভাবেই ইঙ্গিত জানাইলেন, "সব জিনিষেরই পার পাইয়াছি, কিন্তু ইহার পার পাইতেছি না," এটুকু জানাইবার সঙ্গে সঙ্গে হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন। রুক্ষকেশা জনৈকা বিধবার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করতঃ দেখাইয়া বলিলেন, "এই পোড়া পেটের জন্য ইনিই আমার আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।"

নির্জ্জন গঙ্গোত্রীর উপকূলের এই উলঙ্গ সাধু মহাত্মার অলৌকিকত্ব সম্বন্ধে বাদানুবাদ বা পরীক্ষার জন্য আমার চিত্ত আদৌ সমুৎসুক ছিল না, তাই সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমি ধীরে ধীরে তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া, আবার এপারে ফিরিয়া আসিলাম।

আমাদের দুই ধাম যাত্রা সম্পূর্ণ হইল। ইতিপূর্ব্বে যমুনোত্তরী ধামে যে ভাবে কুলীগণকে "ইনাম-খিচুড়ী" দিয়া আসিয়াছি, এখানেও সেইভাবে তাহাদের পাওনা মিটাইলাম.। এতদতিরিক্ত এইবার তাহারা "চানা-চবৈনি"র দাবী জানাইল। জিজ্ঞাসায় বুঝিলাম, ইহা আর কিছু নহে—নির্দ্দিষ্ট মজুরী ব্যতীত প্রত্যেক কুলীরই দৈনন্দিন এক আনা হিসাবে অতিরিক্ত দক্ষিণা। ইহা তাহারা যাত্রীর নিকট হইতে চিরদিনই পাইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, চানা-চবৈনির এই ইতিহাসে আমরা বিস্মিত হই নাই। দুর্গম পার্ব্বত্য-পথে তীর্থপর্য্যটনে বাহির হইয়া যাত্রী বা যাত্রীর বোঝা যখন ইহাদের স্কন্ধে উঠিয়া চলিয়াছে, তখন যেন তেন প্রকারেণ

ইহারা যে আপন আপন প্রাপ্য গণ্ডা এই ভাবে আদায় করিয়া লইবে, বিচিত্র কি? কুলীদিগের সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না। দুই ধাম সম্পূর্ণ করিতে আজ পর্য্যন্ত তাহারা আমাদের সহিত ২৪ দিন ক্রমান্বয়ে চলিয়া আসিতেছে। হিসাব করিয়া দেখিলাম, প্রায় ১৯৬॥০ মাইল যাত্রা সম্পূর্ণ হইয়াছে। * সুতরাং প্রত্যেক কুলীরই আজ চল্লিশ আনা অতিরিক্ত লাভ ঘটিল। যাত্রী অর্থাৎ আমাদের মনে সন্তোষ ইহাই ছিল যে, বদরী-কেদার অপেক্ষা অধিকতর দুর্গম যাত্রাপথ আমরা শেষ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

সন্ধ্যাকালে হিমগিরি-প্রবাহিণীর এই নির্জ্জন গঙ্গাতটে ও গঙ্গামন্দিরে আরতি দর্শন করিয়া সকলেই আনন্দ-সস্মিত-চিত্তে রাত্রিযাপন করিলাম। ধর্ম্মশালার সুব্যবস্থা থাকায় কাহারও কোন বিষয়ে কষ্ট মনে হয় নাই।

পরদিন গঙ্গোত্তরীর পবিত্র-ধারা মস্তকে রাখিয়া আহারান্তে পুরাতন পথে আবার ১২ মাইল দূরের ধরাণী ধর্ম্মশালায় ফিরিয়া আসিয়া রাত্রি কাটিল। মন এক্ষণে এইবার "কেদারনাথ" তীর্থের পথান্বেষণে চঞ্চল হইয়াছে। দ্বিতীয় দিনে "সুখীর" ধর্ম্মশালায় মধ্যাহ্নকৃত্য শেষ করতঃ একেবারে ১৮ মাইল পথ ফিরিয়া আসিয়া 'গাঙ্গনানি'তে বিশ্রামলাভ ঘটিল। তৎপরদিন বেলা সাড়ে দশটায় একেবারে "ভাটোয়ারী" আসিয়া হাজির দিলাম। এখানে একদিন থাকা সাব্যস্ত হওয়ায়, আমরা সকলেই সন্ধ্যাকালে জনৈক বাঙ্গালী সাধুকে দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। ইঁহার নাম প্রজ্ঞানন্দ ব্রহ্মচারী। ব্রহ্মচারীর বয়স খুব বেশী মনে হইল না, তথাপি আলাপ-পরিচয়ে তাঁহার শাস্ত্রচর্চ্চায় বিলক্ষণ অনুরাগ প্রত্যক্ষ করিলাম। উপস্থিত তিনি গীতা, উপনিষদ্ ও ভাগবত গ্রন্থের অনেক

* যাত্রীর সুবিধার্থে আমরা এই দুই তীর্থপথের সংক্ষিপ্ত বিবরণ স্থানান্তরে লিপিবদ্ধ করিলাম।—লেখক।

কিছু টীকা-টীপ্পনী সংগ্রহ করিয়া সেগুলিকে পুস্তকাগারে মুদ্রণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। বৎসরের মধ্যে অর্দ্ধেক সময় ইনি উত্তর-কাশীতে এবং অর্দ্ধেক সময় এই ভাটোয়ারীর নির্জ্জন গঙ্গাতটের আশ্রমে দিনযাপন করেন শুনিলাম। পাঁচ বৎসরকাল এই ভাবে চলিয়া আসিতেছে। তৎপূর্ব্বে তিনি চারি বৎসর মৌনী ছিলেন। তাঁহার প্রমুখাৎ অবগত হইলাম, এই ভাটোয়ারীতে ৩৫ ঘর ব্রাহ্মণের বসবাস আছে। তাঁহাদেরই দেওয়া ভিক্ষায় তাঁহার "দিন-গত পাপক্ষয়ে"র ব্যবস্থা। তাঁহার পূর্ব্ব-জীবনের কতক কতক ইতিহাস তিনি আমাদের সমক্ষে সরল-চিত্তেই প্রকাশ করিলেন। এক সময়ে তিনি এক গভীর কূপমধ্যে তিনদিন অজ্ঞানাবস্থায় কাল কাটাইয়াও এখনও পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছেন। সুতরাং জীবন-মরণ উভয়ই যে ভগবান্ ভিন্ন অপরের ইচ্ছায় চালিত হইতে পারে, ইহা তাঁহার ধারণাতীত।

সারা রাত্রি অজস্র শিলাপাত ও সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি হয়। প্রভাতে সদ্যঃস্নাত গোলাপের গন্ধে ভরপূর থাকিয়া আমরা প্রায় ১॥০ মাইল পথ অতিক্রম করতঃ এইবার "বেলা-টিপরীর * নূতন চটীতে উপস্থিত হইলাম। এখান হইতে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্বাভিমুখী চড়াই পথে উঠিতে হইবে। গঙ্গাতটে সম্প্রতি একটি মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। শুনিলাম, অর্থ সংগ্রহ করিয়া এইবার সেখানে "ভোলেশ্বর" মহাদেব প্রতিষ্ঠিত হইবেন। ঘাটের নাম "বেদপ্রয়াগ"। পাণ্ডা বলিল, গঙ্গোত্তরী, কেদারনাথ ও বদরীনারায়ণ এই তিন তীর্থের মধ্যগত একটি পাহাড়ে "কমল-নাভি" পরিশোভিত একটি 'তালাব' আছে। উহার নাম "শতরুদ্র তালাব"। সেখান হইতে শতরুদ্র গঙ্গা নামিয়া আসিয়া এই বেদপ্রয়াগে মিলিত হইয়াছে।

---

* কেহ কেহ ইহাকে "মন্‌লা" চটীও বলিয়া থাকেন।

বেলা-টিপরী হইতে আরও দুই মাইল পর্য্যন্ত পথের দুই পাশেই আবার গোলাপের জঙ্গল। তার পর "হারি" নামে এক গ্রাম অতিক্রম করিলাম। গ্রামের সন্নিকটে স্থানে স্থানে কতকটা ধান্যের ক্ষেত, আবার কতকটা বা আফিমের চাষ। সে সময়ে আফিম গাছে অজস্র ফুল ধরিয়াছিল। এখানে একটি বড় ঝরণার পুল পার হইতে হইল। ঝরণার পার্শ্বে "তুতরানা" নামক দুইটি জন্তুকে দৌড়াইয়া যাইতে দেখিলাম। ইহা অনেকটা ধূসর বর্ণের শিয়ালের মত। তবে আকারে ইহার লেজের দিক্‌টা একটু বেশী লম্বা। এখানে এই ঝরণার নিকটে জনৈক দোকানদার একটি ছপ্পর-ঘরে সামান্য রকমের দোকান সাজাইয়া রাখিয়াছে। নাম শুনিলাম "সৌরগড়" চটী। এইবার এখান হইতে একদম খাড়া চড়াই-সংযুক্ত সঙ্কীর্ণ পথ ধরিয়া পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে এই চড়াই-পথ উঠিয়া চলিতে, আমরা পদব্রজের যাত্রী, সকলেই বিলক্ষণ গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া উঠিতে হইল। ডাণ্ডিবাহকদিগের ক্লেশের অবধি ছিল না। প্রথমে তাহারা স্ত্রীলোক-সওয়ারকে নামাইয়া দিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, একমাত্র ক্ষীণশরীরা বৃদ্ধা দিদি ভিন্ন অপর কেহই চড়াই-পথে উঠা-নামা করিতে আদৌ অভ্যস্ত ছিলেন না। "জ্ঞাতি-পত্নী" চড়াই-পথ সম্মুখে দেখিলেই একেবারে অস্থির হইয়া পড়েন। আজিকার চড়াই-পথে তাঁহার মুখ দিয়া নূতন কথা বাহির হইল। বলিলেন, "চড়াই-পথগুলি যেন সাধন-মার্গের সোপান, একেবারেই দুরারোহ। আর উৎরাই কিন্তু ঠিক তাহার বিপরীত, একবারে পাপমার্গে লইয়া যাইবার সহজ সরল সিঁড়ি—মনে করিলেই নামিয়া যাওয়া যায়।" কথাগুলি মন্দ লাগিল না। কোন্‌খান হইতে অন্তরের এই বেদনা ফুটিয়া উঠিয়াছে, বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না। কলিকাতা নগরীর বিদ্যুৎযন্ত্র-চালিত পাখার নিম্নে আরাম-কেদারায় বসিয়া

যাঁহাদের সুখ-সেব্য জীবন পরিচালিত হয়, আজ তাঁহাদিগকে দৈববশে এই কঠিন জঙ্গলাকীর্ণ পার্ব্বত্য চড়াইপথ পদব্রজে উঠিয়া চলিত হইবে! মাথার উপরে দারুণ রৌদ্র প্রতিক্ষণেই সকলকে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর করিয়া তুলিয়াছিল! অসহায় যাত্রীর মত কখনও তাঁহারা ডাণ্ডিওয়ালার হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে কিছু দূর উপরে উঠেন—কখনও বা পরিশ্রান্তি বশতঃ একবারে ডাণ্ডির মধ্যে সওয়ার হইয়া বসেন—মুখে কেবল অস্বস্তির নিশ্বাস ভিন্ন বাক্যান্তর নাই—এইভাবে এক মাইল উঠিয়া আসিয়া "সালু" গ্রাম অতিক্রম করিলাম। এইবার এখান হইতে আর একটি পাহাড়ের স্তর উঠিয়া চলিতে হইবে। পাহাড়ের গায়ে কেবলই নানা জাতীয় বৃক্ষের জঙ্গল ভিন্ন দেখিবার অন্য কিছুই নাই। দেড় মাইল উপরে উঠিয়া একটি ছপ্পরঘর দৃষ্ট হইল। নাম শুনিলাম "ফিয়ালু"। এই ফিয়ালু চটীতেই দ্বিপ্রহরে আহারাদি সম্পন্ন করিতেই সকলেই ব্যস্ত হইলেন। পাহাড়ের গা বাহিয়া একটিমাত্র ক্ষীণ ধারা নামিয়া আসিয়াছে। তাহা এতই অল্প যে, তাহাকে কাযে লাগাইবার জন্য তাহার গায়ে একটিমাত্র পাতা সংযুক্ত করিয়া, তাহারই অগ্রভাগ দিয়া নামাইয়া দেওয়া হইয়াছে। দ্বিপ্রহরের ক্ষুৎপিপাসাতুর আমরা সকলেই এই ক্ষীণ ধারার সাহায্যেই স্নানাহার সম্পন্ন করিলাম। এখান হইতে উত্তরদিকের তুষারাচ্ছাদিত পাহাড়ের অমল-ধবল দৃশ্যগুলি দেখিতে অতি সুন্দর। যাহা হউক, আহারান্তে ত্বরিতগতি আমরা বেলা দুইটা আন্দাজ সময়ে আবার উপরে উঠিতে সুরু করিলাম। নিস্তব্ধ পাহাড় ও জঙ্গলের মাঝখানে কোথাও এতটুকু শব্দ নাই! কি যেন অজানা নেশার ঘোরে যন্ত্রচালিতের মত আমরা কয় জন যাত্রী নিঃশব্দে উপরে উঠিয়া চলিতেছি। কেবল অলক্ষ্যে একপ্রকার ঝিঁঝিঁপোকার ডাক নূপুরধ্বনির মতই মৃদু-মধুর শুনা যাইতেছিল। ক্রমশঃ গভীর হইতে গভীরতম জঙ্গলের মধ্যে আসিয়া

পড়িলাম। পথও বিলক্ষণ পাতা-ঢাকা ও অস্পষ্ট হইয়া উঠিল। এইরূপে জঙ্গল ভেদ করিয়া আমরা সন্ধ্যার প্রাক্কালে "ছুনা" চটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ভাটোয়ারী হইতে এ পর্য্যন্ত আজ সাড়ে নয় মাইল পথ মাত্র আসা হইল।

মহাজঙ্গলের মাঝখানে ছুনার ধর্ম্মশালা "সবে ধন নীলমণি"র মত যাত্রিগণের একমাত্র বিশ্রামের স্থান। চারিদিকে নিকটে কোথায়ও গ্রামের চিহ্নমাত্র নাই। যত দূর দৃষ্টি যায়—কেবলই ঘনসন্নিবিষ্ট পাহাড়ী নানা জাতীয় গভীর অরণ্য দিনের বেলায়ই মানুষকে ভয়-চকিত করিয়া তুলে। ধর্ম্মশালাটিতে মাত্র চারিখানি ঘর। শুনিলাম, রূড়কী প্রদেশের গোকুলচাঁদ নামক এক ব্যক্তি ইহার নির্ম্মাতা। একখানি ঘরে হৃষী-কেশের "পাঞ্জাব-সিন্ধু-সত্রে"র তরফ হইতে এখানে 'সদাব্রত' দেওয়ার ব্যবস্থা থাকায় আটা, গুড়, চিনি, প্রভৃতি লইয়া এক জন হিন্দুস্থানী ব্যক্তি এ স্থানটি আগলাইয়া বসিয়া আছেন। উক্ত সত্রের তরফ হইতে ইঁহার মাহিনার ব্যবস্থা আছে। এই লোকালয়বর্জ্জিত ভীষণ অরণ্যের পথে অকুণ্ঠিতচিত্তে যাঁহারা যাত্রীর মুখ চাহিয়া এই সেবাব্রতের আয়োজন করিয়াছেন, তাঁহাদের দানধর্ম্মের বিশেষত্ব কয় জনে জানিতে পারেন? আড়ম্বরহীন এই গোপন দানের কথা সংবাদপত্রে কখনও উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হয় না—লক্ষ লক্ষ নর-নারীর সম্মুখে দাতাদের জয়ধ্বনি নানারূপে আত্মপ্রকাশ করিবার অপেক্ষা না রাখিয়াই তীর্থ-যাত্রিসেবারত এই ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মগণ এইরূপ সৎসাহসে আপনাদিগকে ধন্য মনে করিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

ছুনা হইতে পরদিন আগে যাইবার রাস্তা আরও ভীষণ মনে হইল। দুর্ভেদ্য জঙ্গলের মধ্যে এখানে মানুষ প্রবেশ করা দূরের কথা—স্বয়ং মার্ত্তণ্ডদেব আপনার অণুমাত্র কিরণ প্রকাশ করিতে একেবারেই অক্ষম

হইয়াছেন! লতা-পাদপ শাখা-প্রশাখা সমস্তই এ স্থানে বিলক্ষণ শৈবাল-পরিপূর্ণ; পথও একেবারে অস্পষ্ট বলিলেই চলে। কোন স্থানে এইরূপ পথের উপরেই আবার বৃক্ষগুলি লম্বমান শুইয়া রহিয়াছে। যাত্রিগণের আগে যাইতে ইহাই যে একমাত্র নির্দ্দিষ্ট পথ, তাহা বুঝিবার কিছুমাত্র উপায় নাই। এক স্থানে উপর হইতে নালার আকারে একটি ঝরণা আঁকিয়া বাঁকিয়া নামিয়া আসিয়াছে—তাহারই স্রোতঃসিক্ত পিচ্ছিল স্থানের উপর দিয়া উপরে যাইতে ডাণ্ডিওয়ালা দুই দুইবার সওয়ার স্কন্ধে পতিত হইল—অসহায় যাত্রীর জন্য এমন জঘন্য রাস্তা যে এখনও ব্যবহৃত হইতে পারে,—ইহা আমাদের একেবারেই ধারণাতীত মনে হইল। এই জঙ্গলের মধ্যে দু'একটি কঠিনদর্শন পাহাড়ীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। তাহাদের প্রমুখাৎ ইহাও জানিলাম যে, আজ কয়েক সপ্তাহ হইতে এ জঙ্গলে হিংস্র জন্তুর উৎপাতও চলিতেছে। দিনের বেলায় গরু মহিষ অদৃশ্য হইয়া যায়। এ সংবাদ আমাদের বড় ভাল লাগে নাই—তাই ডাণ্ডি-বাহক, বোঝা-বাহক প্রভৃতি সকলকেই এদিন একসঙ্গে সঙ্গী করিয়া লইয়া আগে চলিয়াছিলাম। রাস্তার দুর্দ্দশার কথা বর্ণনা করিয়া কুলীগণ এখানে সরকার বাহাদুরকে যথেষ্ট গালিগালাজ করিল এবং ইহা যে স্বাধীন টিহিরীরাজের কলঙ্কবিশেষ, এ কথা স্পষ্টতঃ জানাইতে অণুমাত্র দ্বিধা বোধ করিল না। এ পথে চারি মাইল অতিক্রম করিবার পরে এক শ্যামশষ্পশোভিত প্রশস্ত ময়দানের উপর আসিয়া সকলেই হাঁফ ছাড়িলাম। এতক্ষণ যেন আলোকের দেশ হইতে কোথায় চলিয়া গিয়াছিলাম।

এখানে একখানিমাত্র ছপ্পর ঘর। নাম শুনিলাম "বেলক চটী"। একটিমাত্র ঝরণা ঝির ঝির রবে পাশে নামিয়া গিয়াছে। চটী হইতে দুগ্ধ ও চিনি খরিদ করিয়া সকলেই অল্পাধিক পরিতৃপ্ত হইলেন। তার

পর বরাবর পাঁচ মাইল উৎরাই পথ নামিয়া আসিয়া বেলা ১২টা আন্দাজ সময়ে "পঙ্‌রানার" ছপ্পরযুক্ত লম্বা চটীতে সকলেই সেদিনকার মত বিশ্রাম লইতে বাধ্য হইলাম।

এখান হইতে আবহাওয়া যেন একটু গরম মনে হইল। সে কঠিন শীত যেন এ দেশে নাই। আহারান্তে বিশ্রামের পর, বহুদিন পরে আজ "পিওকঁহা" পাপিয়ার সুমধুর স্বর কাণে পৌঁছিল। পরদিন অর্থাৎ ৩রা জ্যৈষ্ঠ বুধবার প্রত্যূষে এখান হইতে আবার কতক চড়াই ও কতকটা বা উৎরাই পথে* ধীরে ধীরে নামিয়া আসিয়া "বালগঙ্গা" নদীর তীরে "বগলা"র দ্বিতল ছপ্পরযুক্ত চটী অতিক্রম করিলাম। এই নদী পার হইবার একটি নূতন পুল নির্ম্মিত হইয়াছে। নদীকে দক্ষিণে রাখিয়া এইবার তীরে তীরে সমান-পথে বরাবর আসিতেছি। দুধারেই অজস্র শ্বেত-গোলাপ ও বক-ফুলের মত এক প্রকার সবুজ গাছ শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে। পূর্ব্বের মত ভয়াবহ ভীষণ জঙ্গল আর নাই! আজ দুই তিন দিন বাদে এ পথে "অস্থুস্তা" নামক একখানি গ্রাম এতক্ষণে চোখে পড়িল। গ্রামের আশে-পাশে নদীতটে বিস্তীর্ণ শস্যভূমি! দেখিতে দেখিতে বেলা সাড়ে দশটা আন্দাজ সময়ে আমরা হিমগিরির আর এক নূতন তীর্থ "বুড়া-কেদারে" আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

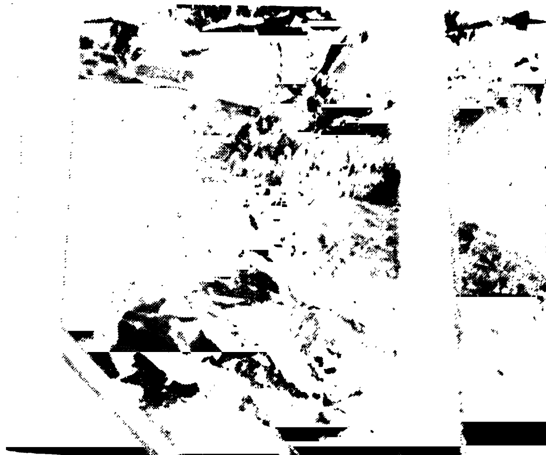
পঙ্‌রানা হইতে ইহার দূরত্ব মাত্র নয় মাইল হইবে। উত্তরাখণ্ডের তীর্থরাজিমধ্যে সাতটি কেদার-তীর্থের উল্লেখ দৃষ্ট হয়;—কেদারনাথ, মধ্যমেশ্বর, তুঙ্গনাথ, রুদ্রনাথ, কল্পেশ্বর, বিল্বকেদার ও বুড়ো-কেদার। সুতরাং এই সপ্তম কেদার যাত্রিগণের এক দর্শনীয় বিশিষ্ট তীর্থ বলিলে

* এ উৎরাই পথ বেশী না হইলেও নিতান্ত সাংঘাতিক। খাড়া নীচে নামিতে গিয়া এ পথে সাবধানতা সত্ত্বেও পড়িয়া যাইবার যথেষ্ট আশঙ্কা বিদ্যমান।

৬ষ্ঠ পর্ব্ব—

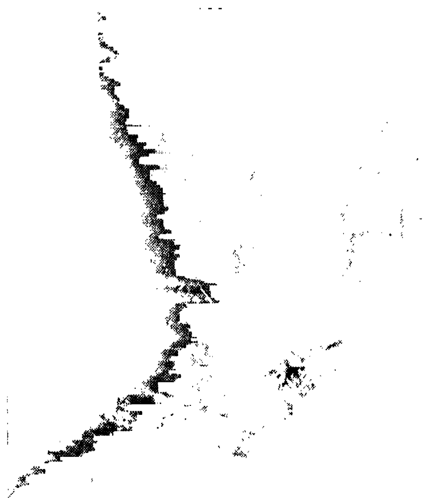


তুষারের উপত্যকা



ভৈরবঘাটির নিকটে "জাহ্নবী" নদীর দৃশ্য

৬ষ্ঠ পর্ব্ব



ভৈরবঘাটির নিকটে পাইন বন

অত্যুক্তি হয় না। গ্রামটি নিতান্ত ছোট নহে, বহু লোকের বসবাস আছে। কালী কম্‌লীওয়ালার দ্বিতল পাকা ধর্ম্মশালার একখানি ঘরে আমরা একে একে আশ্রয় লইয়া আজ আসবাবাদি যথাস্থানে 'গোছ' করিয়া রাখিলাম। কারণ, এখানে কয়েক দিন থাকিবার সিদ্ধান্ত হইয়াছিল। কেন সিদ্ধান্ত হয়, তাহারও একটু কারণ ছিল। সাধারণতঃ এখান হইতে শ্রীশ্রীকেদারনাথ মাত্র সাত আট দিনের পথ জানিয়াছিলাম। কালশুদ্ধি না থাকায় ১৬ই তারিখের পূর্ব্বে আমরা কেদারনাথ দর্শন করিব না, ইহাই আমাদের পূর্ব্ব হইতে স্থির ছিল। অথচ আজ ৩রা জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত আমরা ক্রমান্বয়ে এই বুড়া-কেদারে আসিয়া উপস্থিত হওয়ায়, কেদারনাথের মত শীতবহুল স্থানে অধিক দিন অপেক্ষা করা যুক্তিযুক্ত মনে করি নাই। আর এক কথা, এখানকার আবহাওয়া (না-শীত না-গ্রীষ্ম) আমাদের ভাল বোধ হইয়াছিল। জিনিষপত্রেরও দর এখানে অপেক্ষাকৃত সস্তা। আমাদের তিনখানি ডাণ্ডির বাহক এবং বোঝা-বাহক সমস্ত কুলীকেই ত এ তীর্থে অপেক্ষা করিবার দরুণ দণ্ড দিতে হইবে, সুতরাং অর্থের দিক্ দিয়াও এখানে অবস্থান অধিকতর শ্রেয়ঃ বোধ হইল।

গ্রামের একটু নীচে পূর্ব্বদিক্ হইতে দক্ষিণভাগে যেমন "বালগঙ্গা" নদী কলকল শব্দে বহিয়া চলিয়াছে, উত্তর দিক্ হইতে আর এক নদী "ধর্ম্মগঙ্গা" নামিয়া আসিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ইহার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। পাহাড়ের গায়ে উভয় নদীর সঙ্গমস্থল দেখিতে অতীব সুন্দর। সঙ্গমস্থলে "শৈলেশ্বর" মহাদেবের ও জাহ্নবী দেবীর মন্দির বিরাজ করিতেছে। দুই নদীরই উভয় তটে মধ্যে মধ্যে অজস্র শ্বেত গোলাপ-সংযুক্ত বৃক্ষগুলি গ্রাম হইতে অদূরে দেখিতে কুঞ্জের মত সুন্দর ও শোভাযুক্ত মনে হয়। গ্রামের মধ্যস্থলে "বুড়া-কেদারের" প্রাচীন

মন্দির। মন্দিরের সুবৃহৎ মূর্ত্তিটি ঠিক লিঙ্গমূর্ত্তি নহে ; একটি প্রস্তর-স্তুপের চতুর্দ্দিকেই সুন্দরভাবে কতকগুলি ক্ষোদিত মূর্ত্তি ; যথা—মহাদেব, শিবমূর্ত্তি, পার্ব্বতী, গণেশজী, দ্রৌপদী, নন্দিগণ ও পঞ্চপাণ্ডবমূর্ত্তি, সকলেই যেন এই প্রস্তরের চতুর্দ্দিকে এক সঙ্গে বেড়িয়া শোভা পাইতেছেন। এরূপভাবে এতগুলি দেবতা লইয়া এই বৃত্তাকার বুড়া-কেদারের দর্শন আমাদের চক্ষুতে আজ একবারেই নূতন ঠেকিল। মূর্ত্তিতে গঙ্গাজল দিয়া পূজা করিতে গেলে সেই জল এই মূর্ত্তির পাশ দিয়া নিম্নভাগে কোথায় বহিয়া যায়, বুঝিবার উপায় নাই। একটু অন্ধকারও আছে। পার্শ্বের ঘরে ব্যাঘ্রের উপরে অধিষ্ঠিতা অষ্টভুজা মূর্ত্তি এবং হরিহরমূর্ত্তি বিরাজমান রহিয়াছেন। হরিহর-মূর্ত্তিটি চতুর্ভুজ, দেখিতে আরও সুন্দর। এক দিকে চক্র ও গদা, অন্য দিকে ডমরু ও ত্রিশূল, একই মূর্ত্তিতে দুই মূর্ত্তি বড়ই মধুর মনে হয়। এ স্থানে দুই গঙ্গার নামের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হইলে পাণ্ডাগণ বলিয়া থাকে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও বাল্মীকি মুনি এককালে যখন এ স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন, তখন হইতেই উত্তরাখণ্ডে এই "ধর্ম্মগঙ্গা" ও "বালগঙ্গা" নামে যথাক্রমে প্রসিদ্ধি চলিয়া আসিতেছে। যাহা হউক, চতুর্দ্দিক্ পাহাড়বেষ্টিত এই দুই প্রশস্ত নদীর তটদেশে অবস্থিত বুড়া-কেদার স্থানটি সাধকের চক্ষুতে যে পরম রমণীয় ও সাধনসুন্দর স্থান, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

ধর্ম্মশালার পার্শ্বেই স্থানীয় স্কুল-গৃহ। স্কুলে প্রায় ৫০টি ছোট ছোট ছাত্র অধ্যয়ন করিয়া থাকে। সাধারণতঃ হিন্দী ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয়। "কেশবানন্দ" নামক জনৈক হিন্দুস্থানীয় (ইনি আলমোড়ার অধিবাসী) সে সময়ে এই স্কুলের শিক্ষক-পদে নিযুক্ত ছিলেন। বেশ নম্র ও অমায়িক তাঁহার ব্যবহার। আমরা যে কয় দিন এখানে ছিলাম,

আমাদের অভাব-অভিযোগ পূরণে তিনি কতই যত্নবান্ থাকিতেন। শুধু তিনি নহেন, তাঁহার 'পর্দ্দানশীন' পরিবারও আমাদের অলক্ষ্যে সহযাত্রিণীদের দলে মিশিয়া নানান কথাই আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইতেন। এই "মাষ্টার-গৃহিণী"র একটি কথা সে সময়ে সহযাত্রিণী-মহলের বেশ একটু উপভোগ্য হইয়াছিল। "পাহাড়ী-স্ত্রীলোকের জীবনে আদৌ সুখ নাই", "গৃহস্থালীর কার্য্য হইতেই এতটুকু বিশ্রাম পাইবার উপায় নাই" ইত্যাদি আক্ষেপোক্তি প্রতি কথায় তাঁহার মুখ দিয়া প্রকাশ পাইত। তিনি বলিতেন, "প্রত্যহ কৃষিকার্য্যের সমস্তই—যেমন ফসল বপন, কর্ত্তন, মস্তকে বোঝাই করিয়া বাটী আনয়ন, তাহাকে শস্যের আকারে পরিণতকরণ, 'ঝাড়ন-বাছন' প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই (একমাত্র লাঙ্গল দেওয়া ভিন্ন) একা স্ত্রীলোক দ্বারাই সম্পন্ন করিতে হয়। প্রভাতে ঝুড়ি লইয়া রান্নার জন্য কাষ্ঠ আহরণ—তাহাও স্ত্রীলোকদিগের দৈনন্দিন কার্য্যের মধ্যে। অধিকন্তু রন্ধন দ্বারা পুরুষদিগের আহার পর্য্যন্ত যোগাইতে হয়। সে আহারে পুরুষের আব্দারও আবার যথেষ্ট। শুধু 'রোটি' তাহাদের আদৌ রুচিকর নহে। রোটির সহিত ভাজি চাই-ই। এই ভাজির জন্য আবার শাকসব্জী খুঁজিয়া আনিতে হয়। আহার করিতে বসিয়া যে দিন এই রোটির পার্শ্বে ভাজি না দেখিয়াছেন, ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা কর্ত্তামহাশয় তৎক্ষণাৎ থালা ছুড়িয়া প্রহারে উদ্যত হইয়া থাকেন। এ বিষয়ে পুরুষদিগের সে সময়ে যথেষ্ট বীরত্ব প্রকাশ পায়।" বলা বাহুল্য, মাষ্টার-গৃহিণীর এ দুঃখ ও দরদে সহযাত্রিণীগণ মনে মনে হাস্য সম্বরণ করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন। "পুরুষেরা তবে কি উপকারে আসে" এ কথার উত্তরে মাষ্টার-গৃহিণী কেবল ইহাই প্রকাশ করিলেন, "শুধু টুপী ও কোর্ত্তা পরিয়া সারাদিন গল্পগুজবে, হাসি-তামাসায় সময় কাটানো ভিন্ন ইহাদের আর কোন কায নাই।" এ কথার সহিত তিনি

যেন পরজীবনে বাঙ্গালী-স্ত্রীলোক হইয়াই জন্মগ্রহণ করেন, ইহাই বারম্বার সে সময়ে প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন।

পুরুষদিগের আলস্য-প্রিয়তা, ক্রোধ ও 'ভাজি'র আব্দার এই একাধারে তিন গুণ-বিশিষ্ট জীবের জন্য আমার পূজনীয় বৌদিদি অগ্রজ মহাশয়কে লইয়া সে সময়ে বেশ একটু হাসি-তামাসা জানাইলেন, পাল্টা জবাবে অগ্রজ মহাশয় ইহাই বলিলেন, "পাহাড়ী-স্ত্রীলোক যাহারা এতটা গৃহস্থালীর কায জানে, তাহারা সকলেই যদি বাঙ্গালী-ঘরের গৃহিণী হইতে চাহে, তবে বৌদিদিদের মত স্ত্রীলোকদের কি গতি হইতে পারে," এ বিষয় একবার ভাবিয়া দেখিবার উপদেশ দিতে তিনি বিস্মৃত হইলেন না।

এখানে সপ্তাহে এক দিন করিয়া ডাক লইয়া যাইবার ব্যবস্থা আছে। সে ডাক "টিহিরী" হইয়া যায়। দোকান-পসারও যথেষ্ট, সুতরাং সব জিনিষই অপেক্ষাকৃত সুলভ। কেবল বাঙ্গালী-যাত্রিগণ এখানে দুইটা অস্বস্তি বিলক্ষণভাবে অনুভব করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ জলকষ্ট—জলের জন্য ধর্ম্মশালা বা গ্রাম হইতে অনেকটা নীচে নদীতটে নামিয়া যাইতে হয়। অশেপাশে কোন ঝরণাই নিকটে নাই। দ্বিতীয়তঃ—অসম্ভব মাছির উৎপাত। এ উপদ্রবের আদৌ নিস্তার নাই। আহার্য্য দ্রব্যের সম্মুখে বসিয়া আপনি দুগ্ধ, গুড়, চিনি ত দূরের কথা, চাউল, আটা, তরকারী প্রভৃতি যে দ্রব্যই আলগা রাখুন না কেন, এত অতিরিক্ত মাছি তাহাতে ভরিয়া যাইবে যে, ইহাদের কালো রূপে জিনিষগুলির সর্ব্বাঙ্গ একেবারে ঢাকিয়া যায়। আহার-কালে পাখার বাতাস ভিন্ন আপনাকে বিরক্ত হইয়াই উঠিয়া আসিতে হইবে। জল পর্য্যন্ত আলগা রাখা চলে না! আমরা এ স্থানে তিন দিন অতিরিক্ত বিশ্রামের দরুণ কুলীদিগকে প্রায় বার তেরো টাকা দণ্ডস্বরূপ দিলাম। শেষ পর্য্যন্ত সকলেই "চাঙ্গা"র পরিবর্ত্তে কেবল এই লক্ষ লক্ষ মাছির উৎপাতেই আহার্য্য দ্রব্যে বিলক্ষণ

অরুচি লইয়াই ধীরে ধীরে আগের পথে রওনা হইলাম। ৭ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার আহারান্তে বেলা বারোটা আন্দাজ সময়ে আমরা বুড়া-কেদার পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। গ্রামের বাহিরে বাল-গঙ্গার পুল পার হইয়া প্রথমেই দারুণ রৌদ্রে ১ মাইল চড়াই উঠিতে হইল। একে দ্বিপ্রহর, তায় কম শীতের দেশে চড়াই-পথ অতিক্রম করা এত অধিক ক্লেশকর হইবে, পূর্ব্বে আমরা কেহই ভাবি নাই। যেমন তৃষ্ণা, তেমনই কি এ পথে জলকষ্ট! বেলা ১৷৷০ আন্দাজ সময়ে আমরা তিন মাইল দূরে ভিটি গ্রাম অতিক্রম করিলাম। আরও ১ মাইল আগে আসিয়া "কুলু" চটী। তার পর সেখান হইতে এক মাইল অর্থাৎ ৫ মাইল সর্ব্বসমেত চলিয়া আসিয়া "মালবা" চটীতে সেদিনের মত বিশ্রাম লইতে বাধ্য হইলাম। শেষের দিকে রাস্তার পাশে পাশে কেবলই গোলাপের জঙ্গল ও অন্যান্য পাহাড়ী-বৃক্ষে ভরা ছিল।

মালবার ছপ্পর-ঘরে রাত্রি কাটাইয়া পরদিন প্রত্যূষে আবার চড়াই পথ উঠিতে থাকিলাম। দেড় মাইল বাদে "জঙ্গল" চটী, তার পর পাহাড়ের দ্বিতীয় স্তরে উঠিয়া আর এক চটী (নাম হাটকুলী বা ভৈরব চটী) দৃষ্ট হইল। জঙ্গলের মাঝে এখানে শ্যাম-শস্য-শোভিত কিছু দূর বিস্তৃত ময়দান ও তদুপরি অগণিত হলুদে রংএর ছোট ছোট এক প্রকার ফুল (চন্দ্রমল্লিকার মত) লক্ষ লক্ষ তারকার মত দেখিতে কেমন সুন্দর! ময়দানের মধ্যস্থলে ভৈরবজীর মন্দির বিরাজ করিতেছে। এখান হইতে উত্তরভাগের শ্বেত-শুভ্র তুষারাদ্রিগুলি চোখের সম্মুখে নিয়তই উজ্জ্বল দেখায়। ভৈরব চটী হইতে অর্দ্ধ-মাইল আন্দাজ আগে আসিয়া উৎরাই পথে গভীর জঙ্গলের মধ্যে নামিতে হইল। দিনের বেলায় সে পথ এত অন্ধকার, নির্জ্জন ও নিস্তব্ধ যে, গাছ হইতে প্রতি পাতার মর্ম্মর শব্দে মনে হইতেছিল, যেন কোন হিংস্র জন্তু পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছে। ভীতি-বিহ্বলচিত্তে

নিঃশব্দে সকলেই সে স্থান পার হইয়াছি। কাণের মাঝে সেই ঝিঁঝিঁ পোকার একটানা সুর ও মধ্যে মধ্যে দু'একটি পাহাড়ী-পাখীর কর্কশ ধ্বনি ভিন্ন এ জঙ্গলে শুনিবার কিছু ছিল না। বেলা সাড়ে আট-টার সময় আমরা এ পথে "ভোঁট" চটী উপস্থিত হইলাম। এখানে দুই তিনখানি দোকান ও তৎসহ লম্বা লম্বা 'চটাই' বিস্তৃত ছপ্পর-ঘরের একটিতে সে দিন বিশ্রাম লওয়া হইল। নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে যাহাতে কেদারনাথ না পৌঁছাই, সে জন্যই এরূপ ভাবে অল্পদূর গিয়াই আজ ক্ষান্ত হইলাম।

৯ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার প্রত্যূষে "ভোঁট" চটী পশ্চাতে রাখিয়া প্রায় পাঁচ মাইল দূরে "পেরেটি" নামক স্থানে পৌঁছিলাম। এখানে খাড়া পাহাড়ের গা বাহিয়া প্রায় দুই ফার্লং উৎরাই-রাস্তা অত্যন্ত সাংঘাতিক দেখিলাম। রাস্তার পরিসর সেখানে এক হাতের বেশী নহে। বলা বাহুল্য, সকলকেই খুব সন্তর্পণে নামিয়া আসিতে হইল। পেরেটি হইতে দুই মাইল আগে যাইতে পারিলেই "গুত্তু" চটীতে অন্ত বিশ্রামের কথা, তাই যত শীঘ্র সম্ভব এখান হইতে অর্দ্ধমাইল আন্দাজ দূরে পূর্ব্বাভিমুখে পথ ধরিয়া অগ্রসর হইলাম। দক্ষিণভাগে এতক্ষণে "ভৃগু" নদী দেখা গেল। ইহারই তীরে তীরে দুই মাইল পথ চলিয়া আসিয়া বেলা ৮টা আন্দাজ সময়ে "গুত্তু" আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে কালী কম্‌লীওয়ালার একখানি ঘর ও তৎসংলগ্ন বারান্দা ধর্ম্মশালারূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয়, তাহা তখন "সদাব্রতের" জিনিষপত্রাদিতেই পরিপূর্ণ থাকায়, আমরা এক দোকানীর ছপ্পরযুক্ত চটীতে আশ্রয় লইলাম। এখনও পর্য্যন্ত এ সকল স্থান বুড়া-কেদারের মতই উষ্ণপ্রধান, সুতরাং ৮টা বাজিতে না বাজিতে কঠিন রৌদ্রে সকলকেই বিলক্ষণ পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িতে হয়। প্রাকৃতিক দৃশ্য হিসাবে এ স্থানটি অধিকতর রমণীয় দেখিয়া আমরা

এখানেই রাত্রিবাসের সঙ্কল্প করিলাম। ধর্ম্মশালার নিম্নেই ভৃগু নদী কলকল শব্দে ছুটিয়া চলিয়াছে। সে তর্জ্জন-গর্জ্জন এতই গুরুগম্ভীর যে, দুই দিকের বিরাটকায় পাহাড়কে যেন প্রতি ক্ষণেই স্তম্ভিত করিয়া দিতেছে। এ স্থানে নদীর উপরে একটি পুল আছে। পুলের উপর দাঁড়াইয়া দুই দিকের পাহাড়ের মাঝে এই বিপুল বেগে প্রবাহিতা নদীর গতি দেখিতে পারিলে সত্যই আত্মহারা হইতে হয়। দূরে উত্তর কোণের এক স্থানে উজ্জ্বল রজতশৃঙ্গ শোভা পাইতেছিল। শুনিলাম, এই শৃঙ্গের পার্শ্ব দিয়া পঁওয়ালীর ভীষণ তুষার-পথে এইবার অগ্রসর হইতে হইবে।

ডাণ্ডিওয়ালা, বোঝাওয়ালা সকলেই এই পঁওয়ালীর নামে যেন ভীত-ত্রস্ত হইয়া উঠে। সে রাস্তা না কি এতই ভীষণ ও কঠিন! শুনিলাম, এই রাস্তায় সবে মাত্র ৫।৬ দিন হইল যাত্রি-চলাচল আরম্ভ হইয়াছে। এখান হইতে পঁওয়ালীর দূরত্ব প্রায় সাড়ে বারো মাইল হইবে। এ পথের আগা-গোড়াই কেবল ক্রমিক চড়াই, সুতরাং এইবার যে সকলেরই প্রাণান্ত পরিশ্রম আছে, তাহা ফতে-সিং, ভগবান্ সিং প্রভৃতি সকলেই একবাক্যে জানাইয়া দিল।

যাত্রিগণ এখানে ভৃগু নদীতে স্নান ও মন্দিরে রাম-লক্ষ্মণ-সীতার পূজা করিয়া থাকেন। মূর্ত্তিগুলি সুন্দর। এই মন্দিরের পার্শ্বে আর একটি জরাজীর্ণ ভগ্নপ্রায় শিবমন্দির এ স্থানের প্রাচীনত্ব সূচিত করিতেছে। ও-স্থানের লোকপরম্পরায় অবগত হইলাম, পঁওয়ালীর রাস্তা খুলিবার পূর্ব্বে যাঁহারা কেদারনাথ গিয়াছেন, তাঁহারা "কন্যাস্" পাহাড়ের "দাঁড়া" ধরিয়া ভীষণ জঙ্গলের মধ্যে* বিশ মাইল ঘুরিয়া "ভীরী"র পথে 'গুপ্তকাশী'

* এ পথে "দাঙ্গী খোড়" ও "গেঁঠনা বধানি" গ্রাম পড়ে। কোথায়ও পাকডাণ্ডি, কোথায়ও বা নালা ধরিয়া (পথ নাই) যাত্রিগণকে যাইতে হইয়াছে, সুতরাং যাত্রীদের দুর্দ্দশার সীমা ছিল না।

গিয়াছেন। সেখান হইতে কেদারনাথ প্রায় ২৪॥০ মাইল উল্টা পথে আসিতে হয়। যাহা হউক, এক রাত্রি বিশ্রাম করিয়া পরদিন প্রত্যূষেই আমরা পঁওয়ালী উদ্দেশে আগে বহির্গত হইলাম। প্রথমে এক মাইল আন্দাজ চড়াইপথে "গাঁওয়ানা", সেখান হইতে আবার চড়াই উঠিয়া আড়াই মাইল বাদে "পৌ" চটী প্রাপ্ত হইলাম। এই আড়াই মাইল চড়াই পথে কেবলই সরু 'পাকডাণ্ডী' ভিন্ন রাস্তা বলিতে কিছুই ছিল না। তার পর তৃতীয় বার আড়াই মাইল চড়াই ভাঙ্গিয়া পরিশ্রান্ত-চিত্তে সকলেই বেলা সাড়ে নয়টা আন্দাজ সময়ে গাঁওয়ান কী মাড়ায় উপস্থিত হইয়া এখানকার লম্বা ছপ্পরযুক্ত ভীষণ সেঁতসেঁতে ঘরেই আশ্রয় লওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করিলাম। এত উচ্চ পাহাড়ের উপরেও মাটীর মেঝে এত দূর ভিজা! লম্বা লম্বা চটাই বিস্তৃত থাকিলেও তদুপরি কম্বল বিছাইলে, কম্বল পর্য্যন্ত যেন "কন্‌কনে" ঠাণ্ডা মনে হইল। ক্রমশঃই আবার আমরা যেন ভীষণ শীতের দেশে উপনীত হইতেছি। এখানে জলকষ্টও যথেষ্ট। চটী হইতে প্রায় ৩ ফার্লং দূরে পাহাড়ের গা দিয়া একস্থানে একটি ক্ষীণধারা ঝির-ঝির শব্দে নামিয়া গিয়াছে, সেখান হইতে জল আনাইয়া যাত্রিগণ নিজেদের তৃষ্ণা দূর করিয়া থাকেন। চটীতে মোটামুটি আহার্য্য দ্রব্য পাওয়া গেল, কেবল আলুর অভাবে তরকারি জুটিল না। বৈকালের দিকে ঘন মেঘে আকাশ বিলক্ষণ ছাইয়া ফেলিল, এবং দেখিতে দেখিতে গর্জ্জন ও বর্ষণ সহ আবার অজস্র করকায় পাহাড়ের চতুর্দ্দিক্ এক অপরূপ শ্রী ধারণ করিল। পটপরিবর্ত্তনের ন্যায় এখানকার দৃশ্য যেন অকস্মাৎ নূতন ও ভয়ঙ্কররূপে আমাদের চোখের সম্মুখে কি এক ভীষণ আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে সকলকেই অভিভূত করিয়া দিল।

যমুনোত্তরী হইতে গঙ্গোত্তরী যাত্রাপথের বিবরণ

স্থান	দূরত্ব	চটীর নাম	পৌঁছিবার তারিখ	বিশেষত্ব
যমুনোত্তরী	৪ মাইল	মার্কণ্ডেয় ঋষি	১৬ই বৈশাখ ১৩৪০	
মার্কণ্ডেয় আশ্রম	১০ "	ওজিরি	১৭ই " "	
ওজিরি	৯ "	গঙ্গানি	১৮ই " "	পাকা ধর্ম্মশালা আছে।
গঙ্গানি	১।০ "	সিমল্	১৯শে " "	ছপ্পর ঘর, তবে চতুর্দ্দিকেই আচ্ছাদন আছে।
সিমল্	৪ "	জঙ্গল	" " "	ছপ্পর ঘর মাত্র।
জঙ্গল	৫ "	সিঙ্ঠা	" " "	ভীষণ উৎরাই পথ পড়ে।
সিঙ্ঠা	৩।০ "	নাকুরী	" " "	
নাকুরী	৬।০ "	উত্তর-কাশী	২০শে " "	সুবৃহৎ ধর্ম্মশালাযুক্ত অতি সুন্দর রমণীয় স্থান।
উত্তর-কাশী	৩ "	নাগানি	২২শে " "	
নাগানি	৩ "	নিতালা	" " "	
নিতালা	৩ "	মনেরী	" " "	দুইটি ধর্ম্মশালা বিদ্যমান।
মনেরি	৪ "	কুমাল্‌টি	" " "	
কুমাল্‌টি	৫ "	ভাটোয়ারী	২৩শে " "	টিহিরীরাজ-তরফ হইতে এখানে যাত্রীদিগের মাল প্রভৃতি ওজন করিয়া মাশুল লওয়া হয়। পাকা ধর্ম্মশালা আছে।
ভাটোয়ারী	৬ "	সতীনারায়ণ চটী	২৪শে " "	
সতীনারায়ণ চটী	৩ "	গাঙ্গনানি	" " "	ধর্ম্মশালা দ্বিতল ও প্রশস্ত।

স্থান	দূরত্ব	চটীর নাম	পৌঁছিবার তারিখ	বিশেষত্ব
গাঙ্গনানি	৫ মাইল	লোহরীনাগ	২৫শে বৈশাখ ১৩৪০	
লোহরীনাগ	৪ „	সুখী	„ „ „	চড়াইএর উপরে ধর্ম্মশালা।
সুখী	৩ „	ঝালা	২৬শে „ „	
ঝালা	৩ „	হরশিলা	„ „ „	গঙ্গাতটে লক্ষ্মীনারায়ণজীর মন্দির ও পাকা ধর্ম্মশালা আছে।
হরশিলা	৩ „	ধরালী	২৬শে „ „	প্রশস্ত ধর্ম্মশালা বিদ্যমান।
ধরালী	৪ „	জাংলা	২৭শে „ „	
জাংলা	২ „	ভৈরবঘাটি	২৮শে „ „	চড়াই সাংঘাতিক ও চটীতে জলকষ্ট।
ভৈরবঘাটি	৬ „	গঙ্গোত্তরী	„ „ „	এখানে নয়টি ধর্ম্মশালা আছে।

সর্ব্বসমেত—১০০৷৹ মাইল মাত্র।

মসৌরী হইতে যমুনোত্তরী যাত্রা-পথের বিবরণ

স্থান	দূরত্ব	চটীর নাম	পৌঁছিবার তারিখ	বিশেষত্ব
মসৌরী	৬ মাইল	ঝাল্‌কী	৫ই বৈশাখ ১৩৪০	এখানে অসম্ভব জলকষ্ট আছে।
ঝাল্‌কী	২৷৹ „	কোটলী	„ „ „	এখানে পাকা ধর্ম্মশালা, তবে জলকষ্ট কম নহে।
কোটলী	৬৷৹ „	ধনোটি	৬ই „ „	মৃত্তিকা-নির্ম্মিত দ্বিতল ধর্ম্মশালা ও ডাকবাংলো আছে।
ধনোটি	৮ „	কাণাতাল	„ „ „	
কাণাতাল	১৷৹ „	বলডানাকাঠাং	৭ই „ „	এখান হইতে টিহিরীর পথ ছাড়িয়া টিংরাই পথে নামিতেছে।

স্থান	দূরত্ব	চটীর নাম	পৌছিবার তারিখ	বিশেষত্ব
বলডানাকাঠাং	৮।০ মাইল	বলডানা	৭ই বৈশাখ ১৩৪০	
বলডানা	২ "	শাঁগুগ্রাম	৮ই " "	
শাঁগুগ্রাম	২ "	বন্দরকোটি	" " "	
বন্দরকোটি	১ "	ছাম	" " "	সুন্দর দ্বিতল ধর্ম্মশালা।
ছাম	৪ "	থরোট	" " "	
থরোট	১ "	নগুনা	" " "	দ্বিতল ধর্ম্মশালা।
নগুনা	৫ "	ধরাসু	৯ই " "	সুন্দর ধর্ম্মশালা। নীচের পথ গঙ্গোত্রী গিয়াছে।
ধরাসু	৪ "	কল্যাণী	১০ই " "	
কল্যাণী	৪ "	কুম্‌রাণা	" " "	একখানি ঘর মাত্র, অর্দ্ধেকাংশে দোকান।
কুম্‌রাণা	৫ "	সিল্‌কারা	১১ই " "	
সিল্‌কারা	৮ "	ডস্তাল গাঁও	" " "	ভীষণ চড়াই ও উৎরাই।
ডস্তাল গাঁও	২।০ "	সিমল্	১২ই " "	যমুনোত্তরীফেরত যাত্রী এখান হইতে গঙ্গোত্তরীর পথ ধরিয়া থাকেন।
সিমল্	১।০ "	গঙ্গানি	" " "	পাকা ধর্ম্মশালা আছে।
গঙ্গানি	২ "	থরাদ	" " "	
থরাদ	৩ "	কুত্‌নৌর বা জগন্নাথ	" "	ছপ্পর ঘর।
জগন্নাথ	১।০ "	যমুনা চটী	" " "	ছপ্পর ঘর।
যমুনা	১২।০ "	মার্কণ্ডেয় ঋষি	১৩ই ও ১৪ই "	পাকা ধর্ম্মশালা আছে।
মার্কণ্ডেয় ঋষি	৪ "	যমুনোত্তরী	১৫ই "	পাকা দ্বিতল ধর্ম্মশালাযুক্ত স্থান।

সর্ব্বসমেত—৯৬ মাইল মাত্র।

দারুণ দুর্যোগে জঙ্গলাকীর্ণ নির্জ্জন পাহাড়ের উপরে এই বৃক্ষলতা-গুল্মাচ্ছাদিত শতচ্ছিদ্রময় আচ্ছাদন-নিম্নে বসিয়া বসিয়া সকলের রাত্রি-জাগরণ—তীর্থযাত্রা-পথে সে-ও এক আমাদের বিশেষভাবে স্মরণীয় দিন। জীমূতের ঘন-গর্জ্জন, বিদ্যুতের তীব্র চাহনি, অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত ও অজস্র শিলাবর্ষণের চট্-পট্ শব্দ—একাধারে বহির্জগতের এই সমস্ত বিপ্লবই যেন একত্র হইয়া সে রাত্রিতে আমাদিগকে গ্রাস করিতেই উদ্যত হইয়াছিল। বৃষ্টির জলে বিছানাপত্র আসবাবাদি বিলক্ষণ ভিজিয়া গেল। চটীর মধ্যে এমন কোন স্থান শুষ্ক পাইলাম না, যেখানে এই পাঁচ ছয় জন যাত্রীর এক রাত্রি বিশ্রাম করা চলে। কোন প্রকারে মাথা বাঁচাইয়া সকলেই নিঃশব্দে বসিয়া রহিলাম। ভোরের দিকে আকাশ পরিষ্কার হইল। আজিকার দিনে অতিরিক্ত শীতে আমাদের বৃদ্ধা দিদি নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়েন। "সুরো" চাকরের অবস্থাও তদপেক্ষা শোচনীয়। পদব্রজে আসিয়া তাহার উরুদেশে "কুচকির" মত হইয়াছে। অগত্যা এইখানে আমরা ইহাদের উভয়েরই জন্য দুই জন কাণ্ডিবাহক স্থির করিয়া লইলাম। প্রত্যেকের মজুরী স্থির হইল—প্রতিদিন এক টাকা চারি আনা। এইভাবে আমরা ব্যবস্থা করিয়া প্রত্যূষেই কুলীর পৃষ্ঠে বোঝা চাপাইয়া সকলেই এখান হইতে আগে রওনা হইলাম। আজিকার চড়াই-পথের দৃশ্যগুলি যেন একেবারেই নূতন! সারারাত্রির বর্ষিত অজস্র করকারাশি উজ্জ্বল মুক্তার মতই চারিদিকে শোভা পাইতেছিল। যতই উপরে উঠিতে লাগিলাম, দেখিলাম, পুঞ্জীভূত তুষাররাশি যেন জমিয়া জমিয়া সমগ্র পাহাড় ছাইয়া ফেলিয়াছে! এ দৃশ্য ত আর কখনও দেখি নাই! তবে কি আমরা মাটীর ধরা পশ্চাতে রাখিলাম? এইরূপ নব নব দৃশ্যের বৈচিত্র্যের মাঝখানেই ত তীর্থপথের যাত্রীরা সহজেই আকৃষ্ট হইয়া যাত্রার অসীম

ক্লেশ উপেক্ষা করিয়া থাকে। এক স্থানে জনৈক পাহাড়ী মেষপালক উপর হইতে এই তুষাররাশির মধ্য দিয়া অগণিত মেষের দল তাড়াইয়া আনিতেছিল। মেষগুলির গায়ে কালো লোমের উপরে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তুষার-কণা ঝক্ ঝক্ করিতেছে। এইরূপে তিন মাইল পথ ঠেলিয়া আমরা "দোফন্দ" চটীর সম্মুখে আসিলাম। চটীর আশপাশ চতুর্দ্দিকেই কেবল তুষারের উজ্জ্বল বিস্তৃতি ভিন্ন দেখিবার কিছুই ছিল না। ডাণ্ডিওয়ালা ফতে সিং প্রমাদ গণিয়া জানাইল, "পঁওয়ালীর রাস্তা গত রাত্রির দুর্য্যোগে একবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে।" অগত্যা সওয়ার নামাইয়া তাঁহাদের হাত ধরিয়া এখানে পদব্রজে যাওয়া ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। পায়ের তলায় যেন নিরন্তর লবণেরই পাহাড়! ঠেলিয়া চলিতে সকলেই বিশেষ বেগ পাইতে লাগিলেন। বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে যতই এই তুষার-সৌন্দর্য্যের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, আমরা ততই যেন আপনা-দিগকে অধিকতর বিপদের সম্মুখীন মনে করিতে লাগিলাম। চতুর্দ্দিকেই শ্বেতশুভ্র তুষারকিরীট। উজ্জ্বল পাহাড়ের মাঝখানে এক স্থানে কতক নিম্নভূমিতে (উপত্যকার মত) কিছু কিছু শ্যাম-শষ্প তুষারে মিশিয়া কেমন নবরূপ ধারণ করিয়াছে। মধ্যে মধ্যে কদাচিৎ দু একটি দেবদারু বৃক্ষ এই স্থানে শ্বেতবর্ণের মাঝখানে কালবর্ণের অস্তিত্ব জাগাইয়া রাখিয়াছে মাত্র। প্রকৃতির রাজ্যে এ কি এ বিরাট তুষারের সৃষ্টি! কালো পাহাড় ক্রমশঃই যেন ছায়াবাজীর মত অকস্মাৎ এক দিনে সাদা হইয়া গিয়াছে। উপত্যকার আশপাশ নিম্নদিকে যতদূর চক্ষু যায়, পাহাড়ের সর্ব্ব অবয়ব ঠিক যেন একখানি 'ধোপা ধুতি'—শুভ্র বস্ত্রে একেবারেই ঢাকা। এক দিকে তুষারের এই উঁচু-নীচু চমৎকার দৃশ্য, অন্যদিকে পূর্ব্বদিক্ বেড়িয়া উত্তরভাগ পর্য্যন্ত, অভ্রভেদী তুষার-শৃঙ্গের দিকে চক্ষু ফিরাইলে স্বর্গের সম্পদ্-সুষমাই যেন জাগ্রত-বিকাশে প্রত্যেককেই মুগ্ধ

করিয়া দিতেছে! উজ্জ্বল দৃশ্যে চারিদিক্ বেড়িয়া যে এত দূর মনোহারিতা সুস্পষ্ট হইতে পারে, তাহাই আজ আমরা যেন প্রথম প্রত্যক্ষ করিলাম। স্বপ্ন ও জাগ্রত সাধনার একত্র সমাবেশ! প্রকৃতির আপাত-মনোহর উজ্জ্বলতার মাঝখানে আমাদের অপলক উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি সত্যই আজ আপনাকে হারাইয়া বসিল! পথ বা মনুষ্যের পদচিহ্ন ধরিয়া যে আগে যাইব, তাহাও শেষ তুষারের অমল-ধবল বিস্তৃতির মধ্যে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে! দোফন্দ চটী হইতে আরও তিন মাইল পথ এইরূপ তুষারসমুদ্র মন্থন করিতে করিতে বেলা দশটা আন্দাজ সময়ে 'পঁওয়ালী' পৌঁছিলাম।

এখানে লম্বা লম্বা ছপ্পরযুক্ত ঘর. ঘরগুলি আবার দ্বিতল। সর্ব্বসমেত ৬।৭ খানি হইবে। ছোট ছোট সরু দরজার মধ্য দিয়া একটি ঘরে আজ আমরা আশ্রয় লইলাম। ঘরের মধ্যে মেঝেতে তক্তা বিছাইয়া তাহার উপরে খড় দিয়া ঢাকিয়া রাখা হইয়াছে। তাহার উপর আবার লম্বা লম্বা চটাই বিস্তৃত ছিল। আজ সমস্ত দিন বরফের দৃশ্যে পথিপ্রদর্শক ভগবান্ সিংএর আনন্দটা যেন অতিরিক্ত! পঁওয়ালী পৌঁছিয়াই সে গান ধরিয়াছে,

"সাধু চলে নঙ্গা ধড়াঙ্গা চিম্‌টা বজায়কে,
শেঠ চলে হাথী ঘোড়া পাল্কী মঙ্গায়কে,
বদরী-নারান্‌কে বাস্তে মে নহী করনা রোষ গোমান্,
আগে চলে বুড্‌ঢা আদ্‌মী পাছে চলে জোয়ান্॥"

বাহিরের এই গানের সহিত মনে মনে আজ তাহার একটু দুঃখও বোধ হয় জন্মিয়াছিল। কারণ, ঝুলি সমেত সে আজ বরফের মধ্যে দুইবার আছাড় খায়;—যাহার ফলে সেই ঝুলির মধ্যগত গঙ্গোত্রীর জলভরা বোতলটি অকস্মাৎ ভাঙ্গিয়া একবারে চূরমার হইয়া গিয়াছে! এখানে প্রতি টাকায় চিনি মাত্র এক সের, লাল চাউল দুই সের, আটা তিন সের,

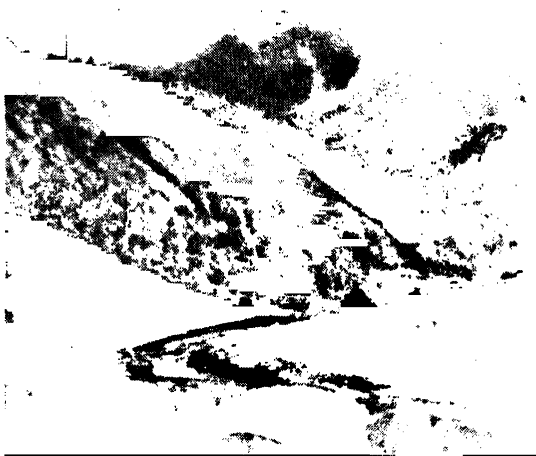
ঘৃত ৮ ছটাক মাত্র! তরকারীর মধ্যে কিছুই নাই। আজ তিন দিন আলু মিলিতেছে না, বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা কম দুঃখের কথা নহে। সঙ্গে আনীত পোস্ত বা বেসন-সংযোগে বড়ীভাজা বা বড়ার ঝোলই একমাত্র অবলম্বন। ইতিপূর্ব্বে কোন কোন স্থানে "আলুশাক" "গিমেশাক" বা "বেথিয়া শাক" পাইয়া ধন্য মনে করিয়াছিলাম। "আমসত্ব," "কুলটোপা" "নেবুর আচার" প্রভৃতি সঙ্গে ছিল, তাহাই এ যাবৎ রুচি-পরিবর্ত্তনের সুযোগ দিতেছে।

চটীতে পৌঁছিয়াই এ স্থানে কঠিন শীত অনুভব হইল। আহারান্তে এখানে আবার আকাশে ঘন মেঘের সঞ্চার ও বর্ষণ সুরু হইয়াছিল। সুখের বিষয়, পূর্ব্ব তিন দিনের মত এখানে অসম্ভব মাছির উপদ্রব না থাকায় শত দুঃখের মাঝখানেও আমরা যেন স্বস্তি অনুভব করিয়াছিলাম। এখানে কালী কমলীওয়ালার একটি ধর্ম্মশালা ও সেখানে "সদাব্রতের" ব্যবস্থা আছে দেখিলাম।

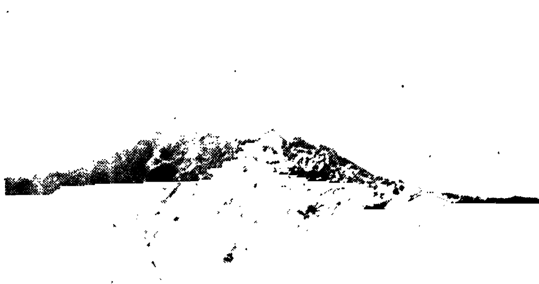
সারারাত্রি বিশ্রামের পরে পরদিন প্রত্যূষে আবার যাত্রার পালা সুরু হইল। অদ্য ৯ মাইল দূরে "মন্জু" পৌঁছিতে পারিলেই পঁওয়ালীর কঠিন চড়াই ও তুষার-বিস্তৃত বিপজ্জনক পথের একবারেই অবসান হয়। এই দুর্গম পথটুকু না জানি কেমন! সকলেই দ্বিগুণ উৎসাহে উপরে উঠিতে লাগিলাম। প্রথমে কিছুক্ষণ লতা-পাদপ-পরিপূর্ণ সাধারণ পার্ব্বত্য চড়াই-পথ অতিক্রম করিয়া, ক্রমশঃই উপত্যকা * মধ্যে আবার আসিয়া পড়িলাম। উপত্যকাগুলির স্থানে স্থানে শুষ্ক শুষ্ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘাসগুচ্ছের শ্রেণী এবং কোথাও বা "সিনেরিয়া" ফুলের মত গুচ্ছ গুচ্ছ পীতবর্ণের

* চতুর্দ্দিকেই গগনস্পর্শী পর্ব্বতমালার মধ্যস্থলে অপেক্ষাকৃত নিম্ন পাহাড়কে উপত্যকা বলা হইয়াছে।

পুষ্প পাহাড়টি আলোকিত করিয়াছে। কোথাও পাহাড়ের একটা দিক্ উজ্জ্বল শ্বেতাভ—চাদরের মত বরাবর নিম্নতলভূমি পর্য্যন্ত কেমন বিস্তৃত দেখা যাইতেছে! উপত্যকার শৃঙ্গদেশ ধরিয়া কখনও চড়াইপথে কতক উপরে উঠিয়া, আবার নীচে নামিতে বাধ্য হইলাম। সে সব স্থানের পথগুলি কোথায়ও দেড়হাত মাত্র পরিসর, হয় ত কখনও বা এই সংকীর্ণ-তম পথের উপরে কিছু দূর পর্য্যন্ত লম্বা তুষার জমিয়া থাকায়, পিচ্ছিলতা নিবন্ধন আগে অগ্রসর হইতে বিলক্ষণ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইল। সুখের বিষয়, দারুণ রৌদ্রে আজ অনেক স্থানের বরফ গলিয়া গিয়াছিল। কেবল পূর্ব্বদিক্ বেড়িয়া উত্তরভাগ বিস্তৃত গগনস্পর্শী—বিরাটকায় পাহাড়গুলি একবারেই তুষারমণ্ডিত থাকায়, রৌদ্রকিরণে সর্ব্বদাই যেন চোখের সম্মুখে হীরকের মত ঝলমল করিতেছে! সে দৃশ্যের উজ্জ্বলতা কতই সুন্দর! রজত-মন্দিরের পর পর উচ্চতম শৃঙ্গগুলি আকাশে ঠেকিয়া আলোছায়ার সংমিশ্রণে কি অপূর্ব্ব মাধুরীই না ফুটাইয়া তুলিয়াছে! এইরূপ অপরূপ বিচিত্র দৃশ্যের মধ্য দিয়া প্রায় সাড়ে তিন মাইল পথ চলিয়া আসিয়া উৎরাই পথে নামিতে সুরু করিলাম এবং অর্দ্ধমাইল আন্দাজ বরফ-পরিপূর্ণ উপত্যকার মধ্যে নামিয়া আসিয়া একটি চটী (নাম শুনিলাম "তালি" চটী) দেখিতে পাইলাম। চটীতে একটিমাত্র লোক গরম "পুরী" লইয়া বসিয়া আছে। এত দিন পরে এই বরফ-প্রদেশে গরম পুরীর আবির্ভাব দেখিয়া সুরো চাকরের আনন্দের সীমা ছিল না, দুঃখের বিষয়, তরকারী নাই। তথাপি এ অঞ্চলে এই নূতন বস্তু এই প্রথম দেখিয়া, তাহার জন্য এক পোয়া খরিদ করা হইল। চটীওয়ালা ৵১০ দাম চাহিয়াছিল। আহারান্তে জল পাইল না, কাযেই পাহাড়ের স্তূপীকৃত তুষার খুঁড়িয়া তাহার দ্বারাই তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া লইল। তখন বেলা ৯টা আন্দাজ হইবে। আমরা সরবতের জন্য চিনি



ভৃগু নদী কল কল শব্দে ছুটিয়া চলিয়াছে



এক স্থানে পাহাড়ের গা বাহিয়া বরফ গলিয়া পড়িতেছে

৬ষ্ঠ পর্ব—



দোকন্দ চটীর পথে এক স্থান



পাইন ও চীর বৃক্ষ

আছে কি না, জিজ্ঞাসা করিয়া হতাশ হইলাম। শুনিলাম, এই তালী চটীতে যাত্রীদের তৃষ্ণা দূর করিবার জন্য মাসিক ১৪৲ টাকা মাহিনা স্বীকারে, কালী কমলীওয়ালার তরফ হইতে এই লোক * নিযুক্ত আছে, অথচ জল বা সরবতের কোন ব্যবস্থাই তখন ছিল না! আগাগোড়া এ পথের সর্ব্বত্রই যখন বরফ জমিয়া রহিয়াছে, তখন জলের জন্য কালী কমলীওয়ালার এই লোকনিয়োগ অনর্থক অপব্যয় বলিয়াই সকলের ধারণা জন্মিল। এই উপত্যকা হইতে গন্তব্য স্থান "মঙ্গু" পৌঁছিতে প্রায় পাঁচ মাইল পথ এখনও বাকী ছিল, সুতরাং সকলেই দ্রুতগতি সে স্থান পরিত্যাগ করিলাম।

তালি চটী হইতে আগেকার রাস্তা যে ভীষণ হইতে ভীষণতম হইয়া উঠিবে, এ ধারণা কাহারও মনে হয় নাই! কিছুক্ষণ উপত্যকার পাশে পাশে অগ্রসর হইতেই আবার সেই বিরাট ফেনায়িত তুষারপুঞ্জ সম্মুখে পড়িল। যে দিকে চাই, পাহাড়ের বিরাট কলেবর শুধুই উজ্জ্বল রজতা-ভরণ ভিন্ন কোন স্থানে এতটুকু কালো চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না! ডাণ্ডি, কাণ্ডি সমস্তই সওয়ার নামাইয়া খালি চলিল। দীর্ঘ-পথব্যাপী বরফের বহর দেখিয়া এবারে জ্ঞাতি-পত্নীর উৎসাহ-দীপ্ত মুখখানি একেবারেই শুকাইয়া গেল! তিনি ভাবিয়াছিলেন, যাহা কিছু তুষারের পথ ইতিপূর্ব্বে অতিক্রম করা হইয়াছে, তালি চটী পৌঁছিয়াই তাহার অন্ত হইয়াছে। বৃদ্ধা দিদির হাল্কা শরীরে (জ্বরভাব থাকিলেও) শক্তি কত দূর, তাহা আমরা সকলেই সে দিন প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্মিত হইলাম। কাণ্ডিওয়ালার হাত ধরিয়া তিনি সকলের অগ্রেই এই তুষারবিস্তৃত পথে বিনা বাক্যব্যয়েই অগ্রসর হইলেন। দীর্ঘযষ্টি হস্তে প্রতিপদক্ষেপেই তাঁহার অসাধারণ ধৈর্য্য ও সাহসের

---

* লোকটির নাম ছিল "রতন সিং।"

পরিচয় প্রকাশ পাইল। কোথায় পাহাড়ের এতটুকু সংকীর্ণ শৃঙ্গদেশ—যেখানে একটু অসাবধানে পা বাড়াইলে তুষারপিচ্ছিল পথে একবারেই নীচে গড়াইয়া পড়িবার পূর্ণ আশঙ্কা, সেখানেই তিনি অতি সন্তর্পণেই অনায়াস-সাধ্য বীরের মত সকলের অগ্রেই পার হইয়াছেন, তবে কাণ্ডি-বাহক অবশ্য হাত ধরিয়াছিল। বঙ্গদেশবাসী জনৈক বৃদ্ধার পক্ষে ইহাও বড় কম সাহসের পরিচয় নহে। তাঁহার এই অগ্রগমনে, দেখাদেখি সকলেই সে সব স্থল অতিক্রম করিয়া চলিলেন। এইরূপে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে না হইতে এক তুষার-প্রচ্ছন্ন অমল-ধবল অপেক্ষাকৃত নিম্ন উপত্যকামধ্যে উপস্থিত হইয়া, ক্ষণেকের জন্য সকলেরই যেন হঠাৎ গতি রুদ্ধ হইল। চতুর্দ্দিকেই চিত্র-বিচিত্র ঝলমল-সৌন্দর্য্য-বেষ্টিত গগনস্পর্শী বিশাল পাহাড়—সমস্তই তুষারের আবরণ, কত অগণিত শুভ্রোজ্জ্বল তাহার শৃঙ্গ—তাহারই মধ্যস্থলে এই নাতি-বিস্তৃত উপত্যকা (তাহারও অঙ্গে রজতের উজ্জ্বল আভরণ), কোথাও কতক উচ্চ, কোথায়ও কিছু দূর সমতল, কোথায়ও বা আঁকা-বাঁকা উঠিয়া নামিয়া ঐ দিগন্ত-প্রসারী সুবিশাল রজত-পাহাড়ের কোলে অগ্রসর হইয়া কেমন মিশাইয়া রহিয়াছে! চোখের সম্মুখে এ যেন একটি আকাশ-ভরা বিরাট সৌন্দর্য্যের প্রকাণ্ড শ্বেত-শতদল! দিগম্বরের চির-প্রশান্ত শুভ্র অট্টহাস্যের মত পাহাড়-প্রকৃতির এই অপরূপ রূপসৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া, আমাদের প্রত্যেকেরই মুগ্ধ চিত্ত যেন আপনার অলক্ষ্যে আপনিই বলিয়া উঠিল, কোথায় সেই ধূলিধূসরিত শ্যামল মাটীর ধরা! দেশভরা আত্মীয়-স্বজন, সংসার, মায়া-মোহ-বাসনা-ক্লিষ্ট নিরন্তর কর্ম্ম-কোলাহল-ভূমি! এখানে তাহার কোন চিহ্নই নাই! শুধু এই বিরাট সৌন্দর্য্য-সৌধের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া মুক্তিতীর্থ-দর্শন-প্রয়াসী আমরা কয়জন মাত্র যাত্রী! জীবনকে তুচ্ছ করিয়াই যেন কাহার অস্পষ্ট ইঙ্গিতে স্বপ্নের মত

হঠাৎ চলিয়া আসিলাম! এ জীবন্ত শরীরে স্বর্গীয় জ্যোতির এই অপরূপ চির-সুন্দর সুষমাদর্শন যেন জন্মজন্মান্তরের শত সাধনার ফল! রৌদ্র, মেঘ ও ছায়ার তুলিকাস্পর্শে তখন পাহাড়ের শৃঙ্গে শৃঙ্গে কোথাও সোনালী, কোথাও রূপালী, আবার কোথাও বা ইন্দ্রধনুর মত নানা বর্ণে পাহাড়টি রঞ্জিত হইয়া চোখের সম্মুখে কুহকজাল বিস্তার করিতেছিল, ঠিক যেন একখানি জাগ্রত চলচ্চিত্রের মত! এ দৃশ্য মনুষ্য-চক্ষু কতক্ষণ উপভোগ করিতে সমর্থ হয়! যেখানে বিপদ, সেইখানেই বুঝি ভগবানের অতুলনীয় শোভা-সম্পদ্ এইভাবে চিত্র-বিচিত্ররূপে চিরদিন প্রকাশ পাইয়া থাকে। এইরূপ নানাচিন্তায় অন্যমনস্ক হইয়া আবার আগে চলিলাম।

এই তুষার-বেষ্টিত হিমগিরির তুষারের পথ অতিক্রমকালে এক নূতন বিপদের সম্মুখীন হইলাম। অকস্মাৎ প্রহেলিকার মত যেন কোন্ অদৃশ্য-পুরুষের কঠিন ইঙ্গিতে, পলক না ফেলিতেই চারিদিক্ অন্ধকারে ভরিয়া গেল। একবারেই পট-পরিবর্ত্তন; কোথায় ডুবিয়া গেল সেই শোভা, পাহাড়ের সেই রজত-ঝল্‌মল্ আপাতমনোহর দৃশ্য! ফতে সিং ও ভগবানের চীৎকারমত আমরা যে যেখানে ছিলাম, মাথার ছাতা নীচু করিয়া ধরিয়া তুষারের মধ্যে একবারে বসিয়া পড়িলাম। বলিতে কি, সে অন্ধকারে পনেরো মিনিট কাল কেহ কাহারও অস্তিত্ব পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলাম না। প্রকৃতির সে কি এক কঠিন ও অদ্ভুত বিপর্য্যয়! 'চটপট' শিলা-বর্ষণ ও সঙ্গে সঙ্গে অজস্র বৃষ্টিপাতে সকলেই তখন বিলক্ষণ কম্পান্বিত-কলেবর! বৃদ্ধা দিদির হস্তের ছাতা ও যষ্টি শিথিল হইয়া পড়িল, নিরুপায় বুঝিয়া কাণ্ডিবাহক কাণ্ডির মধ্যগত কম্বলখানি (যাহার উপর সওয়ার বসিয়া যায়) তাঁহার সর্ব্বশরীরের আচ্ছাদনস্বরূপ ঢাকিয়া দিল। বৌদিদির অবস্থাও তদ্রূপ! শীতে ও শিলা-পতনে তাঁহার দুই হাতই যে সমান অসাড়! এই বিপত্তিতে তীক্ষ্ণবুদ্ধি অগ্রজ মহাশয় দৃঢ়হস্তে

বৌদিদির দুই হস্তই একভাবে কিছুক্ষণ ঘর্ষণ করতঃ গরম করিয়া দিলেন। ততক্ষণে আকাশ কিছু পরিষ্কার হইয়া আসিল। জ্ঞাতি-পত্নী মনের আবেগে এইবার কিন্তু বালকের মতই ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। সকলেরই দৃষ্টি তাহার উপর ধাবিত হইল। আতঙ্কে তাঁহার মুখ যেন সাদা হইয়া গিয়াছে! বলিলেন, "কলিকাতায় থাকি, মাসের মধ্যে চারিবার কালীঘাটে কালী-মায়ীর দর্শন করিয়া স্বচ্ছন্দে বাটী ফিরিয়া আসি।" (ইঁহার স্বামী আলীপুরের এক জন ব্যবহারাজীব) "আমি কেনা মরিতে এই সৃষ্টিছাড়া যমের বাড়ীর পথে আসিয়া পড়িলাম!" বড় দুঃখেই এ কথা তাঁহার মুখ দিয়া সে সময়ে বাহির হইয়াছিল! আমার কিন্তু এ কথায় দুঃখের মাঝেও হাসি ফুটিয়া উঠিল। এতক্ষণ বৃদ্ধা দিদি "কম্বল-মুড়ি" দিয়া তুষারমধ্যে নীরবে (বোধ হয় সমাধিস্থ হইতেছিলেন) বসিয়াছিলেন। আমার হাসির শব্দে তিনি 'গা-ঝাড়া' দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া এ জন্য আমাকেই যেন তিরস্কার-সুরে বলিয়া উঠিলেন, "যত দোষ 'সুশীলে'রই (আমার!) যত কিছু সৃষ্টি-ছাড়া দুর্গম তীর্থ অভিযানে চিরদিনই তাহার সমান রুচি! কোথায় কৈলাস, মানস-সরোবর, কোথায় যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী—যত দুরূহ কঠিন তীর্থই হউক না কেন, যাওয়া চাই-ই। বলিয়াছিলাম, শুধু বদরী-কেদার দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিব (যাহা সকলেই করিতে চায়), তা নয়! এক সঙ্গে একবারে পাঁচ ধাম!" এ তিরস্কার নীরবে মাথা পাতিয়া লইলাম। এইবার বৌদিদি মুখ ফুটাইলেন। বৎসরের মধ্যে অর্দ্ধেক সময় তিনি দার্জ্জিলিংএ থাকিতেন (ইঁহার স্বামী অর্থাৎ অগ্রজ মহাশয় বাঙ্গালার 'সেক্রেটারিয়েট' P. W. D. অফিসের প্রধান কর্ম্মচারী—সুতরাং লাটসাহেবের দপ্তরের সহিত ইঁহাকেও প্রতি বৎসর দার্জ্জিলিং যাইতে হইত) "টাইগার হিল" "ঘুম পাহাড়" প্রভৃতি কত উচ্চস্থান তিনি পদব্রজে সখ করিয়া ঘুরিয়া

াসিয়াছেন, কিন্তু এমন বিপৎ-সঙ্কুল বরফের মাঝখানে কখনও তাঁহাকে া বাড়াইতে হয় নাই, এ কথা তিনি স্পর্দ্ধার সহিতই বলিতে পারেন। কেবল বন্ধু-পত্নী অর্থাৎ আমাদের জমিদার-গৃহিনী কিন্তু এ সকল কথায় াদৌ সায় দিলেন না। মুখে তাঁহার এই বিপদের সময়েও অটুট ধৈর্য্য ও সাহসের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছিল। কাশীপুরের রাজপ্রাসাদ তুল্য াগান-বাড়ীতে বিদ্যুৎ-পাখার নিম্নে বসিয়া যিনি নিয়তই অসংখ্য দাস-াসীর পরিচর্য্যা লইয়া বাস করেন, এই কঠিন প্রকৃতি-বিপর্য্যয়ে তুষারের ধ্যে পড়িয়া তিনি আজ এতটুকুও বিচলিত হইলেন না। অমানুষিক হিষ্ণুতার মূর্ত্তি লইয়া তিনি কেবল বিনা বাক্যব্যয়ে সকলকেই আগে াইতে উৎসাহ দিলেন। কোথায় মঙ্গু, এ তুষারের শেষ কোথায়, কতক্ষণে পৌছিব, আবার যদি অন্ধকার ঘনাইয়া আসে! এইরূপ নানা চিন্তায় সদাই অন্যমনস্ক হইতেছিলাম। মন বাহিরে প্রকাশ না করিলেও, অন্তরে অন্তরে বেশ বিদ্রোহ তুলিয়াছিল, "এইরূপ কঠিন তুষার-সমাচ্ছন্ন দুর্গম পথে স্ত্রীলোক-যাত্রী আনিয়া কোনমতেই ভাল করি নাই।"

মানুষ মানুষের মুখ চাহিয়াই ত আশা-উৎসাহে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হয়, এই জনবিরল কঠিন তীর্থপথে একান্ত অসহায় ও মুমূর্ষুর মতই এক্ষণে আবার আমরা তুষাররাশি মন্থন করিতে পা বাড়াইলাম। চারিদিকেই স্বর্গীয় শোভা আবার ফুটিয়া উঠিল! এবার কিন্তু সকলেরই ব্যাকুল দৃষ্টি সেই মঙ্গুর দিকে! এক স্থানে অগ্রজ মহাশয় হঠাৎ পা পিচলাইয়া সাত আট হাত নীচে বরফের উপর দিয়া পড়িয়া গেলেন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার লম্বা যষ্টির অগ্রভাগ বরফের মধ্যে একদম বসিয়া গিয়াছিল এবং যষ্টিটি তিনি দৃঢ়হস্তে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। তৎক্ষণাৎ কুলীরা গিয়া তাঁহাকে উঠাইয়া ফেলে। এ পথে যষ্টি যে তৃতীয় পায়ের মত কার্য্য করে, ইহাই তাহার জাজ্বল্য প্রমাণ। বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে

ক্ষুধাতৃষ্ণাও বাড়িয়া চলিয়াছে। এক এক বার মুষ্টি ভরিয়া সকলেই বরফ তুলিয়া মুখে দিলেও তৃষ্ণা কিন্তু শান্ত হইতেছিল না। বেলা দুইটা আন্দাজ সময়ে দূরে সম্মুখভাগে বরফের গায়ে মজুর শ্বেতবর্ণ চটী দেখিতে পাইয়া, আশায় বুক বাঁধিয়া সকলেই দ্রুতগতি অগ্রসর হইতে লাগিলাম। বলা বাহুল্য, তুষার-পিচ্ছিল উৎরাই-পথে দ্রুত চলা কোনমতেই সহজসাধ্য নহে। জ্ঞাতিপত্নীর দুর্দ্দশা অসীম! তাঁহার সর্ব্বশরীর একবারেই অবশপ্রায়! দুই জন ডাণ্ডিওয়ালা দুই দিকে তাঁহার দুই হাত (স্কন্ধের নিকটে) দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া বরফের মধ্য দিয়া ঠিক যেন টানিয়া লইয়াই যাইতেছে! তিনি নিজে যেন পায়ে ভর দিয়া চলিতে একবারেই অশক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন! ফতে সিং, ডাণ্ডিওয়ালা কুলীগণ, ভগবান্ সিং সকলেই আগে যাইবার কালে জুতার গোড়ালী দিয়া বরফের মধ্যে একটু গর্ত্ত-মত করিয়া দিলে, আমরা আর আর সকলেই সেই গর্ত্তে পা দিয়া অতি সন্তর্পণে আগে চলিতেছি। এক স্থানে নীচু পথে নামিবার উপায় নাই দেখিয়া ফতে সিং প্রভৃতি কুলীগণ কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিল। শেষ সারি সারি সিঙুর-বৃক্ষ * দেখিয়া তাহারই শাখা-প্রশাখা ধরিয়া নীচে নামিবার সিদ্ধান্ত হইল। এই সকল বৃক্ষের মূলদেশ কোমর পর্য্যন্ত সে সময়ে বরফে আবৃত। কেবল পাতা-হীন শাখা-প্রশাখার অগ্রভাগ উপরিভাগে দেখা যাইতেছিল। তাহারই মধ্য দিয়া ক্ষতবিক্ষতশরীরে কি স্ত্রীলোক, কি পুরুষ সকলেই একে একে শাখা ধরিয়া নীচের দিকে ঝুইয়া পড়িয়াছি। কুলীগণ সে স্থলে অমানুষিক পরিশ্রমে নিজেদের জীবন তুচ্ছ করিয়াও যাত্রীর প্রাণ বাঁচাইতে এতটুকু কৃপণতা করে নাই।

এই সিঙুর গাছ ধরিয়া নীচে নামিবার কালে ফতে সিং উপরদিকে এক সাধুকে অদ্ভুতভাবে নীচে নামিতে দেখিয়া, আমাদিগকে সেই দিকে

* এই গাছ ছোট ছোট পলাশ বৃক্ষের মত।

দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে বলিলে, আমরা সকলেই সে দৃশ্যে, সে কঠিন সময়েও হাস্য সংবরণ করিতে অক্ষম হইলাম। সাধুটির দুর্জ্জয় সাহস ও উপস্থিত-বুদ্ধি এই অমানুষিক উপায়ে নীচে নামিতে উৎসাহ দিয়াছে সন্দেহ নাই। কম্বলে সমস্ত দেহ আবৃত রাখিয়া তিনি সচ্ছন্দে পিচ্ছিল বরফের মধ্যে বসিয়া বসিয়া উপর হইতে নীচে গড়াইয়া পড়িতেছেন। অবশ্য নীচে নামিবার পথ না পাইয়াই এই উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

বেলা পাঁচটা আন্দাজ সময়ে আমরা সকলেই প্রাণ লইয়া যখন মজুর চটীতে উপস্থিত হইলাম, তখন ডাণ্ডিওয়ালা প্রভৃতি কুলীগণ সকলেই সমস্বরে আনন্দের সহিত "বুড়টী মায়ী কী জয়" রবে চীৎকার করিয়া উঠিল। দুঃখের কথা বলিতে কি, ঠিক সেই সময়ে "বুড়টী মায়ী" অর্থাৎ আমাদের বৃদ্ধা দিদি অকস্মাৎ হস্তপদ শিথিলাবস্থায় অত্যধিক পরিশ্রম-হেতু অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। ধর্ম্মশালা হইতে কাষ্ঠাদি আনিয়া অগ্নিসেক দিলে প্রায় পনেরো মিনিটকাল বাদে তবে তাঁহার পুনরায় জ্ঞানসঞ্চার হইল।

সমস্ত দিন প্রাণান্ত পরিশ্রমের পর রাত্রিতে যখন গরম লুচি পাতে পড়িল, অগ্রজ মহাশয় তখন যেন আলাপ-আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। আলোচনা আর কিছুই নহে, শুধু পাঁওয়ালী-পথে নিজেদেরই দুর্দ্দশার কাহিনী! তাঁহার আঘাত কিছু গুরুতর হইয়াছে কি না, জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি সপ্রতিভভাবেই বলিয়া উঠিলেন, "পাঁওয়ালী ত আর সে পৃথিবী নহে, যে পৃথিবীর মানুষ আমরা! ইহা হইল দেব-দানব-গন্ধর্ব্বের রাজ্য। তাঁদের রাজ্যের শোভা-সম্পদ্ আমরা যে চর্ম্মচক্ষুতে দেখিয়া লইলাম, ইহা তাঁহারা কিরূপে সহ্য করিবেন? সেই জন্যই ত এত বিপদ, কষ্ট সকলকেই ভুগিতে হইল! গরম লুচি খাইয়া ত আর দেব-দানব

গন্ধর্ব্ব হইতে পারিলাম না যে, যখনই ইচ্ছা এই স্বর্গের শোভা বিনা বাধায় দেখিয়া লইবার সুযোগ বা সৌভাগ্য লাভ করি !"

কালী কম্‌লীওয়ালার এখানকার ধর্ম্মশালাটি পাকা ও দ্বিতল, উপর নীচে দুইখানি করিয়া সর্ব্বসমেত চারিখানি ঘর ও তৎসংলগ্ন বারান্দা রাত্রিতে উপরের একখানি ঘরে বেশ আরামেই সকলে ঘুমাইতে পারিয়াছিলাম। একখানি মাত্র দোকান, তবে দোকানে চাউল, আটা, চিনি হইতে পেঁড়া প্রভৃতি সকল দ্রব্যই—এমন কি, আলু পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছিল। কষ্টের মধ্যে জল-কষ্টই বেশী অনুভব করিলাম। * সর্ব্বত্রই বরফ। বৈকালে এই বরফই একটু একটু গলিয়া ঝির্‌-ঝির্‌ রবে এক স্থানে জল দিতেছিল। তাহাই সকল যাত্রীর তৃষ্ণা-নিবারণের উপায়। আমরা এখানে পৌঁছিবার অগ্রে ও পশ্চাতে যে কয়জন যাত্রী সে দিন আসিয়াছিলেন, সকলেই এই পঁওয়ালী-পথের অসীম দুর্দ্দশার কাহিনী শতমুখে ব্যক্ত করিয়া টিহিরী রাজ্যের স্বাধীন রাজার এ দিকে যে আদৌ দৃষ্টি নাই, এ কথাও সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

পাঠক-পাঠিকাগণকে এ স্থলে একটি প্রয়োজনীয় কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক মনে করিতেছি। সাধারণতঃ এক যাত্রায় পাঁচ-ধাম গমনেচ্ছু যাত্রিগণকেই এই পঁওয়ালীর বিপদজ্জনক পথ ধরিয়াই অতিরিক্ত কষ্ট ভোগ করিতে হয়। বিশেষতঃ যে বৎসর তুষারের আধিক্য থাকে, † সে বৎসর এ পথের যাত্রীকে প্রতি পদক্ষেপে প্রাণ হাতে লইয়াই (যেমন

---

* এ স্থানটি সমুদ্রগর্ভ হইতে প্রায় ১১০০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত। এস্থানের সর্ব্বত্রই বরফ।

† সকল বৎসর সমান তুষার থাকে না।

৬ষ্ঠ পর্ব্ব—



তুষারের পথে ছাগদল



পাঁওয়ালীর পথে

ষষ্ঠ পর্ব্ব—



পাঁওয়ালী হইতে কিছু আগের পথে



তুষারের পথে যাত্রী

আমাদের দুর্দ্দশাভোগ হইয়াছে) যাইতে বাধ্য হইতে হইবে। এমত অবস্থায় এক দফায় মাত্র যমুনোত্রী ও গঙ্গোত্রী দর্শন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিলে যাত্রীর এই বিপজ্জনক পথ অতিক্রমের আবশ্যক হয় না। না হয়, পরের দফায় বদরী-কেদার দর্শন করিতে গেলে আর একবার তীর্থযাত্রা-পর্ব্বের উদ্যোগ চলিবে, কিন্তু তাহা করিলে শুধু সময়ের অল্পতা নহে, এই পাঁওয়ালীর পথ হইতে নিষ্কৃতিলাভ—সেও সমতল-দেশবাসী যাত্রীর পক্ষে বড় কম সুবিধার কারণ হইবে না।

এই মঞ্জুতে পরদিন প্রাতঃকালে জলের অভাবে সমস্ত যাত্রীই বিলক্ষণ অসুবিধা ভোগ করিল। আশে-পাশে সর্ব্বত্রই তুষার জমাট বাঁধিয়া আছে, একটু বেলা না হইলে জল পাওয়া দায়। অগত্যা কুলীর মাথায় বোঝা চাপাইয়া প্রায় অর্দ্ধ-মাইল নীচে আসিয়া, একটি ঝরণার ধারে সকলেই আমরা হাত-মুখ ধুইয়া লইলাম। তার পর নানাজাতীয় লতা-পাদপ-পরিপূর্ণ জঙ্গলের মধ্য দিয়া কেবল উৎরাই পথ, সে পথে কোথায়ও এতটুকু বরফ ছিল না। কাল প্রচণ্ড শীতে বরফের মধ্যে প্রাণ হারাইতে বসিয়াছিলাম, আর আজ কয়েক মাইল মাত্র ব্যবধানে নামিয়া আসিতেই সে পুঞ্জীভূত তুষারের একেবারেই অন্তর্দ্ধান—সমস্তই যেন বিচিত্র মায়ার মত প্রহেলিকা মনে হইল! বেলা আটটার মধ্যে আমরা এ ছায়া-শীতল পথে পাঁচ মাইল আন্দাজ নামিয়াই এইবার নিরন্তর লোক-সমাগম-পূর্ণ প্রাচীন পবিত্র তীর্থ "ত্রিযুগীনারায়ণে" আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

সপ্তম পর্ব্ব

৩য় ধাম—ত্রিযুগীনারায়ণ

স্থানটি বেশ বড়, প্রায় পঞ্চাশ ঘর ব্রাহ্মণের এখানে বসবাস আছে। দোকান-পসার, যাত্রিসংখ্যাও যথেষ্ট। যাঁহারা সাধারণতঃ বদরী-কেদার দর্শনেচ্ছু, তাঁহারাও এখানে যাতায়াত করিয়া থাকেন। সুতরাং এইবার এত দিনে সহজ-সুগম পথে প্রবিষ্ট হইয়াছি জানিয়া সকলেই যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। এত দিন ছিলাম টিহিরী রাজ্যের গণ্ডীর মধ্যে, কেবলই জঙ্গল ও নিরালা ভিন্ন সেখানে কিছুই ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না, এইবার লোকালয়ের মধ্যে পড়িয়াছি, অন্য দিকে সুবিধা থাকিলেও জিনিষপত্রও যে এখন হইতে অতিরিক্তি মহার্ঘ হইবে, তাহা দোকানের দর জানিয়াই হাড়ে হাড়ে অনুভব করিলাম। ঘৃত তিন টাকা সের, চাউল আট আনা, মিছরী এক টাকা, আলুও সের পিছু চারি আনা। অথচ চারিদিকে এখানে বিলক্ষণ আলুর ক্ষেত দৃষ্ট হইতেছে। কেরোসিন তৈল প্রতি বোতল ॥০ আনা মাত্র! "কালী কম্‌লীওয়ালার পাকা দ্বিতল ধর্ম্মশালা—ছাদে টিন ও সম্মুখে বারান্দাযুক্ত। উপরে ও নীচে ৭।৮ খানি ঘর, কিন্তু সেখানে সাধুদের অতিরিক্ত ভিড়, সুতরাং প্রত্যহই সেখানে যাত্রীরা স্থানাভাব মনে করিয়া থাকেন।" পাণ্ডাদের এই উক্তিতে আমরা শেষ এক দোকানদারের লম্বা চটীতে (তাহাতে দুইখানি ঘর) আশ্রয় লইলাম। চটীর একটু দূরেই পাইপ-সংযোগে ঝরণার জল-ব্যবহারের সুযোগ থাকায়, এখানে জলকষ্ট নাই মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। শীতও এখানে অনেকাংশে কম, কেবল একমাত্র উত্তরদিকেই তুষারমণ্ডিত

৭ম পর্ব্ব—



ত্রিযুগী নারায়ণের মন্দির



ত্রিযুগী নারায়ণ হইতে উত্তরের তুষার-পাহাড়

৭ম পৰ্ব্ব—



দুধগঙ্গা মিশ্রিত মন্দাকিনী ধারা—বাসুকি গঙ্গার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে



উপর হইতে গৌরীকুণ্ড চটী ও মন্দাকিনীর দৃশ্য

পর্ব্বত দেখা যাইতেছিল। আর আর সকল দিকেই বৃক্ষ-পরিপূর্ণ ধুম্র-পাহাড়।

বেলা দশটার মধ্যেই আমরা একে একে সকলেই এখানে উপস্থিত হইতে পারিয়াছি। আমাদের পাঁচ ধাম যাত্রার ইহাই হইতেছে তৃতীয় ধাম। ফতেসিং ডাণ্ডিওয়ালা ও বোঝাওয়ালা কুলীগণ সকলেই এ স্থানের অতিরিক্ত ইনাম, খিচুড়ী প্রভৃতি বাবদ প্রাপ্য গণ্ডা আদায় করিয়া লইল, অধিকন্তু পঁওয়ালীর পথে স্ত্রীলোকগণকে যেভাবে যত্ন করিয়া লইয়া আসিয়াছে, তাহার জন্যও স্বতন্ত্রভাবে কিছু বখশিস্ সংগ্রহ করিতে ভুলিল না।

আসবাবাদি যথাস্থানে রাখিবার পরে স্নান ও দর্শনার্থী হইয়া সকলেই মন্দিরসমক্ষে উপস্থিত হইলাম। কাশীর মত এ স্থানে যাত্রীর পশ্চাতে পশ্চাতে পাণ্ডাদিগের বিলক্ষণ উৎপাত লাগিয়া আছে। মন্দিরের উত্তরদিকে "ব্রহ্মকুণ্ড" ও "রুদ্রকুণ্ডে" সঙ্কল্প করিয়া স্নানান্তে মন্দিরে প্রবিষ্ট হইলাম। মন্দিরে নারায়ণের প্রস্তর-মূর্ত্তির সম্মুখে অষ্টধাতু নির্ম্মিত সুন্দর চতুর্ভুজমূর্ত্তি ও তৎপার্শ্বে রৌপ্য-নির্ম্মিত লক্ষ্মীদেবী ও সরস্বতীর প্রস্তর-প্রতিমা শোভা পাইতেছিল পশ্চাদ্ভাগে ধাতুনির্ম্মিত "কালভৈরব" মূর্ত্তিও বিরাজমান আছেন। শুনিলাম, সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর এই তিন যুগব্যাপী এই স্থানে ইহাদের মূর্ত্তি স্বপ্রকাশ, এজন্য "ত্রিযুগী-নারায়ণ" নামে এই প্রসিদ্ধি চলিয়া আসিতেছে। আরও শুনিলাম, হর-পার্ব্বতীর শুভবিবাহকালে স্বয়ং নারায়ণ এ স্থানে যে যজ্ঞ ও হোম ইত্যাদি করিয়াছিলেন, সে সময়কার পবিত্র অগ্নিকে এখনও পর্য্যন্ত জীয়াইয়া রাখিবার জন্য চিরদিন একভাবে সেই স্থানে 'ধুনী' জ্বালাইয়া রাখা হইয়াছে। যে ভাবে অগ্নি জ্বালাইয়া হউক না কেন, এই পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে প্রত্যেক যাত্রীই যে ক্ষণেকের জন্য আনন্দাপ্লুত-হৃদয়ে পূজারীগণের নিকটে অগ্নি জ্বালাইবার কাষ্ঠ ও হোমের জন্য এখনও পর্য্যন্ত সাধ্যমত

অর্ঘ দিয়া আসিতেছেন, তাহা আমরা সে স্থানে প্রত্যক্ষই করিলাম। *মন্দিরের পশ্চিম দিকে পাণ্ডাগণ হরপার্ব্বতীর বিবাহ-কালীন* "ছাউনি তলা" দেখাইয়া সেই পবিত্র শিলাভূমিতে গো-দান, অন্ন-জল-বস্ত্রাদি উৎসর্গের জন্য প্রত্যেক যাত্রীকেই পীড়াপীড়ি করিয়া থাকেন। ভক্তগণ উচ্ছলিত আবেগে সেই বিশ্বাসেই এখনও যে সেখানে দান-উৎসর্গাদি করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিয়া থাকেন, হিন্দুর দৃষ্টিতে সে দৃশ্যও যে আজ কত মধুর ও পবিত্র! ছাউনিতলার পার্শ্বেই আবার দুইটি কুণ্ড; একটির নাম বিষ্ণুকুণ্ড; এখানে চরণামৃত পান করিবার বিধি ও অপরটি সরস্বতীকুণ্ড, সেখানে পুরুষগণের তর্পণের বিধি আছে!

দর্শন-পূজাদি শেষ করিতে এ দিন আমাদের প্রায় আড়াইটা বাজিয়া গিয়াছিল। সুরো চাকর আজ বহুদিনের পর দোকান হইতে মেঠাই, শাকভাজা, আলুর "পকৌড়ী" প্রভৃতি কিনিতে পাইয়া প্রাণ ভরিয়া যেন পরিতৃপ্ত হইল! দুঃখের বিষয়, বুড়া কেদারের মত এ স্থানেও অসম্ভব মাছির উৎপাতে আমরা উত্ত্যক্ত হইলাম। আহারাদি কোন প্রকারে শেষ করিয়া লইয়া সন্ধ্যাকালে আবার সে দিন আরতি দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। আরতি অন্তে এ দিনে নির্জ্জন পাইয়া পূজারী মহাশয় আমাদিগকে মন্দির-দ্বার হইতে কিছুক্ষণ নীরবে কান পাতিয়া থাকিবার কথা বলিলেন এবং সে সময়ে কিছু শুনিতে পাওয়া গেল কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। কাণ পাতিয়া আমরা কেবল চতুর্ভুজ-মূর্ত্তির ঠিক পার্শ্বদেশে "টপ" "টপ" শব্দে বিন্দু বিন্দু জল-পতনের শব্দ শুনিতে পাইয়া, জিজ্ঞাসায় জানিলাম, "এই ধারা শ্রীহরির নাভিকমল হইতে চিরদিন একভাবে এই স্থানে অল্প অল্প পড়িয়া থাকে।" পূজারীর মুখে এ কথা আশ্চর্য্যজনক মনে হইলেও, হিমগিরির এই চিরপবিত্র ত্রিযুগীনারায়ণের পুণ্য পাদপীঠে, "ভগবানের নাভি-কমল হইতে জল-পতন" এরূপ শব্দ ভক্তের

কর্ণে মধুবর্ষণের মতই মধুর মনে হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। পরদিন প্রত্যূষে ত্রিযুগীনারায়ণ হইতে আবার আগে রওনা হইলাম।

সওয়া মাইল আন্দাজ উৎরাই পথে নামিয়া বামভাগে "শাকম্ভরী" দেবীর দর্শন পাইলাম। দেবীর মন্দিরটি ত্রিপুরা রাজষ্টেটের কর্ণেল যাদবচন্দ্র ঠাকুর কর্তৃক প্রায় ২২ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে। এ স্থানটি দুইটি রাস্তার সন্ধিস্থল (Junction), একটি উপরের রাস্তা কতকটা দক্ষিণাভিমুখী হইয়া হরিদ্বার হইতে আসিতেছে, অপরটি পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া নীচের দিকে গৌরীকুণ্ডের পথে নামিয়াছে। নীচের উৎরাই পথেই আমরা ক্রমশঃ নামিয়া চলিলাম। কিছু দূর অগ্রসর হইতেই বামভাগের উত্তরদিক হইতে আগত "বাসুকি-গঙ্গার" কলকল শব্দ শুনিতে পাইলাম। একেবারে নীচে নামিয়া এইবার আমরা গভর্ণমেণ্ট-নির্ম্মিত সুন্দর প্রশস্ত সড়কে একে একে উপস্থিত হইয়া হাঁপ ছাড়িলাম। ইহাই হইল রামপুরে যাইবার রাস্তা। এখান হইতে "কেদারনাথ" মাত্র ৯।।০ মাইল। রাস্তার অবস্থা দেখিয়া বৃদ্ধা দিদি, দাদা, বৌদিদি, বিশেষভাবে জ্ঞাতিপত্নীর মুখে এইবার হাসি ফুটিল। এইখানে বাসুকি-গঙ্গার উপরে একটি সুন্দর পুল আছে। ওপারে বিশালকায় ধূম্র-পাহাড়। পাহাড়ের পার্শ্ব দিয়া পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে আবার "দুধগঙ্গা"-মিশ্রিত মন্দাকিনীর শ্বেত-ধারা প্রচণ্ড নিনাদে বাসুকি-গঙ্গার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। দৃশ্য হিসাবে এ স্থান অতীব রমণীয় মনে হইল। ডাণ্ডিওয়ালা, বোঝাওয়ালা সকল কুলীই আজ যেন অধিকতর প্রফুল্লচিত্ত। বদরী-কেদারের সুসংস্কৃত সড়কের সহিত তাহারা চিরদিনিই পরিচিত। ইচ্ছা করিলে প্রতিদিন ২০ মাইল পর্য্যন্ত পথ তাহারা এ দিকে অতিক্রম করিবার সামর্থ্য রাখিয়া থাকে। মনে পড়িল, "ছুঁনা-বেলক-পঙরানার" গভীর জঙ্গল, "গাওরান কী মড়া পাঁওয়ালীর" সৃষ্টিছাড়া তুষারের বিপজ্জনক রাস্তা! পথের যত কিছু

কঠিনতা; সবই যেন এতক্ষণে অন্তর্হিত হইয়া, প্রত্যেককেই আজ আশ্বাস প্রদান করিল, "আর কোথাও ভয় পাইবার কিছুই নাই, এইবার স্বচ্ছন্দে দুই ধাম দর্শনানন্তর বাটী ফিরিবার আশা হইয়াছে।" পুল পার হইয়া মন্দাকিনীর ধারে ধারে ক্রমাগত চড়াই পথে উঠিয়া বেলা আটটা আন্দাজ সময়ে "গৌরীকুণ্ডে" উপস্থিত হইলাম। এখানে অনেক দোকান ও চটী এবং এতদিন পরে বহু বঙ্গদেশীয় যাত্রীর সহিত সাক্ষাৎলাভ ঘটিল। উত্তরাখণ্ডে এই গৌরীকুণ্ডের মাহাত্ম্য-বর্ণনে উল্লিখিত আছে,—

"যত্র ত্বয়া মহেশানি মন্দাকিন্যাস্তটে পুরা।
ঋতুস্নানং কৃতং তদ্বৈ গৌরীতীর্থমিতি স্মৃতম্ ॥"

এখানে মন্দাকিনীতটে কাত্তিকেয়ের উৎপত্তিসময়ে গৌরীদেবী প্রথম ঋতুস্নান করেন।

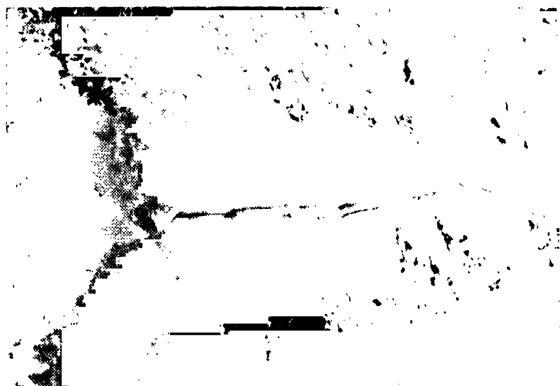
এখানে তিনটি কুণ্ড দেখিলাম। প্রত্যেক কুণ্ডেই গোমুখ দিয়া ধারা নামিতেছে। একটির জল শীতল, সেটিই 'গৌরীকুণ্ড' আর একটি তপ্তকুণ্ড, তাহাতে তপ্ত-ধারার প্রস্রবণ। সেটিকে 'মহাদেবকুণ্ড' বলা হয়। পার্শ্বেই "গোরক্ষনাথ" মহাদেব ও পার্ব্বতীদেবীর মন্দির আছে। তৃতীয় কুণ্ডটির নাম শুনিলাম "বিষ্ণুকুণ্ড"। পাণ্ডাদিগের কথামত আমরা প্রথমে গৌরীকুণ্ডে ও পরে তপ্ত ধারায় স্নান করিয়া মন্দিরে দর্শনাদি যথাসম্ভব সত্বর শেষ করিলাম। আশে-পাশে প্রায় প্রত্যেক দোকানেই "বদরীনারায়ণ," "কেদারনাথ" ও "ত্রিযুগীনারায়ণের" তাম্রমূর্ত্তি, রৌপ্যমূর্ত্তি প্রভৃতি বিক্রয়ার্থ সজ্জিত দেখিয়া আমরাও এখানে প্রত্যেকেই এই সকল মূর্ত্তির কিছু কিছু ক্রয় করিতে বিস্মৃত হইলাম না। দোকানদাররা এই উপায়ে বিলক্ষণ রোজগার করিয়া থাকে দেখিলাম। একটি দোকানদারের উপরের ঘরে আশ্রয় লইয়াছিলাম। দ্বিপ্রহরের আহারাদি সারিয়া এখানেই অন্ত রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা স্থির হইল। ত্রিযুগীনারায়ণ হইতে গৌরীকুণ্ড মাত্র পাঁচ

মাইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অকাল বলিয়া ১৬ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের পূর্ব্বে আমরা কেহই কেদারনাথ দর্শন করিব না, এই হিসাবেই এক্ষণে অল্প অল্প ব্যবধানে রাত্রিযাপনে বাধ্য হইতেছি। ইহাতে ডাণ্ডি বা বোঝাওয়ালা কুলীগণ কেহই সন্তুষ্ট নহে, কারণ, মজুরী লইয়া তাহারা যত শীঘ্র বাটী ফিরিতে পারে, তাহাদের ততই কিছু অধিক লাভ থাকে। আমরা কিন্তু এক্ষণে অল্পদূর আসিয়া, তাহাদের এই লাভের পথের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছি, ইহা তাহাদের পক্ষে বড় কম দুঃখের কথা নহে।

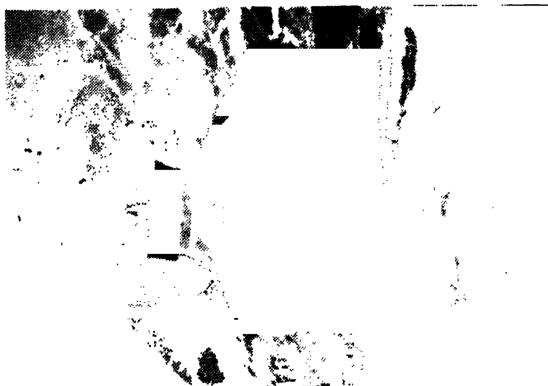
যাত্রীর সুবিধার্থে সরকার বাহাদুর এই গৌরীকুণ্ডে দুই তিন স্থানে ঝরণার জল ধরিয়া রাখিয়া তাহাতে পাইপ যোজনা করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু বলিতে কি,অল্পস্থানের মধ্যে বহু যাত্রী ও দোকানের সমাবেশ থাকায় স্থানটি সর্ব্বদাই বিলক্ষণ অপরিষ্কার হইয়া রহিয়াছে। জিনিষপত্রও বিশেষ মহার্ঘ। তদুপরি এখানেও আবার বিলক্ষণ মাছির উৎপাত। যাহা হউক, কোন প্রকারে রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন প্রত্যূষে আবার আগে চলিলাম। অদ্য ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, সুতরাং আজিকার দিনে এখান হইতে আর সাড়ে সাত মাইল মাত্র দূরে "কেদারনাথ" তীর্থে উপস্থিত হইতে পারিলে, পরদিন প্রাতে স্বচ্ছন্দেই কেদারনাথ দর্শন করিতে পারিব, এই আশায় প্রত্যেকেই তখন আনন্দোৎসুকচিত্তে উপরে উঠিতেছি। দক্ষিণভাগে মন্দাকিনীর নিরন্তর কল-কল শব্দ কাণের মাঝে আশা আশ্বাস জাগাইয়া দিতেছে। দুই মাইল আগে "জঙ্গল-চটীর" লম্বা লম্বা ছপ্পর-ঘর দৃষ্ট হইল। যাত্রীর সুবিধার্থ সরকার এখানেও পাইপ-সংযোগে ঝরণার জল ধরিয়া রাখিয়াছেন। এখান হইতে দুই মাইল আগে "রামবাড়া" চটী। জঙ্গল-চটী পার হইয়া কিছু দূর আগে যাইতেই দূরে চোখের সম্মুখে আবার রজত-গিরির শ্বেত সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিল। মনে হইল, হিম-গিরির এই শুভ্র সুন্দর তুষার-রাজত্বের এইখানে আসিয়া, দেবাদিদেব স্বয়ম্ভূ কেদারনাথ

যোগিজন-বাঞ্ছিত আপনার যোগাসন স্থির রাখিয়াছেন ; ইচ্ছা হইল, ছুটিয়া এক নিমেষে সেথায় উপস্থিত হই। কিন্তু পাহাড়ের দুরধিগম্য পথের শেষ কৈ ? হিন্দীতে একটা কথা আছে, "বিনা আপনা মরে স্বরগ নহী পঁহুচতা" অর্থাৎ নিজে না মরিলে স্বর্গে পৌঁছিবে কিরূপে ? কথাটা অতি সুন্দর। সাধন-মার্গের সোপান অতিক্রম করিয়া চলা—সে কেবল সাধনার ও ধৈর্য্যের উপরেই নির্ভর করে। হঠাৎ "এরোপ্লেনে" উঠিয়া (আজকাল যে উপায় আবিষ্কৃত হইতেছে) ঝটিতি কেদার দর্শন করিয়া বাটী ফিরিলাম—আকাশ-মার্গের এ অভিনয়ে যাত্রীর সংযম তিতিক্ষার কতটুকু থাকিতে পারে ? মহাপ্রস্থানের পথ কি এতই সুগম ও সহজ ? মাস মাসব্যাপী দারুণ রৌদ্র ও মাথায় বৃষ্টি লইয়া যাত্রিগণ লোকালয়হীন দুরধিগম্য পর্ব্বতের চড়াই উৎরাই পথে যে ভাবে আত্মত্যাগ বরণ করিতে বাধ্য হয়—কোথাও জঙ্গল, কোথাও নদী, কোথাও বা তুষারের চির-পিচ্ছিল পথ ! কোন দিকেই ভ্রূক্ষেপ নাই, জীবনকে যেন তুচ্ছ ও একনিষ্ঠভাবে ভগবানের উপরে অর্পণ করতঃ আত্মনির্ভরশীল চিত্তে অগ্রসর হইয়া চলে অসহায় অজানা পথিকেরই মত ! দৃষ্টি তাহার কেবল বিরাট-বিশাল নব নব প্রকৃতি-বৈচিত্র্যের মাঝখানে সেই বিচিত্র-রূপী লীলাময় ভগবানের অপরূপ রূপ-সৌন্দর্য্যে ! ধ্যান—যেন দৈনন্দিন দুঃখ-কষ্টের মধ্যে ধ্যান-ধারণার পবিত্র মূর্ত্তি সেই অদৃশ্য মহাপুরুষেরই চরণতলে। তাই বলিতেছিলাম, প্রতিদিনের এই নিত্য-নূতন বিচিত্র দৃশ্য-সৌন্দর্য্যের মধ্যে উপাসকের মতই যাহাদের চিত্ত সেই অনন্তরূপী বিরাট পুরুষকে খুঁজিয়া বেড়ায়, সে প্রাণপাত পরিশ্রম, জাগ্রত সাধনা যে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতেই নিরন্তর উত্থিত হইয়া থাকে, সে কেবল বুকভরা বেদনা লইয়াই যাত্রীকে আগে লইয়া যায়। এ দৃশ্য—এ সহিষ্ণুতা উপেক্ষা করিয়া বিনা কষ্টে হঠাৎ আকাশ-মার্গে উঠিয়া কেদারদর্শন করিয়া বাটী

৭ম পর্ব—



কেদারের পথে এক প্রপাত



কেদারের মন্দির—সন্ধ্যার দৃশ্য

৭ম পর্ব্ব—



[illegible]—গৌরীকুণ্ড ও কেদারের মধ্যস্থলে



কেদারের পথে উপত্যকা

ফিরিলাম—এ উড়ো বা ফাঁকা আনন্দের সহিত ভুক্তভোগী পায়েচলা যাত্রীর সমকক্ষতালাভ—আকাশ-পাতাল পার্থক্য বলিলেই ঠিক হয়। "নিজে না মরিলে স্বর্গলাভ হয় না"—এ কথাটা প্রত্যেক তীর্থ-পথ-যাত্রীর বিলক্ষণ স্মরণ রাখা উচিত। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে কেহ কোন দিনই যে উচ্চ-পদ-লাভে সমর্থ হয়েন নাই, এ দৃষ্টান্ত আদৌ বিরল নহে।

দুই তিনটি ঝরণা পার হইবার পর পথিমধ্যে এক স্থানে পাহাড়ের গা বাহিয়া উপর হইতে বৃষ্টিধারার মত নিরন্তর বারিধারা পতিত হইতেছিল, মাথায় ছাতা ধরিয়া সে স্থান সকলেই অতি সন্তর্পণে পার হইলাম। "কৈলাস-যাত্রায়" গার্ব্বিয়াংএর পথে একবার এইরূপভাবে নিরন্তর জল-ধারাপতনের স্থলে পিচ্ছিল সংকীর্ণ পথ হইতে আমাদেরই এক কুলী (বেচারী!) বোঝা মস্তকে লইয়া এক দম নীচে "কালী-নদী"-গর্ভে ডুবিয়া মরিয়াছিল। সে কঠিন মর্ম্মঘাতী দৃশ্য আজও যেন চোখের সম্মুখে সুস্পষ্ট ভাসিয়া বেড়াইতেছে। রাস্তার উপরের আর এক স্থানে কেবল স্তূপীকৃত তুষার-রাশি দেখিলাম। তবে এ তুষার, পাঁওয়ালী নহে যে, দেখিবামাত্র শিহরিয়া উঠিব! যাত্রীর সুবিধার্থে এ তুষার কাটিয়া কাটিয়া সিঁড়ির আকারে উপরে লইয়া যাওয়া হইতেছে। যষ্টিতে নির্ভর করিয়া একটু সাবধানেই পার হওয়া চলে। বেলা আটটা আন্দাজ সময়ে আমরা "রামবাড়া" আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কালী কম্লীওয়ালার ধর্ম্ম-শালায় তখন যাত্রীর অত্যন্ত ভীড় ও ভীষণ অপরিষ্কার দেখিয়া, আমরা সকলেই এক দোকানীর লম্বা দোকান-ঘরে আশ্রয় লওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করিলাম এবং দ্বি-প্রহরের আহারাদি যথাসম্ভব সত্বর শেষ করিয়া লইয়া, বেলা ১২টার মধ্যেই সেখান হইতে আবার আগের পথে উঠিয়া চলিলাম।

রামবাড়া হইতে কেদারনাথের দূরত্ব সাড়ে তিন মাইল মাত্র। সে পথ কেবলই ক্রমিক চড়াই উঠিয়া সম্মুখ-ভাগে অর্থাৎ উত্তরাভিমুখে

অগ্রসর হইয়াছে। প্রায় আড়াই মাইল পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতে দুই তিন স্থানে কেবল অল্প অল্প তুষার অতিক্রম করিয়াছিলাম। শেষের দিকে এই চার মাইলব্যাপী তুষার-ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িলাম। পাহাড় ভরিয়া সেই শুভ্র-সুন্দর উজ্জ্বলতা! কোথাও এতটুকু মলিনতা নাই! সুখের বিষয়, এ তুষারে পঁওয়ালীর মত কাহাকেও ভরসা-হীন হইতে হয় নাই, কারণ, রাস্তা সুপ্রশস্ত এবং পাহাড়ের উপর হইলেও প্রায় সমতল ভূমির উপরে। সুতরাং পা পিছলাইলেও গভীর খাদে পড়িয়া প্রাণ হারাইবার মোটেই আশঙ্কা ছিল না। দক্ষিণভাগের লম্বা পাহাড়টি এখানে তুষার-মণ্ডিত, তবে তাহাতে অন্যান্য পাহাড়ের মত উঁচু-নীচু অগণিত শৃঙ্গদেশ না থাকায়, যেন সমানভাবেই আমাদের সহিত আগে অগ্রসর হইতেছিল। এ পাহাড়ের ইহাই যেন নূতনত্ব! তার পর, দূর হইতে এইবার যখন সেই আকাশ-চুম্বী, ঝলমল সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত সুবিশাল রজতগিরি চিত্র-বিচিত্ররূপে চোখের সমক্ষে হঠাৎ ঝলসিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে সেই অমল-ধবল সৌন্দর্য্যের মাঝখানে হিমগিরির চিরপবিত্র পাদ-পীঠে কেদারনাথের সুশোভন শুভ্র-মন্দির দৃষ্টিগোচর হইল, তখন আনন্দ-অধীর-চিত্তে সকলেই যেন দ্রুতগতি সে দিকে ধাবিত হইলাম। মন্দিরের নিকটবর্ত্তী হইলে চতুর্দ্দিকেই কেবল আপাত-মনোহর উজ্জ্বলতা ও শুভ্রতায় প্রত্যেকেরই নয়ন-মন ভরিয়া উঠিল। ধরণীর ধূলি-ধূসরিত বাসনা-পঙ্কিল স্থান যেন অতিক্রম করিয়া, এইবার এতক্ষণে সেই মুনিজনমনোহারী দেব-গন্ধর্ব্ববাঞ্ছিত স্বর্গের সৌন্দর্য্য-নিকেতনে উপনীত হইয়াছি! চারিদিকেই স্বর্গীয়, পবিত্র ও চিরমধুর শুচিতা-সংস্পর্শে উদ্‌ভ্রান্তের মত আমরা যখন কেদারতীর্থে উপস্থিত হইলাম, তখন বেলা আন্দাজ আড়াইটা হইবে।

এখানে আসিয়া প্রথমেই আমরা বৃদ্ধা দিদি ও 'সুরো' চাকরের

জন্য নিযুক্ত দুই জন কাণ্ডিবাহককে তাহাদের ৫ দিনের প্রাপ্য মজুরী সওয়া ছয় টাকা (দৈনিক ১।০ হিসাবে) চুক্তি করিয়া বিদায় দিলাম। অগ্রজ মহাশয় বৌদিদির জন্য ভাটোয়ারী হইতে এই কেদারনাথ পর্য্যন্তই ডাণ্ডিবাহকের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বৌদিদির কথামত তিনিও এখানে ডাণ্ডিওয়ালা কুলীগণকে হিসাবমত মজুরী দিয়া বিদায় দিতে বাধ্য হইলেন। পুরাতন ডাণ্ডিখানা (যাহা ১৪৲ টাকা মূল্যে ক্রয় করা হয়) তাহাদিগেরই সর্দ্দারকে ৪৲ চারি টাকা মূল্যে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। এ বোঝা কে লইতে স্বীকার করিবে! ভগবান সিং আনন্দে এইবার আমাদিগকে সুর করিয়া "পূরব কে লোগোঁ কা এক কিসসা" শুনাইল। কিসসাটি এই ঃ—

"লড়কা বেটী রোয়ত ছোড়া
 গৌ বছরি খড়ক্ ছোড় আয়া।
পাঁচ রুপেয়া মোরী গাঁঠী খরচা—
কৈসে জাঁউ "তুঙ্গনাথ" কে মূলতানি মাট্টি
আগে পৈর ধরো, পীছে বিছিলে
কৈসে জাঁউ বদরীনারায়ণ কী কঠিন ধাম।"

গানের অর্থের সহিত তাহার নিজের অবস্থার অনেকটা সামঞ্জস্য ছিল। কারণ, সে দেশ হইতে আসিবার কালে বাস্তবিকই তাহার লড়কা বেটী "রোয়ত" অর্থাৎ কাঁদাইয়া এবং "গৌ-বছরি" অর্থাৎ গরু বাছুর খোঁয়াড়ে রাখিয়াই এই কঠিন তীর্থ-পথের সঙ্গী হইয়াছে। খরচাও এক্ষণে "পাঁচ রুপৈয়া" আন্দাজ তাহার নিকট অবশিষ্ট আছে এবং বলিতে কি, এখনও পর্য্যন্ত "তুঙ্গনাথ" বা "বদরী-নারায়ণের" মত কঠিন তীর্থও তাহার দর্শন বাকী। তবে তাহার আজ এক্ষণে আনন্দের কারণ কি? কারণ আর কিছুই নহে, সে ত "কেদারনাথ" ও "বদরী

নারায়ণ" উভয় তীর্থেরই আমাদের নিযুক্ত পাণ্ডাদ্বয়ের 'ছড়িদার'-বিশেষ। সুতরাং এত দিন পরে সে আজ আমাদিগকে তাহারই প্রভু এক পাণ্ডার নিকটে নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছাইয়া দিতে সমর্থ হওয়ায়, তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্য গণ্ডা বুঝিয়া পাইবার সুযোগ লাভ করিয়াছে, ইহা তাহার পক্ষে কম আনন্দের কারণ নহে। এখানে পৌঁছিয়াই সে তাহার মালিককে যাত্রীর নির্ব্বিঘ্নে পৌছান সংবাদ দিয়া, তাঁহার কথামত আমাদিগকে এক সুন্দর দ্বিতল বাড়ীর উপর-ঘরে আশ্রয় দিল। প্রকাণ্ড হল্‌ঘর। মেঝেতে একখানি কার্পেটাসন বিস্তৃত, কত যত্নের যাত্রী আমরা। কিছুক্ষণ পরে পাণ্ডা মহাশয় স্বয়ং হাজির দিয়া, কুশল-প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসাবাদের পর বলিয়া উঠিলেন, "আহারাদির ব্যবস্থা যদি না হইয়া থাকে, তবে দোকান হইতে গরম পুরী ইত্যাদি আনাইয়া দিই।" বলা বাহুল্য, দোকানের পুরী আমরা খাই না, এ-কথা শুনিয়া তিনি যেন আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন! সাধারণতঃ যাত্রীরা এ-স্থানে অত্যধিক শীত-নিবন্ধন রান্না ইত্যাদির ঝঞ্ঝাটে আদৌ যাওয়া পছন্দ করেন না। শীতের দরুণ "টেম্পারেচার্" সে-দিনে ৪০ ডিগ্রী (বড় কম ঠাণ্ডা নহে!) পর্য্যন্ত নামিয়াছে শুনিলাম। বলা বাহুল্য, আমরা রামবাড়া হইতেই মধ্যাহ্নের 'পাপক্ষয়' সারিয়া আসিয়াছিলাম। এজন্য সময় নষ্ট না করিয়া সকলেই এ-স্থানের আশ-পাশ সমস্তই দেখিয়া লইবার জন্য বাহির হইলাম।

যাত্রীর জন্য বহু ধর্ম্মশালা ও "যাত্রি-নিবাস" দৃষ্ট হইল। একা কালী কম্‌লীওয়ালারই তিনটি—তাহা ছাড়া গোয়ালিয়র, বিকানীর, পঞ্জাব কানপুর, ইটোয়া, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশের রাজা, মহারাজা, জমিদার শেঠগণেরও অনেকগুলি ধর্ম্মশালা বিদ্যমান। "রামপুর দরবার" সিমলা ডিষ্ট্রীক্ট বিশহর ষ্টেটের মহারাজা পদ্ম সিং সাহেব বাহাদুর সি, এস,

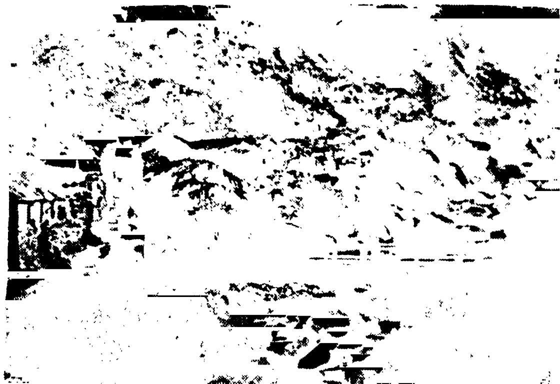
৭ম পর্ব্ব—



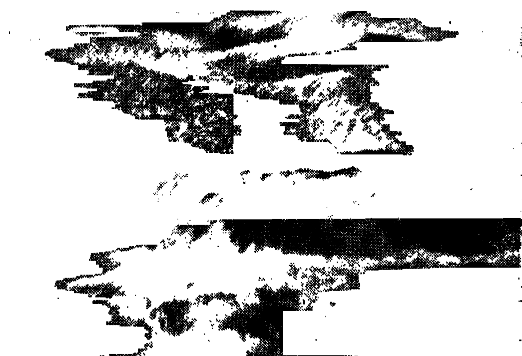
গৌরীকুণ্ড—গরম জলের প্রবাহ



৭ম পর্ব্ব—



কাষ্ঠনির্ম্মিত সেতু—গৌরীকুণ্ড



বরফের মধ্যে মন্দাকিনী

াই, মহোদয় আজ তিন বৎসর হইল প্রায় ৩৫ হাজার টাকা ব্যয়ে াত্রীদিগের জন্য সুন্দর বিশ্রামাগার তৈয়ার করিয়া দিয়াছেন। বাঙ্গালীর ধ্যে হাওড়া পঞ্চাননতলা-নিবাসী উমেশচন্দ্র দাসের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ তাঁহার ুত্রগণের দ্বারা নির্ম্মিত "উমেশ-নিবাস" উল্লেখযোগ্য। ময়মনসিংহ ুক্তাগাছার "রাণী বিদ্যাময়ীর" কীর্ত্তিস্বরূপ চারিখানি ঘরসংযুক্ত একটি দ্বিতল ধর্ম্মশালার সংস্কারাভাবে যেরূপ অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা দেখিলে চিত্ত স্বতঃই ব্যথিত হইয়া উঠে। কর্ত্তৃপক্ষের সে দিকে একটু ষ্টিপাত বাঞ্ছনীয় মনে হয়। পাকা ধর্ম্মশালা ব্যতীত ছপ্পরযুক্ত বহু র্মশালাও দেখা গেল। পোষ্ট আফিস, তার-ঘর বিদ্যমান দেখিয়া ন্ধু-পত্নীর নিরাপদে কেদারতীর্থে উপস্থিতির সংবাদ বন্ধু মহাশয়কে ানাইয়া দিলাম। শুনিলাম, এ তার "গুপ্তকাশী" হইয়া যথাস্থানে াইবে। আমরাও নিজ নিজ ঘরে পত্র দিতে ভুলিলাম না।

জিনিষ-পত্রও এখানে যথেষ্ট মহার্ঘ। ঘৃত, আটা, চিনি ও আলু প্রতি সেরে যথাক্রমে তিন টাকা, ছয় আনা, এক টাকা ও আট আনা মাত্র।

এই কেদার-তীর্থের আশ-পাশ কিছু দূর ব্যাপিয়া চতুর্দ্দিকেই কেবল অগণিত তীর্থরাজি বিরাজ করিতেছে। কিন্তু তুষার না কমিলে সেগুলি দেখিবার উপায় নাই। পাণ্ডা বলিলেন, সেই শ্রাবণ মাস ভিন্ন এ তুষার কমিবে না। উত্তর-তরফ হইতে মন্দিরের পশ্চিমদিকে 'মন্দাকিনী' নদী কুলু-কুলু নিনাদে নীচের দিকে বহিয়া চলিয়াছেন। দু'ধারেই শুভ্র উজ্জ্বল স্তূপীকৃত তুষাররাশি ইহাকে অধিকতর মহিমামণ্ডিত রাখিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শুনিলাম, মন্দিরের উত্তরদিকে ঐ তুষার-পর্ব্বত সাড়ে চারি মাইল আন্দাজ অতিক্রম করিতে পারিলে, পাহাড়ের উপরে এক অতি সুন্দর তাল বা সরোবর (নাম "চোরাবাড়ী তাল") দেখা যায়। সেখান হইতেই এই মন্দাকিনীর উৎপত্তি। ঐ চোরাবাড়ীর তালের

পূর্ব্বদিকে "ব্রহ্মগুহা" আছে। শ্রাবণ মাসে যখন ওখানে যাওয়া চলে, গুহামধ্যে গুচ্ছ-গুচ্ছ যব-গাছ দৃষ্ট হয়, তাহার শস্য অর্থাৎ যব টিপিলে উহা হইতে আবার 'বিভূতি' বাহির হইয়া থাকে।

এই উত্তরদিক্ হইতে "স্বর্গ-দ্বারী" নদী আসিয়া আবার মন্দাকিনীর সহিত সম্মিলিত। সেখানে পিতৃপুরুষগণের পিণ্ডদান-প্রথা আছে। বাল্যকালে "অমরকোষে" অভ্যাস করিতাম, "মন্দাকিনী বিয়দ্গঙ্গা স্বর্নদী সুর-দীর্ঘিকা।" এই মন্দাকিনী স্বর্গেরই নদীর এক নামান্তর মাত্র। আজ এই অমল-ধবল তুষারবেষ্টিত হিমালয়ের তুঙ্গশৃঙ্গে অবস্থিত মন্দাকিনীকে স্বর্গের ধারাই মনে করিয়া শ্রদ্ধানতচিত্তে সকলেই বার বার স্পর্শ করিয়া ধন্য হইলাম। মন্দিরের পূর্ব্বদিক্ হইতে আগত আবার "সরস্বতী" নদী দক্ষিণাভিমুখী হইয়া এই মন্দাকিনীর সহিত মিলিত হইয়াছে। সেখানে "হংস-কুণ্ড" নামে একটি ছোট কুণ্ড দেখা যায়। তাহাতেও পিতৃপুরুষগণের পিণ্ড দেওয়া হয় এবং মৃতব্যক্তির জন্মকুণ্ডলী ডুবাইয়া দিবার বিধি আছে।

পশ্চিমদিকের পাহাড় হইতে "দুধ-গঙ্গা" নামিয়া আসিতেছেন। শুনিলাম, ঐ পাহাড়ের দুই তিন মাইল আগে গেলে সেখানেও "বাসুকি-তাল" নামক একটি তাল আছে। সেখান হইতেই এই দুধ-গঙ্গার উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বদিকে "রেতঃ-কুণ্ড" নামে আরও একটি কুণ্ড আছে শুনিয়া তদ্দিকে ধাবিত হইলাম।

কিন্তু সে দিকের পথও তখন সম্পূর্ণ তুষার-ঢাকা দেখিয়া, আমরা সকলেই কুণ্ডদর্শনে নিরস্ত হইলাম। পাণ্ডা বলিল, এ কুণ্ডের জলের নিকটে গিয়া "বম্ বম্" বলিলেই জলের মধ্যে আপনা হইতেই বুদ্ বুদ্ উঠিতে থাকে। বৈজ্ঞানিকগণ ইহাতে শব্দের সহিত কোন সংযোগ আছে বলিয়াই সম্ভবতঃ মনে করিতে পারেন। ইহারই দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে পাহাড়ের শৃঙ্গদেশে এক ভৈরবমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে সকলেই বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। আমাদের শীত-নিবারণের জন্য পাণ্ডা মহাশয় অযাচিতভাবে সাতখানি (সাত জনের ব্যবহারের নিমিত্ত) কম্বল পাঠাইয়া দিয়া, আমাদের অধিকতর আরামের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। বলা বাহুল্য, এই হিম-শীতল তুষার-তীর্থে কালী কম্বলীওয়ালার এই সুব্যবস্থা সকল যাত্রীকেই যেন চমক লাগাইয়া দিয়াছে।

বাসায় ফিরিয়া ফতে সিং ডাণ্ডিওয়ালা ও কর্ণ সিং বোঝাওয়ালা কুলী-গণের এই কেদার-তীর্থের পৌছানর দরুণ চতুর্থ ধাম হিসাবে প্রাপ্য "ইনাম" "খিচুড়ী" প্রভৃতির (পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধাম হিসাবে দেওয়ার মত) চুক্তি দেওয়া হইল। অবশ্য জিনিষ-পত্রের মহার্ঘতা নিবন্ধন 'খিচুড়ীতে' প্রত্যেক কুলী পিছু কিছু বেশী স্বীকার করিতেই হইল।

অষ্টম পর্ব্ব

চতুর্থ ধাম—কেদারনাথ

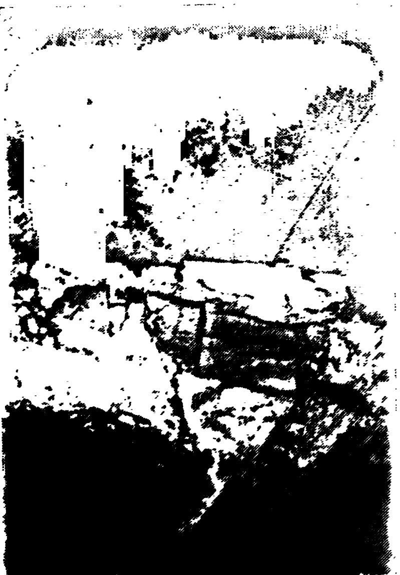
পরদিন ১৬ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার যথাসম্ভব প্রাতঃকালে উঠিয়া, প্রথমেই মন্দাকিনীর পবিত্র শীতল ধারায় আচমন-স্পর্শাদি করিতে আমরা তীরে উপস্থিত হইলাম। সেখানেই সন্ধ্যা-বন্দনাদি শেষ করিয়া লওয়া হইল তার পর পাণ্ডা সমভিব্যাহারে এইবার কেদার-দর্শনে সকলেই একে একে মন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। প্রস্তরনির্ম্মিত সুশোভন মন্দির, মন্দিরের বামদিকে হানুমানজী, দক্ষিণে পরশুরাম ও মধ্যস্থলে সম্মুখেই বিঘ্ন-বিনাশন গণেশজীর মূর্ত্তি শোভা পাইতেছে। ভিতরভাগে নাতি-প্রশস্ত অঙ্গন অনেকটা নাটমন্দিরেরই মত, তাহারই বামভাগে লক্ষ্মীনারায়ণ, দক্ষিণে পার্ব্বতী, মধ্যস্থলে নন্দীগণ ও বৃষমূর্ত্তি এবং চতুর্দ্দিকেই পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদীর দর্শন করিতে করিতে তুষারনাথ কেদারেশ্বরের সুবৃহৎ জ্যোতির্লিঙ্গের সম্মুখে আসিয়া উপবিষ্ট হইলাম। সে স্মরণীয় শুভমুহূর্ত্তে, নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য আমরা সকলেই যেন আত্মবিস্মৃত হইয়া মনে করিলাম, এই সেই হিম-গিরিশীর্ষ-শোভী তুষারপ্রচ্ছন্ন কেদারতীর্থে সুর-নর-মুনিবন্দিত, জটাজূটধারী ত্র্যম্বকের অবিচল ধ্যানমূর্ত্তি! যাঁহার দর্শনের আশায় রাজ্য, সম্পদ্, আত্মীয়-স্বজন তুচ্ছ করতঃ এক দিন কোন্ অতীতযুগের সেই ধর্ম্মরাজ স্বয়ং যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন প্রভৃতি পঞ্চপাণ্ডব নিরন্তর পথশ্রান্ত, ব্যাকুল নয়নে এই চির-দুর্গম তুষার-পথের পথিক হওয়া লোভনীয় মনে করিয়াছিলেন! কৈ তবে তাঁহার সেই ত্রিনয়ন-শোভিত বিশ্ববিমোহন সদানন্দ দিগম্বর-মূর্ত্তি! ললাটে অর্দ্ধচন্দ্রশোভী,

৮ম পর্ব্ব—



তুঙ্গনাথ

৮ম পর্ব্ব-



গরুড় চটীর আগে যাইতে দড়ির পুল



দুধগঙ্গা নদীর উপরের দৃশ্য—কেদার-তীর্থ

রজতগিরিনিভ, ভস্মাচ্ছাদিত দিব্য তনু—গলে যাঁহার নিরন্তর কাল-ভুজঙ্গম-বেষ্টিত উন্নত-ফণার বিস্তৃতি, শিরোদেশে জটা-জাল-বিহারিণী মন্দাকিনীর পবিত্র ধারা! সেই ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত-কটি, বিভূতি-ভূষণ, দেবাদিদেব মহাদেবের সদা-সৌম্য মধুর মূরতি কি এই মহামহিম জ্যোতির্লিঙ্গমধ্যেই লুক্কায়িত রহিয়াছে? ধ্যানস্তিমিতনেত্রে সকল যাত্রীই এখানে যথাশক্তি পূজা করিতে ব্যস্ত। যেন কত প্রাণপাত পরিশ্রমেই এই প্রাণাধিক পূজার মূর্ত্তিকে নিকটে দেখিতে পাইয়াছে! তীর্থযাত্রার সকল সাধনাই যে এখানে সফল ও সম্পূর্ণ! যুগ-যুগান্তরব্যাপী এই মহাজন-প্রদর্শিত মুক্তি-পথের বিরাট জ্যোতির্ম্মূর্ত্তির অন্তরালে হিন্দুধর্ম্মের কতই না ভাব, ভক্তি, পূজা ও প্রেমের বিকাশ আছে, কে তাহা অন্তরের সহিত স্বীকার না করে? আস্তিক দূরের কথা, অতি বড় নাস্তিকও যেন এ স্থানের মহিমায় স্বতঃই আকৃষ্ট হইয়া উঠে। সকলেই স্ব স্ব শক্তি অনুসারে পূজার্চ্চনা শেষ করিলাম। পাণ্ডা ঠাকুর এই সুবৃহৎ জ্যোতির্লিঙ্গ সম্বন্ধে কত কথাই বর্ণনা করিলেন। "শিবমূর্ত্তি না দেখিয়া এইখানে ভীম গদা মারেন," "এইখানে একটি ছিদ্র" "লিঙ্গের উত্তর দিক্ মহিষের পুচ্ছাকৃতিবিশিষ্ট" "সম্মুখেই ত্রিভুজাকৃতি শক্তিযন্ত্র" "এই স্থানে পদ্ম" ইত্যাদি অনেক কিছুই পুরাতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ভিড়ের মধ্যে সে সকল কথায় কাণ দিবার আদৌ প্রয়োজন মনে হয় নাই। এ সম্বন্ধে একমাত্র উত্তরাখণ্ডে বর্ণিত সুবিশাল কেদার-তীর্থের মাহাত্ম্য সকলেরই দৃষ্টিতে অতুলনীয়। বাসায় ফিরিয়া আসিয়া এইবার আমরা পাণ্ডাঠাকুরকে বিদায় দিতে ব্যস্ত হইলাম।

'পূজা,' 'দক্ষিণা,' 'সুফল,' ইত্যাদি যথাশক্তি প্রদান করিলে পাণ্ডা ঠাকুর সকলকেই সন্তুষ্টচিত্তে (?) আশীর্ব্বাদ করিলেন। তার পর তাঁহার পূর্ব্ব-নিযুক্ত 'ছড়িদার' ভগবান্ সিংহকে নিকটে ডাকিয়া আমাদিগের

যাত্রাপথের শেষ পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবার জন্য আদেশ দিলেন। আমাদের কষ্টের লাঘবতা হেতুই অযাচিতভাবে তাঁহার এই সঙ্গে দেওয়া লোকটিকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সঙ্গে লইতে বাধ্য হইলাম।

চতুর্থ ধাম—কেদারনাথ হইতে বেলা দশটায় নামিতে আরম্ভ করিয়া উৎরাই-পথে এ দিন গৌরীকুণ্ডে আসিয়াই রাত্রিযাপন করিলাম। পরদিন গৌরীকুণ্ড হইতে বাসুকি-গঙ্গার পুল পর্য্যন্ত আমাদের পুরাতন রাস্তা দ্রুত অতিক্রম করিয়া নূতন পথ রামপুরের দিকে সকলেই অগ্রসর হইলাম। গৌরীকুণ্ড হইতে ইহার দূরত্ব পাঁচ মাইল মাত্র হইবে। এখানে বিস্তর দোকান ও চটী। কালী কমলীওয়ালার একটি দ্বিতল ধর্ম্মশালাও বিদ্যমান। দোকানে দুগ্ধ, দধি কিছুরই অভাব ছিল না। অধিকন্তু এখানে এক নূতন বস্তুর আস্বাদ পাইয়া অনেকেই পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। তাহা আর কিছুই নহে, আমাদের তীর্থ-যাত্রার প্রারম্ভ হইতেই তাম্বুলের আস্বাদ আহারান্তে কোনও দিন জুটে নাই। এত দিন পরে আজ এখান হইতেই প্রথম তাহা কিনিতে পাওয়া গিয়াছিল। বলা বাহুল্য, এ সকল দুর্গম তীর্থ-ভ্রমণে যাত্রীমাত্রেরই ক্রমশঃই যেন অরুচির মাত্রা বাড়িয়া গিয়াছিল। তরকারীর মধ্যে কেবল আলু, ইহা যেন প্রত্যেক যাত্রীরই অসহ্য মনে হইতেছিল। শাকসব্জি খুঁজিতে গিয়া "গিমে শাক," "বেথিয়া শাক;" এমন কি, "ঢেঁকি শাক" (যাহা আমরা দেশে থাকিতে স্পর্শও করি না!) পর্য্যন্তকেও আদরের সহিত আমরা গলাধঃকরণ করিয়াছি; বাঙ্গালীর জিহ্বা আর কতদূরই বা বরদাস্ত করিতে পারে? পাঠক-পাঠিকাগণ হয় ত এজন্য আমাদিগকে নানা রকমে আজ উপহাস করিতে পারেন, কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, আমাদের মত অবস্থায় পতিত হইলে আপনারা এই অবান্তর কথা লিখিতে এতটুকুও লজ্জাবোধ করিতেন কি না সন্দেহ!

রামপুর হইতে আরও প্রায় দুই মাইল আসিয়া এ দিনে "বাদলপুর"

নামক স্থানে রাত্রি কাটাইলাম। পরদিন "গুপ্তকাশী" দেখিয়া উখী মঠ পৌঁছিবার স্থির হয়। "গুপ্তকাশী" যাইতে গেলে প্রায় তিন মাইল পথ অতিরিক্ত ফের পড়ে। কুলীগণ এজন্য সোজাসুজি উখী মঠে মাল লইয়া উপস্থিত থাকিবে, এইরূপ প্রস্তাব করায় আমরা তাহাতে অ-রাজী হই নাই। বাদলপুর হইতে গুপ্তকাশীর দূরত্ব প্রায় ১০৷৷০ মাইল এবং সেখান হইতে আরও ২৷৷০ আড়াই মাইল যাইতে পারিলেই উখী মঠ পৌঁছিতে পারিব, এই মনে করিয়া উহাদিগকে পূর্ব্বেই ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। প্রত্যূষে বাহির হইয়া প্রায় পাঁচ মাইল দূরে মেখণ্ডাতে "মহিষমর্দ্দিনী" দেবী দর্শন করিয়া মন্দাকিনীর তীরে তীরে যখন আগে আসিতেছিলাম, তখন নদীর পরপারে জঙ্গলের পার্শ্বে হঠাৎ একটি বৃহদাকার কৃষ্ণবর্ণ ভল্লুক দর্শনে অনেক যাত্রীই বিলক্ষণ ভয়চকিতনেত্রে এ পারের পথে দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল। ভল্লুকের কিন্তু এ ব্যাপারে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ ছিল না। কিয়ৎকালমধ্যেই সে জঙ্গলের মধ্যে ধীর-গমনে অদৃশ্য হইয়া যায়। "ছুনা-বেকল-পঙরানার" ভীষণতম জঙ্গলে (যেখানে আমরা ভিন্ন অপর কোন যাত্রীই উপস্থিত ছিল না) এইরূপ বৃহদাকার জন্তুর হঠাৎ আবির্ভাব দেখিলে নিশ্চয়ই শিহরিয়া উঠিতাম। মেখণ্ডা হইতে "বুঙ্গমলা" এবং বুঙ্গমলা হইতে ক্রমশঃ "ভেতা"য় আসিয়া পৌঁছিতে এইবার অনেকগুলি মন্দির দৃষ্ট হইল। একদিকে সত্যনারায়ণজী, পঞ্চপাণ্ডবগণের প্রস্তরমূর্ত্তি ও বীরভদ্র মহাদেবের মূর্ত্তি এবং অপরদিকে আর এক মন্দিরে গরুড়জীর উপরে বসিয়া স্বয়ং শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী নারায়ণ ও তৎপার্শ্বে লক্ষ্মীদেবী। উপরে নবগ্রহ, পঞ্চপাণ্ডব এবং দক্ষিণভাগে মাথাকাটা গণেশজী, নীচে জয়া-বিজয়া প্রভৃতি দ্বারপাল, তৎপার্শ্বে "ভদ্রকুণ্ড" এতদ্ব্যতিরিক্ত নয়টি মন্দিরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ভগবতী, "গৌরীশঙ্কর" প্রভৃতি অসংখ্য দেব-দেবীর মূর্ত্তি দেখিয়া বাস্তবিকই বিস্মিত হইতে

হয়। একটি কুণ্ডের সম্মুখে এখানে আর একটি শিবলিঙ্গ উত্তর-দক্ষিণে লম্বা। শুনিলাম, ভস্মাসুরকে শিবজী এইখানেই বধ করিয়াছিলেন ইত্যাদি দর্শন করিয়া আমাদের কেবল ইহাই মনে হইতেছিল, কয়জনেই বা জনবিরল সুদূর পার্ব্বত্য-পথের এই ভেত্তাচটীর দেব-দেবীর সন্ধান রাখিতে পারেন? ভেতাচটী হইতে এক মাইল দূরে "নালাচ" চটী আসিয়া দুইটি পথের সম্মুখে পড়িলাম। একটি উপর দিকে গুপ্তকাশীর পথ এবং অপরটি উৎরাই পথে উখী-মঠ অভিমুখে নামিয়া গিয়াছে। এ স্থানে প্রস্তরগাত্রে লিখিত আছে, বদরীনাথ ৭৭ মাইল, কেদারনাথ ২৩ মাইল মাত্র। সুতরাং কেদারনাথ হইতে বদরীনাথ প্রায় ১০০ মাইল হইতেছে। আমরা উপরের পথে গুপ্তকাশীর দিকে অগ্রসর হইলাম। পথের ধারে ধারে পাহাড়ী বালক-বালিকারা দু' একটি পয়সার লোভে কত রকমেই না সুর ধরিয়াছিল। "পৌন কী জগঝোর বরফ কী হিমালয়" "জয় মুনি কেদারনাথ, অব দর্শন দেও" "বদরীবিশাল লাল গৌরী হরগঙ্গে" ইত্যাদি গানগুলি ইহাদের মুখে শুনিতে বেশ নূতন ও মধুর লাগে সন্দেহ নাই। কোন কোন পাহাড়ী ভিক্ষুক আবার ঢোলক বাজাইয়া সুফল যাত্রার কথা উল্লেখ করিয়া ভিক্ষা চাহিয়া থাকে।

পাহাড়ের উপরের "গুপ্তকাশীর" ঘরবাড়ীগুলি বেশ 'ঝক্ঝকে' ও সুন্দর। দূর হইতে দেখিতে ইহা ঠিক যেন একখানি ছবির মত। বিশ্বনাথের মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া একবার চারিদিক্ চাহিয়া দেখিলাম। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে প্রায় পাকা ইমারত দ্বারা এক প্রকার বেষ্টিত। সম্মুখস্থ প্রবেশদ্বারের পার্শ্বেই দোকান-ঘর, তাহাতে কিছু কিছু মনিহারী দ্রব্যাদি হইতে মুদিখানার দ্রব্যাদি প্রায় সমস্তই বিক্রয়ার্থ সজ্জিত রহিয়াছে। সে সময়ে নেবুর রসে ভিজানো আদা, লঙ্কা প্রভৃতি আচার দেখিয়া আমরা এই আচারের লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। জিহ্বাকে অরুচির পথ

হইতে নিবৃত্ত করিবার ইহাই তখন যেন মহৌষধি বলিয়াই মনে হইয়াছিল। সাধারণতঃ এ সকল দেশে সে সময়ে আলু ছাড়া বড় একটা তরকারী ছিল না। তাই বোধ হয়, রাশি রাশি শুষ্ক ঢেঁড়স (বলিতে লজ্জা নাই) কাটা অবস্থায় বিক্রয় হইতেছিল। এই অভিনব শুষ্ক পদার্থ তরকারীর জন্য দু এক পয়সা খরিদ করাও হইল : কিন্তু দুঃখের কথা বলিতে কি, উখী মঠে ইহা রন্ধন করিতে গিয়া মেয়েদের নিকটে কেবল হাস্যাস্পদই হইয়াছিলাম। মন্দিরপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া সম্মুখেই দেখিলাম, "মণি-কর্ণিকা-কুণ্ড।" কুণ্ডমধ্যে হস্তিমুখ দিয়া যমুনা ও গোমুখ দিয়া গঙ্গার স্বচ্ছ প্রস্রবণ অবিরাম বিনির্গত হইতেছে এই কুণ্ডে যাত্রিগণ যথাবিধি সঙ্কল্প পূর্ব্বক স্নান করতঃ মন্দিরে দর্শন ও পূজাদি করিয়া থাকেন। মন্দির দুইটি। একটিতে শ্রীশ্রী৺বিশ্বনাথের জ্যোতির্ম্ময় লিঙ্গমূর্ত্তি। মন্দির-গাত্রে উপরিভাগে আবার গঙ্গা ও পার্ব্বতীর মূর্ত্তিও বিরাজমান এবং ইহারই সংলগ্ন উত্তরদিকের আর একটি মন্দিরে শ্বেত-প্রস্তরনির্ম্মিত গৌরী-শঙ্করের মূর্ত্তি। মূর্ত্তিটি অর্দ্ধনারীশ্বররূপে সুন্দর শোভা পাইতেছে। দেখিলেই নয়নযুগল স্বতঃই আকৃষ্ট হয়। একই মূর্ত্তির এক দিকে যেমন জটা, ত্রিশূল ও ডমরু,—অন্যদিকে অর্থাৎ বামে সেই মূর্ত্তিরই হস্তে আবার কমল, পুস্তক ইত্যাদি দর্শনে সকল যাত্রীকেই চমৎকৃত হইতে হয়। মূর্ত্তিটির পায়ের দিকে দেখিলেও দক্ষিণ পদ শিবের ও বাম পদ গৌরীর বলিয়াই যেন ভ্রম হইতে থাকে। একই মূর্ত্তির এইভাবে দুই দিকে দুই রূপে প্রকাশ, শিল্পিহস্তের অদ্ভুত নৈপুণ্যের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। স্নান ও দর্শনকালে পাণ্ডাদিগেরও কিছু কিছু উৎপাত আছে। "গুপ্তকাশীতে গুপ্তদানে অধিক মাহাত্ম্য" প্রকাশ্যভাবে এ কথাটাও ইহারা উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হয়েন না। স্ব স্ব শক্তি অনুসারে আমরা দর্শন-পূজাদি শেষ করিয়া লইলাম এবং ত্বরিতগতি পুনরায় "উখী মঠ" অভিমুখে ধাবিত হইলাম।

পথে যাইতে যাইতে দু'জন পত্রবাহককে (mail-runner) দৌড়াইয়া যাইতে দেখিলাম। এক জনের হস্তে একটি ঘণ্টা-বাঁধা ক্ষুদ্র যষ্টি। এই এই সকল পার্ব্বত্য-পথ—যেখানে যান-বাহন চলে না, তথায় এক স্থান হইতে আর এক স্থান পর্য্যন্ত ইহারা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এইভাবে ডাক বহিয়া লইয়া যায়। গুপ্তকাশী হইতে উখীমঠ যাইতে গেলে সোজাসুজি পাকদাণ্ডি ধরিয়া প্রায় এক মাইল উৎরাই পথে নামিয়া মন্দাকিনীর পুল পার হইতে হয়। তার পর প্রায় দুই মাইল ক্রমিক চড়াই আমরা বেলা বারোটা আন্দাজ সময়ে উখীমঠে পৌঁছিলাম। কুলীগণ বোঝা নামাইয়া তাহাদের নিজের ভোজনকার্য্যেই ব্যস্ত ছিল। আমরা দর্শনের আশায় একেবারে মন্দিরসমক্ষে উপস্থিত হইলাম। শিবভক্ত "বাণাসুরের" বাড়ী বলিয়া এ স্থানের চির-প্রসিদ্ধি চলিয়া আসিতেছে। মন্দিরসম্মুখে প্রকাণ্ড অঙ্গন। কবে কোন্ যুগে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধদেব গান্ধর্ব্ব-বিধানে এ স্থানে উক্ত বাণরাজার কন্যা উষাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, সেই প্রচীন পবিত্র স্মৃতি মরজগতের মানুষকে আনন্দে কতই না উদ্বেল করিয়া তুলে! অদ্যাবধি সেই বিবাহের "ছাউনিতলা" (?) পাণ্ডারা দেখাইয়া থাকে। মন্দিরে প্রবেশ করিতে গেলে বহির্দ্দালানে প্রথমেই বামদিকে অনিরুদ্ধদেবের মূর্ত্তি, পার্শ্বে তুঙ্গনাথ, রুদ্রনাথ ও কেদারের ভোগমূর্ত্তি ও গৌরীমূর্ত্তি, তৎপার্শ্বে আবার রামলক্ষ্মণ-সীতার মূর্ত্তি ও সম্মুখে বৃষমূর্ত্তি প্রভৃতি অষ্টধাতুনির্ম্মিত সুশোভন মূর্ত্তিগুলির উপরে পর পর নজর পড়ে। গোপাল আদর করিয়া নিজহস্তে বৃষকে কি একটা ফল খাওয়াইতেছেন, এ আদরের মূলে কতই না পবিত্র মধুরভাব নিহিত আছে! মন্দির-দ্বারের বামদিকে অন্নপূর্ণা ও গণেশ ও দক্ষিণে "আকাশ" দেবী ও গরুড়ের ক্ষোদিত প্রস্তরমূর্ত্তি দর্শন করিয়া আমরা মন্দিরের মধ্যস্থলের সেই প্রকাণ্ড জ্যোতির্লিঙ্গ "ওঙ্কারেশ্বর" মূর্ত্তি দর্শন করিলাম। ইহারই

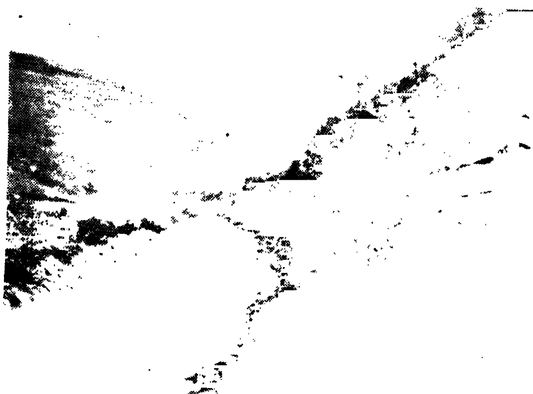
চারিধারে পাণ্ডাগণ আবার মহাদেবেরই চারিটি মুখ ও মস্তকে এক মুখ এই পঞ্চমুখ (তিনটি রজতময় ও দুইটি স্বর্ণময়) শোভিত করিয়া "পঞ্চবক্তে,র" অসীম মহিমা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এই সুবৃহৎ জ্যোতির্লিঙ্গের পার্শ্বদেশে সূর্য্যবংশীয় রাজা মান্ধাতা করজোড়ে এই দেবাদিব মহাদেবের ধ্যানমগ্ন অবস্থায় সমাসীন—চিরতপঃপূত হিমগিরির এই নির্জ্জন মন্দির-মধ্যে ত্র্যম্বককে সম্মুখে পাইয়া তিনি যেন একবারেই ধীর, স্থির, অবিচলিত-চিত্ত! চিরমৌনীর মত অনন্ত যুগ হইতে একভাবে আপনার আসন বিছাইয়া বসিয়া আছেন। শুনিলাম, ছয়মাসকাল যখন তুষারমধ্যে কেদারের পথ বন্ধ থাকে, সে সময়ে এখানেই তাঁহার পূজা-কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। অন্য প্রকোষ্ঠে কেদারনাথের গদি এবং উত্তরদিকের বাহিরের আর একটি ঘরে ঊষা, চিত্রলেখা ও সত্যনারায়ণজীর মূর্ত্তি প্রভৃতি দর্শন শেষ করিয়া আমরা বেলা দুইটা আন্দাজ সময়ে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

এখানে চটী ও দোকানের অভাব ছিল না। কালী কমলীওয়ালার তরফ হইতে 'সদাব্রতের'ও ব্যবস্থা রহিয়াছে দেখিলাম। দোকানে চাউল, চিনি, আটা, ঘৃত হইতে সকল জিনিষই পাওয়া গেল। অধিকন্তু সে সময়ে শাক, কচু ও বাঁধাকপি পর্য্যন্ত তরকারী জুটিয়াছিল। প্রতি সের উৎকৃষ্ট চাউলের দর দশ আনা, ঘৃত দুই টাকা, আলু পাঁচ আনা এবং মিছরী বারো আনা মাত্র।

পরদিন প্রভাতে উখীমঠ হইতে আগে চলিলাম। পাঁচ মাইল দূরে আসিয়া "দুর্গা" চটীতে ৫।৭ খানি দোকান-ঘর দেখা গেল। এ স্থানে 'তুঙ্গনাথ' হইতে নামিয়া "আকাশ-গঙ্গা" পূর্ব্বদিক্ হইতে পশ্চিম-গামিনী বহিয়া চলিয়াছেন। এই পাঁচ মাইল পথ আসিতে মধ্যে আরও তিনটি চটী ("জয়া" "গণেশ চটী" ও "সিরসোলী") অতিক্রম করিয়াছি। দুর্গা

চটীতে আকাশগঙ্গা নদীর পুল পার হইয়া এইবার ক্রমিক চড়াই পথে এক মাইল বাদে "দোয়েড়া" চটী, তার পর আড়াই মাইল আগে "পোথীবাসা"য় আসিয়া দিন-গত পাপক্ষয়ের ব্যবস্থা করা হইল। এখানেও চারি পাঁচটি লম্বা লম্বা ছপ্পর ঘর, দোকান প্রভৃতি আছে। আহারান্তে এ দিন বেলা সাড়ে তিনটা আন্দাজ সময়ে বাহির হইয়াছিলাম। আজি-কার পথে কেবলই চড়াই এবং নানাবিধ বৃক্ষলতা-গুল্মের আচ্ছাদন থাকায় দিনের বেলায় বেশ অন্ধকার মনে হইতেছিল। তার উপর অল্পদূর যাইতে না যাইতেই বৃষ্টির উৎপাতে আমরা "দোগলভিটা"র চটীতে রাত্রি-যাপন করিতে বাধ্য হইলাম।

পরদিন প্রত্যূষে আগের পথে "চোপ্‌তা" হইতে আমরা "তুঙ্গনাথ" দর্শনে ইচ্ছুক হইলাম। যাঁহারা তুঙ্গনাথ যাইতে না চাহেন, চোপতা হইতে তাঁহারা দক্ষিণভাগের সড়ক ধরিয়া সোজাসুজি এক মাইল আগে "ভুলোকনা"য় আসিয়া উপস্থিত হয়েন। তুঙ্গনাথদর্শনেচ্ছু যাত্রিগণের পূর্ব্বাভিমুখী স্বতন্ত্র পথ। প্রায় তিন মাইল চড়াই ভাঙ্গিয়া যাইতে হয়। অগত্যা এই অতিরিক্ত পথের জন্য ডাণ্ডিবাহক প্রত্যেকেই পৃথক্ ভাড়া চাহিয়া বসিল। অতিরিক্ত তিন টাকা (প্রতি ডাণ্ডি) মজুরী স্বীকারে বন্ধুপত্নী ও জ্ঞাতিপত্নী সহযাত্রিণীদ্বয়ের যাইবার ব্যবস্থা হইল। কেবল দাদা, বৌদিদি, বৃদ্ধা-দিদি, আমি ও সুরো চাকর যথারীতি পূর্ব্ববৎ পদ-ব্রজেই উপরে উঠিতে লাগিলাম। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে এই চড়াই-পথ উঠা-নামা করা যাত্রীদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর ছিল। "ওঙ্কারমল জাঠিয়া" ও "শিবপ্রসাদ" প্রভৃতি কলিকাতাস্থ ধনী মাড়োয়ারীসম্প্রদায় সকলেই একত্র হইয়া ইহাকে রাস্তায় পরিণত করিবার জন্য সরকারের হস্তে প্রায় ৩৬ হাজার টাকা অর্পণ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ৬ হাজার টাকা সুদে প্রতি বৎসর রাস্তা মেরামতের জন্য রাখিয়া দিয়া বাকী ত্রিশ হাজার টাকা



গুপ্তকাশীর নীচে মন্দাকিনী



ডাকবহনকারী (উখী-মঠের নিকাট)

৮ম পর্ব্ব—



অর্দ্ধবৃত্তাকার তুষার — কেদারের সন্নিকটে

ব্যয়ে এই তুঙ্গনাথের রাস্তা তৈয়ার করা হইয়াছে। সুতরাং এই চড়াই-পথ পূর্ব্বাপেক্ষা সুগম হইয়াছে সন্দেহ নাই।

তুঙ্গনাথে "আকাশ-গঙ্গা" ফেনায়িত তুষারপুঞ্জের মধ্য দিয়া প্রবাহিতা হইতেছেন। "অমৃতকুণ্ডে"র মধ্যে ইহার তুষার-শীতল প্রবাহধারায় স্নানের বিধি। শুনিলাম, এই তুঙ্গনাথের উপরে আরও উচ্চে "চন্দ্রশেখর" পর্ব্বত হইতেই আকাশ-গঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছে। সাধারণতঃ যাত্রীরা সে স্থানে যাইতে অক্ষম। শাস্ত্রে আকাশ-গঙ্গায় স্নান ও তুঙ্গনাথ দর্শনের অশেষ মাহাত্ম্য উল্লিখিত আছে—

তুঙ্গক্ষেত্রস্য দ্রষ্টার একবারেঽপি যে নরাঃ।
মৃতাঃ ক্বচিৎ প্রদেশেঽপি প্রাপ্নুয়ুঃ পরমাং গতিম্॥

*　　　　*　　　　*

"যস্যা জলকণেনাপি দেহলগ্নেন সুন্দরি!
কৃতকৃত্যো ভবেন্মর্ত্ত্যো মজ্জনাৎ কিং নু পার্ব্বতি॥"

ইত্যাদি বচনই ইহার যথেষ্ট প্রমাণ।

এই আকাশ-গঙ্গায় যাত্রিগণ পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে পিণ্ডদানও করিয়া থাকেন।

উত্তরাখণ্ডে সাধারণতঃ "পঞ্চ-কেদারের" উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ১। শ্রীশ্রীকেদারনাথ ২। "মধ্যমেশ্বর"—এ স্থান উখীমঠ হইতে ১৩ মাইল উত্তরভাগে অবস্থিত। ৩। এই তুঙ্গনাথ। ৪। "রুদ্রনাথ"—ইহা আগের পথে "মণ্ডল" চটী হইতে প্রায় ছয় মাইল উত্তরে শুনিলাম, এবং পঞ্চম-কেদার হইতেছে "কল্পেশ্বর"—ইহা "গরুড়-গঙ্গা" হইতে আরও আগে "হিলং-কুম্হার" চটীর পাঁচ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। এতদ্ভিন্ন আরও দুইটি কেদার, যথা, "বিল্বকেদার" ও "বুড়াকেদার" বিদ্যমান

আছেন। সুতরাং হিসাবমত সপ্তকেদারই এই হিমাচলক্ষেত্রে বিরাজ করিতেছেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এইভাবে এ অঞ্চলে পাঁচটি 'কাশী'-রও খ্যাতি আছে। প্রথমতঃ "উত্তরকাশী" ও "গুপ্তকাশী," এই দুইটি স্থানের কতক কতক পরিচয় পাঠকবর্গ পাইয়া থাকিবেন। তৃতীয়-কাশী হইতেছে "চন্দ্রশেখর"—এই তুঙ্গনাথেরই আরও উপরে চির-দুর্গম তুষারাচ্ছন্ন শিখরদেশে অবস্থিত। চতুর্থ-কাশী "গোপেশ্বর" আগের পথে "মণ্ডল" চটী হইতে প্রায় ছয় মাইল পূর্ব্বে এবং পঞ্চম-কাশী "পাণ্ডুকেশ্বর"—আগের পথে "বিষ্ণুপ্রয়াগ" হইতে প্রায় ছয় মাইল ব্যবধানে বিরাজ করিতেছে। ফল কথা, অগণিত তীর্থরাজিই হইতেছে এই গগন-চুম্বী তুষার-কিরীটী হিমগিরির বিশেষত্ব। তাই সাধু-সন্ত-যোগি-ঋষিগণের নির্জ্জনে তপস্যা করিবার ইহাই একমাত্র উপযুক্ত স্থান বিবেচিত হইয়াছে।

তুঙ্গ-শৃঙ্গে অবস্থিত তুঙ্গনাথে উঠিবার কালে পাণ্ডাগণ উপর হইতে উত্তরভাগের এক একটি তুষার-শৃঙ্গ দেখাইয়া বলিয়া দিতেছিল—এইটি "কেদারনাথ," অপরটি "বদরীনাথ" এবং দূরের এইটি "গঙ্গোত্রী," এই তিন তীর্থেরই অমল-ধবল রজত-শৃঙ্গ এখান হইতে কেমন শোভা পাইতেছে! বিশেষতঃ বদরীনাথ ও কেদারনাথের শৃঙ্গদেশ দুইটি যেন চোখের অতি নিকটেই মনে হইল। পাণ্ডা বলিল, "উপর হইতে ইহাদের ব্যবধান আড়াই তিন মাইলের বেশী হইবে না, অথচ নীচে পথ ধরিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া যাইতে গেলে কতই না দূর পড়িয়া থাকে।" আকাশ এ দিনে বেশ পরিষ্কার ছিল, তাই প্রভাতের নবোদিত সূর্য্য-কিরণ-সম্পাতে তুষারোজ্জ্বল শৃঙ্গগুলি একের পর আর একটি দেখিতে যেমন স্নিগ্ধ ও নয়নরঞ্জক মনে হইল, অন্যদিকে প্রকৃতি-রাজ্যের এই চির-নূতন দেব-লীলাস্থল হিমগিরির হিমশীর্ষদেশে এখান হইতেই যেন একটি বিরাট চিরন্তন তুষারের স্তর এবং সেই স্তরের মধ্যেই আমাদের যা

কিছু অমূল্য তীর্থরাজি সমস্তই একত্র হইয়া বিরাজ করিতেছে,• এ চিন্তাও মনকে ওতপ্রোতভাবে জানাইয়া দিল। প্রায় তিন মাইল চড়াই উঠিয়া আমরা মন্দিরসমক্ষে উপনীত হইলাম। এত পরিশ্রমেও সকলের তখন বিলক্ষণ শীতানুভব হইতেছিল। "টেম্পারেচার" সে দিন প্রায় ৫০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত নামিয়াছিল শুনিলাম, বড় সহজ ঠাণ্ডা নহে।

মন্দিরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে আমরা পাণ্ডার কথামত প্রথমে পার্শ্বস্থিত কালভৈরব, পার্ব্বতী ও গণেশাদির পূজা শেষ করিলাম। তার পর মন্দিরমধ্যে তুঙ্গনাথের লিঙ্গমূর্ত্তির সমক্ষে দর্শন-পূজাদি শেষ করিতে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইল। দেখিলাম, মন্দিরে লিঙ্গমূর্ত্তি ব্যতীত পঞ্চ কেদারের সুশোভন মূর্ত্তিও বিরাজমান রহিয়াছেন। তবে যাত্রীর ভিড় যথেষ্ট থাকায় আমরা সত্বর পূজাকার্য্য শেষ করিতে বাধ্য হই। এইরূপে বেলা ১০টা আন্দাজ সময়ে আমরা এখান হইতে আবার অন্য পথে নীচে নামিতে সুরু করিলাম। দুই মাইল আন্দাজ নীচে নামিয়া "ভুলোকনা" চটীতে উপস্থিত হইতে প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল সময় লাগিলেও এ দিনে আমরা পর পর আরও সাড়ে তিন মাইল পর্য্যন্ত উৎরাই পথে চলিয়া আসিয়াছি। পরিশ্রান্ত চিত্তে যখন আমরা একে একে "পাণ্ডরবাসায়" আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তখন বেলা প্রায় একটা বাজিয়াছে। কথায় বলে, "পথের বিরাম নাই, কেবল পথিকেই পথ চলিতে ক্লান্তিবোধ করে।' আমরা এক্ষণে যে ভাবে প্রত্যহ চলা-ফেরা করিতেছি, বিশেষতঃ বৃদ্ধা দিদি, বৌদিদি প্রভৃতি যাঁহারা ঘরে থাকিতে যান-বাহন ভিন্ন এক পদও অগ্রসর হইতে চাহেন না, তাঁহাদেরও এই কঠিন পার্ব্বত্য-পথে চড়াই-উৎরাই অগ্রসর হইবার অক্লান্ত শক্তি দেখিয়া বাস্তবিকই বিস্মিত হইবার কথা। এই পাণ্ডরবাসায় পাকা ধর্ম্মশালা, দোকান ইত্যাদি থাকিলেও ভগবান্ সিং ও ফতে সিং ডাণ্ডিওয়ালা

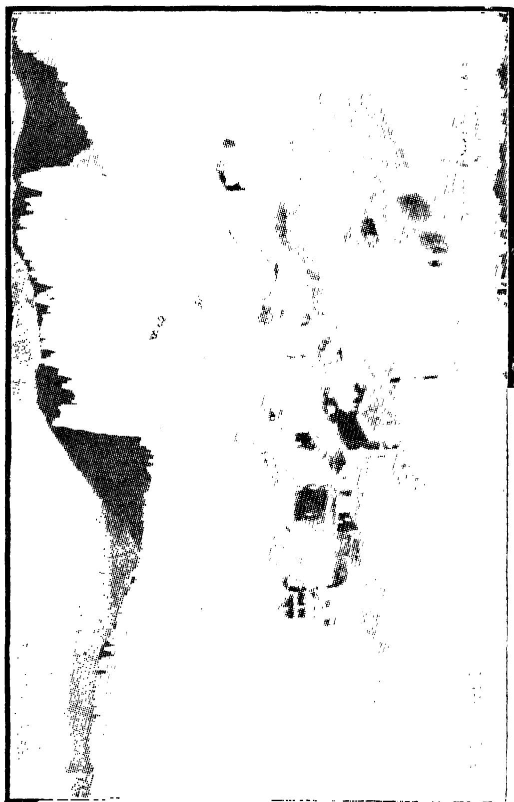
পরামর্শমত এখান হইতে আরও সওয়া তিন মাইল আন্দাজ দূরে "মণ্ডল" চটীতে গিয়া আহারাদি সম্পন্ন করিবার কথা স্থির হইল। তুঙ্গনাথ দর্শনান্তে আমাদের সঙ্গে আনীত কেবল শুষ্ক খাদ্য যথা—বাদাম, কিশমিশ, মিছরী প্রভৃতি মধ্যে মধ্যে চর্ব্বণ ভিন্ন উদরস্থ করিবার আর কিছুই না থাকিলেও, আমরা এখান হইতে বিনা বাধায় আরও আগে অগ্রসর হইতে প্রবৃত্ত হইলাম। এবারকার পথ এক্ষণে ক্রমশঃই যেন নিবিড় হইতে নিবিড়তম জঙ্গলের মধ্যে আসিয়া পড়িল। দিবস দ্বিপ্রহরেও এ স্থান গাঢ় অন্ধকারে মানুষকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে; নানাবিধ ঘন-সন্নিবিষ্ট শৈবাল-পরিপূর্ণ পাহাড়ী বৃক্ষের ছায়ায় ছায়ায় পথ অতিক্রম-কালে চারিদিকেই কেবল নির্জ্জনতা ও ভীষণ নিস্তব্ধতা অনুভব করিতে করিতে আমরা একে একে সকলেই এ দিন বেলা আড়াইটা আন্দাজ সময়ে লোকালয়-মুখরিত "মণ্ডল" চটীতে আসিয়া হাঁফ ছাড়িলাম। সমস্ত পথটিই প্রায় "উৎরাই" পড়িয়াছিল।

এ স্থানটি একবারেই সমতল ভূমির উপরে। রাস্তার দুই ধারেই প্রায় পনেরো ষোলখানি চটী ও দোকানঘর, তাহা ছাড়া কালী-কম্‌লী-ওয়ালার দ্বিতল ধর্ম্মশালার উপরে ও নীচে বড় বড় পাঁচখানি করিয়া মোট দশখানি ঘর ও তৎসংলগ্ন আচ্ছাদনযুক্ত বারান্দা শোভা পাইতেছে। প্রত্যেক ঘরেই ঘরজোড়া সতরঞ্চি, চেয়ার ও খাট প্রভৃতি সুসজ্জিত থাকায় যাত্রিগণ এখানে থাকিতে অধিকতর আরাম বোধ করিয়া থাকেন সন্দেহ নাই। আমরা উপরের একখানি ঘরে আশ্রয় পাইয়াছিলাম। তিন চারি স্থানে পাইপ-সংযোগে জলের সুব্যবস্থাও আছে। আবার সম্মুখেই প্রখর-বাহিনী "বালখিল্য" নদী ঝর ঝর শব্দে অবিরাম বহিয়া যাইতেছেন। জল অতি নির্ম্মল। পাহাড়ের কোলে এইরূপ স্রোতস্বতীকে দেখিতে বড়ই মধুর ও পবিত্র মনে হয়। এখান হইতে

৮ম পর্ব্ব–



৮ম পর্ব্ব—



উখী মঠ

"লাল সাঙা-চমৌলী" মাত্র নয় মাইল এবং চমৌলী হইতে আরও ৩৮ মাইল আগে যাইতে পারিলেই "বদরীনাথ" পৌছিতে পারিব, এইরূপ আশায় আশায় সে দিনকার রাত্রি মণ্ডল চটীতে অবস্থান করিয়া পরদিন প্রত্যূষে আবার যাত্রা করিলাম। সোজা পথে প্রায় ছয় মাইল চলিয়া আসিয়া এ দিন "পঞ্চম-কাশী" "গোপেশ্বরে"র সন্নিকটে "বৈতরণী-কুণ্ডেই" স্নান করিবার কথা ছিল। পথিমধ্যে পর পর তিনটি ছোট ছোট চটী পার হইতে হয়। একটির নাম "আরাম," দ্বিতীয়টি "খুলুটি" এবং শেষেরটি "সুটানা," এই গোপেশ্বরে খুবই জলকষ্ট, একটিমাত্র কূয়া এবং মন্দির হইতে কিছু দূরে নীচে নামিয়া আসিয়া তবে বৈতরিণী-কুণ্ড পড়ে। কুণ্ডমধ্যে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর তিনটি প্রস্রবণ। অগণিত স্বচ্ছন্দ-বিহারী মৎস্যকেও এই কুণ্ডের জলে অবাধে খেলিয়া বেড়াইতে দেখা যায়। এইখানে সঙ্কল্প পূর্ব্বক স্নানাদি শেষ করিয়া আমরা সকলেই একে একে গোপেশ্বর-দর্শনে উপরে আসিলাম। মন্দিরটি খুবই প্রাচীন, কিন্তু বলিতে কি, এ স্থানের লিঙ্গমূর্ত্তিকে ব্রাহ্মণেরও স্পর্শ করিবার অধিকার নাই! পূজারী বলিলেন, "রামেশ্বর" "পশুপতিনাথ" ও "গোপেশ্বর" এই তিন লিঙ্গমূর্ত্তি কাহাকেও স্পর্শ করিতে দেওয়া হয় না। লিঙ্গমূর্ত্তিটিও দেখিতে অতি সুন্দর। বামে গণেশজী এবং দক্ষিণে লক্ষ্মী-নারায়ণজীর মূর্ত্তি ও আকাশভৈরব; সম্মুখে ও পশ্চাৎভাগে পার্ব্বতী, ক্ষেত্রপাল, গরুড়জী প্রভৃতি দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। দূর হইতে পূজা ও প্রণামাদি শেষ করিয়া আমরা গোপেশ্বর হইতে আবার আগে চলিলাম। প্রায় তিন মাইল আসিবার পরে একটু উৎরাইএ নামিয়া এইবার আমরা দ্রুতগামিনী "অলকনন্দার" সুন্দর লৌহপুল পার হইতেই "লাল সাঙা-চমৌলী" আসিয়া উপস্থিত হইলাম। অলকনন্দার জল তখন খুবই কর্দ্দমাক্ত ছিল।

চমোলীতে অনেকগুলি দোকান, কালী কমলীওয়ালার দুইটি পাকা ধর্ম্মশালা, তাহা ছাড়া, হাঁসপাতাল, ডাকঘর, টেলিগ্রাম প্রভৃতি করিবারও সুব্যবস্থা আছে। পাইপ-সংযোগেই জল সরবরাহ হইয়া থাকে। আমরা দ্বিপ্রহরের আহারাদি এ স্থানেই সম্পন্ন করিয়া লইয়া বেলা ৩টা আন্দাজ সময়ে আগে যাত্রা করি। দুই মাইল দূরের "মঠ" চটী দেখিয়া আজ বহুদিন পরেই যেন দেশের কথা স্মরণ হইল। অনেকগুলি আম গাছ (তাহাতে তখন যথেষ্ট কচি আম বর্ত্তমান), পেয়ারা ও লেবুগাছ, কলাগাছ, মূলা প্রভৃতির চাষ হইতেছে দেখিয়া যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময়ে সকলেই অধীর হইলাম; দেশের আব-হাওয়া, ফসল, রুচি প্রভৃতির সহিত যেন এই পাহাড়প্রকৃতির কতক কতক পরিচয় আছে, এতদিনে এখানে আসিয়াই তাহা প্রত্যক্ষ হইল। আনন্দোৎফুল্ল চিত্তে এই সকল দেখিতে দেখিতে আমরা এখান হইতে আরও এক মাইল আগে গিয়া "ছিনকা" চটীর জনৈক দোকানীর দ্বিতল ঘরে আশ্রয় লইলাম।

হিমালয়ের হিম-শীতল প্রদেশে কালো রংএর জীব-জন্তুই বেশী হইবে। আজ কয়েকদিন হইতে এ দিকে কেবল কালো পাখীকেই ইতস্ততঃ উড়িয়া যাইতে দেখিতেছি। এক স্থানে পাহাড়ের গায়ে তেরোটি গরু চরিয়া বেড়াইতেছিল, তন্মধ্যে বারোটির রং কেবলই কালো—রংএর দিক্ দিয়া এ বিশেষত্ব সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

পরদিন প্রত্যুষে দেড় মাইল আন্দাজ আগে গিয়া বাম ভাগের অলকনন্দার সহিত আর একটি নদীকে দক্ষিণদিক্ হইতে মিলিত হইতে দেখিলাম। জিজ্ঞাসায় জানিলাম, উক্ত নদীর নাম "বিরহী-গঙ্গা"; অলকনন্দার কর্দ্দমাক্ত জলের সহিত উক্ত বিরহী-গঙ্গার স্বচ্ছ নীল জল যে স্থানে মিলিত হইয়াছে, সে স্থানটিতে জলের দুই দিকে দুই প্রকার

রং দেখিতে সে সময়ে অপরূপ মনে হইল। বিরহী-গঙ্গার জল নির্ম্মল হইলে কি হইবে, ভগবান্ সিং উক্ত নদী সম্বন্ধে অনেক কিছু প্রবাদ শুনাইল। "উহার উৎপত্তিস্থলে এক সুবৃহৎ 'তাল' আছে। যখনই পাপের প্রবল ভাব উপস্থিত হয়, সে সময়ে উক্ত তাল ছাপাইয়া উঠিয়া প্রবল স্রোতে দুই দিকের পাহাড় প্রকম্পিত করিয়া তোলে, পুল ইত্যাদি সমস্তই ভাঙ্গিয়া দেয়, এ নদী অতি ভয়ঙ্করী ইত্যাদি।" এই সঙ্গমস্থলে আসিয়া আমাদের পথ পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া গিয়াছে।

এ দিনে "গরুড়-গঙ্গায়" আসিয়া আমাদের স্নানাহার সম্পন্নের কথা। ছিন্‌কা হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় দশ মাইল হইবে। এটুকু (?) যাত্রা প্রাতঃকালের দিকে 'নিত্যনৈমিত্তিকের'ই মত। প্রথমে তিন মাইল দূরে "সিয়া" চটী ও তথা হইতে এক মাইল অগ্রসর হইয়া "হাট" চটী পাইলাম। বদরীনাথ এখান হইতেই কিঞ্চিদধিক চল্লিশ মাইল মাত্র পথ ব্যবধান। এ স্থানের পাঁচ ছয়খানি ছপ্পরযুক্ত ঘর অতিক্রম করিয়া একটু আগে আসিতে, উচ্চ স্থানের উপরে এতদিন পরে কতকগুলি বিল্ব-বৃক্ষের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া গেল। বলা বাহুল্য, মসৌরী হইতে আসিবার পথে আজ পর্য্যন্ত এ বৃক্ষ কোথাও দেখি নাই। তার পর অলকনন্দার লৌহসেতু পার হইয়া চড়াই-পথে কিছু দুর চলিয়া আসিবার পর বেলা আটটা আন্দাজ সময়ে "পিপুল-কুঠী" আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখান হইতে গরুড়-গঙ্গা মাত্র ৪ মাইল।

পিপুল-কুঠীতে কয়েকখানি বড় বড় দোকান দেখিলাম। তাহাতে শুধু চাউল, মশলা, সাবান প্রভৃতি নহে, কাপড়, ছাতা, মনিহারী দ্রব্য, বাসন-পত্র, এমন কি, মৃগচর্ম্ম, ব্যাঘ্রচর্ম্ম প্রভৃতি অনেক কিছুই বিক্রয় হইতেছে। গরুড়-গঙ্গায় যে সকল যাত্রী অন্ন-জল-বস্ত্রাদি উৎসর্গ করিতে ইচ্ছুক হয়েন, এখান হইতেই তাঁহারা সংগ্রহ করিয়া লয়েন। আমাদের

মধ্যেও কেহ কেহ উহা খরিদ করিয়া লইতে ভুলিলেন না। জিনিসপত্রের দর অপেক্ষাকৃত মহার্ঘ সন্দেহ নাই। কেবল মৃগচর্ম্ম সুলভ মনে করিয়া আমরা দুই টাকা মূল্যে দুইখানি খরিদ করিয়া সঙ্গে রাখিলাম। এখানে ডাকঘর, তার-বিভাগ, ডাক-বাংলো প্রভৃতি কিছুরই অভাব নাই। ফল কথা, যাত্রীর প্রয়োজনীয় অনেক সুবিধাজনক ব্যবস্থারই সমাবেশ আছে। পাহাড়গুলির দৃশ্য অনেকটা মসৌরী হইতে কিছু আগেকার পথেরই দৃশ্যের মত ঘাসযুক্ত অথচ বৃক্ষহীন।

বেলা দশটা আন্দাজ সময়ে আমরা এ দিনে গরুড়-গঙ্গায় উপস্থিত হইলাম।

"গরুড়-গঙ্গায়" চারি পাঁচটি দোকান। কালী কম্‌লীওয়ালার একটি ধর্ম্মশালা ও তার তরফ হইতে সদাব্রতের ব্যবস্থা আছে। মন্দিরে "গরুড় ভগবান্-মূর্ত্তি" বিরাজমান। নিম্নে স্রোতস্বতী গরুড়-গঙ্গা দক্ষিণ দিক্ হইতে নামিয়া আসিয়া উত্তরাভিমুখী হইয়াছেন। জলটি অতি স্বচ্ছ, যেন একখানি নীল দর্পণ ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। নাতি-গভীর একটি কুণ্ডের মধ্যে এই প্রবাহ-ধারায় যাত্রিগণ সচরাচর স্নান করিয়া থাকেন। প্রবাদ— স্নানকালে যদি কেহ এক ডুবে তল-দেশ হইতে কোন একটি পাথরের নুড়ি তুলিয়া লইয়া বরাবর তাহাকে পূজা করিতে পারেন, তবে তাঁহার আর কোনকালেই সর্প-ভয় থাকে না। এই সর্পভয়নিবারিণী (?) গরুড়-গঙ্গার সুশীতল জলে অবগাহন-স্নান করিয়া সে সময়ে যে সর্ব্বসন্তাপ হইতে আমরা মুক্ত হইয়াছিলাম, তাহা নিঃসন্দেহ। স্নানান্তে পাণ্ডাদের কথামত অন্ন-জল-বস্ত্রাদি উৎসর্গ, দর্শন-পূজাদি শেষ করিয়া আহারাদি ব্যাপারে মনোযোগ দিলাম। দোকানে প্রতি সের পিছু চাউলের দর দশ আনা, ঘৃত আড়াই টাকা, চিনি চৌদ্দ আনা, আটা তিন আনা এবং আলু চারি আনা মাত্র!

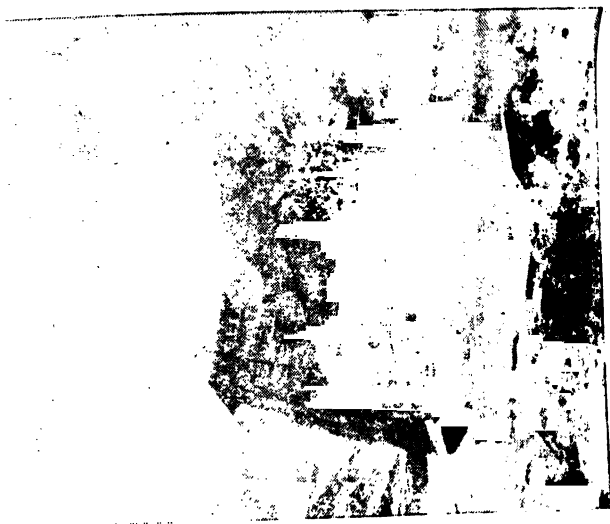
বৈকালে এখান হইতে অলকনন্দার তীরে তীরে দুই মাইল আগে যাইতে "টঙ্গনি"তে উপনীত হইলাম। এখানে ধর্ম্মশালা বা ৪।৫ খানি দোকান-ঘর থাকিলেও অসম্ভব জলকষ্টের জন্য আরও দুই মাইল অগ্রসর হইতে বাধ্য হইলাম। সে দিনের সে চটীর নাম ছিল "পাতাল-গঙ্গা।" শেষের দিকের পথটা কেবলই উৎরাই, যেন নামিতে নামিতে সত্য সত্যই পাতালে পৌঁছিতেছি। সে সময়ে দুই ধারের 'খাড়া' পাহাড়গুলির দৃশ্য শুধু যে ভীষণ, তাহা নহে, স্থানে স্থানে ধ্বস-ভাঙ্গা পাহাড়ের গা দিয়া রাস্তা অতিক্রমকালে আমরা যথেষ্ট বেগ পাইয়াছিলাম। এ সকল সাংঘাতিক পথের সংস্কার-কার্য্যে সরকারের আশু দৃষ্টি অত্যাবশ্যক, এই কথাই কেবল মনকে আলোড়িত করিয়াছিল।

পাতাল-গঙ্গার জল প্রচণ্ডরবে পূর্ব্বদিক্ হইতে ছুটিয়া আসিয়া পশ্চিমে অলকনন্দার সহিত মিলিত হইয়াছে। এখানে সাত আটটি চটী বা দোকানঘর, সুতরাং বিশ্রামের অসুবিধা না থাকাই সম্ভব ; কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, এ দিকে দোকানদারের 'খাঁই' যথেষ্ট। তাহাদের নিজের মনোমত জিনিষ-পত্র না খরিদ করিলেই যাত্রীদের উপরে তাহারা বেশ বিরক্তিভাব পোষণ করিয়া থাকে। এমন কি, বিশ্রামঘরের ভাড়াস্বরূপ স্পষ্টতঃই দক্ষিণা চাহিয়া বসে! দিনের বেলা আহারাদি সম্পন্ন করিতে নানা কারণে যাত্রীদের বিলম্ব হইবারই কথা, এজন্য রাত্রিকালে যদি অক্ষুধা হইয়াছে, তাহা হইলে এ দুরন্ত পার্ব্বত্য শীত-প্রদেশে রাত্রিতে বিশ্রামঘর পাইবার জন্যই দোকানীর নিকট হইতে হয় ত অপ্রয়োজনেও যাত্রিগণকে এটা সেটা খরিদ করিতে বাধ্য হইতে হয়। এ বিষয়ে যমুনোত্রী-গঙ্গোত্রী পথের চটীওয়ালাগণ যে অনেক বেশী উদার, ইহা স্পষ্টতঃই উপলব্ধি করা যায়।

২৩শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার প্রত্যূষে পাতাল-গঙ্গা হইতে প্রায় ছয় মাইল আগে "হিলং"এ আসিয়া উপস্থিত হইলাম। মধ্যে "গোলাপ-কুঠি"

নামক আরও একটি চটী ছিল। এই হিলংএর অপর একটি নাম "কুম্হার" চটী। স্থানটি প্রায় সমতল ভূমির উপরে। এখানে ধর্ম্মশালার সংখ্যা কম নহে, পাঁচটি। কালী কম্লীওয়ালার দুইটি, যোশী মঠের ব্রহ্মচারী "নর্ম্মদানন্দের" দুইটি এবং আরও একটি সরকার হইতে নির্ম্মিত হইয়াছে শুনিলাম। ইহা ছাড়া অনেকগুলি দোকান-ঘরও আছে। হিলং হইতে এইবার আগের পথে আরও একটি চটী (নাম "খনোটি") পার হইয়া যখন "ঝড়কুলায়" আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তখন সকলেই সে স্থানে আহারাদি সম্পন্ন করিয়া লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। এখান হইতে বদরীনাথ মাত্র ২২ মাইল হইবে। এই ঝড়কুলায় জলের এত অধিক কষ্ট যে, যাত্রী ত দূরের কথা, ও স্থানের চটীওয়ালারা কিরূপে বাস করে, বুঝিলাম না। একটি গুহার নীচে অর্দ্ধহাত 'স্কোয়ার' আন্দাজ গর্ত্তমধ্যে ঝির ঝির শব্দে একটুখানি ধারা নামিয়া আসিতেছে। একটি কলসী পর্য্যন্ত সে গর্ত্তে ডুবে কি না সন্দেহ! তাহারই ময়লাযুক্ত জল এ স্থানের একমাত্র অবলম্বন। কোন প্রকারে আহারাদি-কার্য্য সম্পন্ন করিতেই বাধ্য হইলাম। কারণ,—জিনিষপত্রাদি সমস্তই তখন দোকানে নামানো হইয়াছিল। কুলীদের ডাকিয়া আবার আগে যাইবার ব্যবস্থা করিতে গেলে যথেষ্ট বিলম্ব হইয়া পড়িবে। এ দিকে আবার পূর্ণিমা দিবসেই আমাদের সকলেরই বদরীনাথ দর্শনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল। তাই বলিতে কি, এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া আমরা ব্যস্ততা সহকারেই আহারাদি কার্য্য শেষ করতঃ এখান হইতে এদিনে আরও ছয় মাইল আগে "বিষ্ণুপ্রয়াগে" যাইবার জন্যই উদ্যোগী হইলাম। পথিমধ্যে "সিংহ-ধার" ও সেখান হইতে এক মাইল দূরে সুপ্রসিদ্ধ "যোশী মঠকে" দক্ষিণে রাখা হইল। এই যোশী মঠে অনেক কিছু দেখিবার আছে। কিন্তু ফিরিবার পথেই তাহা দর্শনাদি করিতে ইচ্ছা রাখিয়া আমরা সন্ধ্যা

১ম পর্ব্ব—

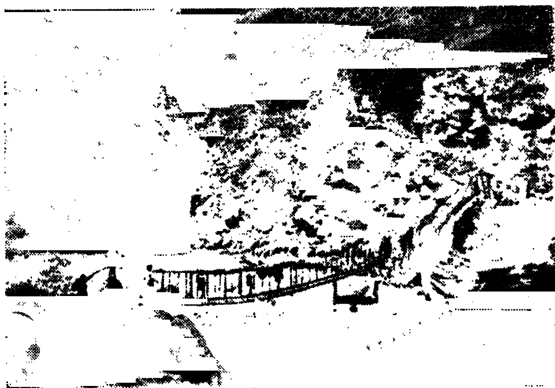




৮ম পর্ব্ব—



পাণ্ডুকেশরের নিকটে নদীর দৃশ্য



ভগ্নপ্রায় দোদুল্যমান কাষ্ঠ-সেতু

নাগাইদ "বিষ্ণুপ্রয়াগে" উপস্থিত হইলাম। যোশীমঠ হইতে এখানে চলিয়া আসিতে প্রায় দুই মাইল উৎরাই পথ এবং "বিষ্ণুগঙ্গার" পুল পার হইতে হইয়াছিল।

পুরাকালে দেবর্ষি নারদ বিষ্ণু আরাধনায় এখানে 'সর্বজ্ঞত্ব' বর লাভ করিয়াছিলেন। এ স্থানটি বিষ্ণুগঙ্গা ও অলকনন্দার সঙ্গম-স্থলে নৈসর্গিক দৃশ্য-গাম্ভীর্য্যের মধ্যেই পরিদৃশ্যমান। তিন চারি-খানি মাত্র চটী। যাত্রিসংখ্যাও ছিল যথেষ্ট। অনেক কষ্টে জনৈক দোকানীর ছপ্পরযুক্ত একটি দ্বিতল-ঘরে আশ্রয় পাওয়া গেল। সন্ধ্যাকালে মন্দিরে আরতি ইত্যাদি দর্শনের সুযোগ পাইয়াছিলাম। দেখিলাম, মন্দিরে বিষ্ণুমূর্ত্তি ও তদ্দক্ষিণে গোপালজীর কৃষ্ণ-প্রস্তর-মূর্ত্তি ও বামদিকে নারদের মূর্ত্তি-শোভিত আর একটি মন্দির আছে। নীচের দিকে অনেকগুলি কঠিন সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া সঙ্গমস্থলে যাইতে হয়। এই নাবিবার পথে আরও একটি মন্দির রহিয়াছে। তাহাতে লক্ষ্মীমূর্ত্তি, তদ্দক্ষিণে বাসুদেব ও বামে উদ্ধবের মূর্ত্তি শোভা পাইতেছে।

উত্তরাখণ্ডে যেমন অনেকগুলি 'কাশী' ও 'কেদারের উল্লেখ আছে' সেই রূপ প্রয়াগক্ষেত্রেরও সাতটি তীর্থ আছে। সুবর্ণ প্রয়াগ (১) বিষ্ণু-প্রয়াগ (২) সরস্বতী-প্রয়াগ (৩) নন্দ-প্রয়াগ (৪) কর্ণ-প্রয়াগ (৫) রুদ্র-প্রয়াগ (৬) ও দেব-প্রয়াগ (৭)। যে পথ ধরিয়া আমরা ক্রমশঃ পাঁচ ধাম যাত্রা সম্পূর্ণ করিয়াছি, সেই পথে আসিতে গেলে মাত্র তিনটি প্রয়াগ-ক্ষেত্রের দর্শন লাভ করা যায়। একটি এই বিষ্ণু-প্রয়াগ। তার পর বদরীনাথ হইতে ফিরিবার পথে দুইটি, যথা—নন্দ-প্রয়াগ ও কর্ণ-প্রয়াগ; দুইটিরই পরিচয় পাঠকবর্গ যথাকালেই জানিতে পারিবেন।

পরদিন প্রত্যূষে পাঁচটা আন্দাজ সময়ে এখান হইতে আগেকার পথে যাত্রা করা হইল। এক মাইল যাইতে না যাইতে "ছোট" চটী ছাড়িয়া

দিয়া এইবার অলকনন্দার উপরের লৌহ-সেতু পার হইলাম। এখান হইতে দুই দিকের পাহাড়ের চাপে এই নদী ক্রমশঃই সঙ্কীর্ণতর হইয়া গিয়াছে, তাই প্রচণ্ড বিক্রমে দুকুল-ভাঙ্গা গর্জ্জন তুলিয়াই যেন রোষাভিমানে ক্ষণে ক্ষণে আছাড়িয়া পড়িতেছে। যাত্রীরা নির্ব্বাক্ ও নিস্তব্ধহৃদয়ে কেবল বিশালকায় পাহাড় ও মধ্যস্থলে এই উচ্ছল-গামিনী খরস্রোতার গম্ভীর নিনাদ শুনিতে শুনিতে আগে চলিয়া থাকে। ছোট-চটী হইতে তিন মাইল আসিয়া আর একটি চটী পড়িল। নাম শুনিলাম "ঘাট" চটী। এখানে তিন চারিটি ছপ্পর ঘর ও দোকানীর কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি এড়াইয়া আমরা দ্রুতপদে এইবার আরও দুই মাইল আগে "পাণ্ডুকেশরে" আসিয়া ক্রমশঃ উপস্থিত হইলাম। পাণ্ডুকেশর গ্রামটি বেশ বড়, ইহার অপর একটি নাম "যোগ-বদরী"। উত্তরাখণ্ডে বর্ণিত পাঁচটি বদরীর মধ্যে ইহাও অন্যতম। অপর চারিটির নাম—১ আদি-বদরী, ২ বদরীনাথ, ৩ ভবিষ্য ও ৪। বৃদ্ধ-বদরী। এই চারিটি বদরীর মধ্যে প্রথমোক্ত দুইটিও আমাদের যাত্রা-পথের সীমামধ্যে অবস্থিত। কেবল ভবিষ্য বদরী (যাহা যোশী মঠ হইতে স্বতন্ত্র পথে 'তপোবন' হইতে আরও আগে যাইলে দেখা যায়) ও বৃদ্ধ-বদরী নির্দ্দিষ্ট পথে না পড়ায় এ যাত্রায় আমাদের দর্শনসৌভাগ্য ঘটিয়া উঠে নাই। যাহা হউক, এই প্রচীন পবিত্র তীর্থ যোগবদরীতে দেখিবার দুইটি মন্দির, দুইটিই এ স্থানে অতুলনীয় কীর্ত্তি জানিতে পারিয়া আমরা প্রথমে মন্দির পানে ধাবিত হইলাম। দেখিলাম, পাশাপাশি দুইটি মন্দির, একটিতে পঞ্চধাতু-নির্ম্মিত শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান আছেন। তাঁহার দক্ষিণহস্তে সুদর্শন চক্র ও বামহস্তে শঙ্খ শোভিত এবং অপরটিতে অষ্টধাতু-নির্ম্মিত এই শঙ্খচক্রধারী চতুর্ভুজ-মূর্ত্তিই কেবল পদ্মাসনে উপবিষ্ট অবস্থায় বিরাজ করিতেছেন। দুইটি মূর্ত্তিই দেখিতে অতি সুন্দর ও সুঠাম। শিল্পীর অদ্ভুত রুচি ও শিল্প-নৈপুণ্যে

এই মূর্ত্তিদ্বয়ের প্রত্যেকটিতেই যেন যুগ-যুগান্তরের সেই অনিন্দ্য-সুন্দর দেব-জ্যোতিঃ ও মুখে স্বর্গীয় হাসি ফুটিয়া রহিয়াছে। দর্শনে হৃদয় মন পুলকিত হইয়া উঠিল। মূর্ত্তির প্রাচীনতা সম্বন্ধে পূজারীর প্রমুখাৎ জানা গেল, প্রথমটি প্রায় দেড়হাজার বৎসর পূর্ব্বে "আদি শঙ্করাচার্য্য" দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে এবং দ্বিতীয়টি এত অধিক প্রাচীন যে, তাহা ভাবিতে গেলে সত্যই বিস্মিত ও অভিভূত হইতে হয়। এ মন্দিরের মূর্ত্তি ধর্ম্মরাজ স্বয়ং যুধিষ্ঠিরের স্থাপিত। পূজারী আরও জানাইলেন, "আপনারা যেখানে যাইতে-ছেন, সেই বদরী বিশালজীর মূর্ত্তি হইতেও এ মূর্ত্তি আরও অধিক প্রাচীন। এ স্থানের সম্মুখ-শিখরে এক সময়ে "পাণ্ডু" রাজা বাস করিয়া গিয়াছেন, যাহার জন্য এই গ্রামের নাম "পাণ্ডুকেশর" বলিয়া প্রসিদ্ধি চলিয়া আসিতেছে। পদ্মাসনে উপবিষ্ট মূর্ত্তির দক্ষিণে "ভূদেবী" এবং বামে লক্ষ্মীদেবী বিরাজিতা। দর্শনান্তে মন্দির-বাহিরে উপস্থিত হইলে পূজারী মহাশয় সম্মুখের একটি তাম্রশাসন-ফলকের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করতঃ বলিয়া উঠিলেন, "এই তাম্রশাসনে কোন্ সময়ে কোন্ অক্ষরে কি-ই বা লিখিত রহিয়াছে, আজ পর্য্যন্ত কেহই তাহার মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিতে সমর্থ হন নাই।" তাম্রশাসনটি দেখিলাম, প্রস্থে ও লম্বায় যথাক্রমে প্রায় এক ও দুই হাত হইবে। শুনিলাম, এইরূপ আরও দুইটি তাম্রশাসন—একটি এখানকার সিন্দুকমধ্যে, অপরটি গড়বাল জেলার সদর অফিস "পৌড়ি"তে সুরক্ষিত আছে। এই সব দেখিয়া শুনিয়া আমরা এখান হইতে প্রায় দুই মাইল আগে "লামবগড়ে" আসিয়া মধ্যাহ্নে উপস্থিত হইলাম।

মধ্যে "বিনায়ক" নামে আরও একটি চটী অতিক্রম করিয়াছিলাম।

লামবগড়ের দক্ষিণে, সেই অলকনন্দাই কুলু কুলু নিনাদে বহিয়া যাইতে-ছেন। বামে পশ্চিমদিগের অভ্রভেদী পাহাড়ের মস্তক দিয়া তুষার-গলিত

সুবিমল শ্বেত-ধারা ঝরণার আকারে নীচে নামিয়াছে, সম্মুখে এক স্থানে স্তূপীকৃত উজ্জ্বল তুষারপুঞ্জ মাথা তুলিয়া কেবল হিমালয়েরই হিম-প্রভাব বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে, যেন এ সকল প্রদেশ মরজগতের পাপ-তাপ-ক্লিষ্ট মানব-জীবনের সদা উপভোগ্য নহে—বহুকষ্ট স্বীকার করিলে তবে নির্দ্দিষ্ট সময়ের এক দিন মাত্রই এ সকল স্বর্গীয় দৃশ্য প্রত্যক্ষ করা যায়! এইরূপ চিত্র-বিচিত্র দৃশ্যের মধ্যে এখানেই আজ দ্বিপ্রহরের আহারাদি কার্য্য সম্পন্ন করা হইল। আজিকার পথে আবার সেই অজস্র গুচ্ছ গুচ্ছ শ্বেত-গোলাপ প্রস্ফুটিত গোলাপবৃক্ষকুঞ্জের আকারে নানা স্থানে সুশোভিত দেখিলাম। বুঝি বা, বদরী-বিশালজীর যতই নিকটবর্ত্তী হইতেছি, স্থানমাহাত্ম্যে ততই এই অলকাপুরীর সৌন্দর্য্য বাড়াইবার জন্যই এই সকল স্বভাব-সৃষ্ট সুগন্ধি পুষ্পের সৌরভ আপনা হইতেই দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এখান হইতে আর ৮ মাইল মাত্র পথ, যে স্থানে আমাদের শেষ ধাম বদরীনাথের দর্শনলাভ ঘটিবে, এই আশা লইয়া আগে চলিয়াছি, মধ্যে দুই এক স্থানে প্রায় এক ফার্লং আন্দাজ ধ্বস্‌ভাঙ্গা স্তূপীকৃত পাথরের উপর দিয়া সংকীর্ণ রাস্তা দ্রুত অতিক্রম করিলাম। এক স্থানে নদীর উপরে এক "ভাঙ্গা অবস্থার" দোদুল্যমান কাঠের পুল পার হইবার জন্য কিছুক্ষণ সময় অতিবাহিত হইল। পুলের প্রহরী একবারে তিন চারি জনের অধিক যাত্রী পার করিতে দিতেছে না। এজন্য নদীর উভয় তীরেই যাত্রীর যথেষ্ট ভিড় জমিয়া গিয়াছে। দুধারেই পাহাড়ের মাথার দিক্‌টা একবারেই বৃক্ষ-হীন, অনাবৃত, অথচ নীচের দিকে নানাবিধ পাহাড়ী জাতীয় বৃক্ষে জঙ্গল হইয়া আছে। কখনও কথঞ্চিৎ চড়াই, কখনও বা অল্প উৎরাইএর মধ্য দিয়া আগে চলিতে এক স্থানে দেখিলাম, পশ্চিম দিক্ হইতে একটি তুষার-গলিত সুবৃহৎ ঝরণা স্তরের পর স্তরে নীচে নামিয়া অলকনন্দায় মিশিয়া গিয়াছে।

ভগবান্ সিং জানাইল, ইহার নাম "ক্ষীর-গঙ্গা"। ইহারই একটু আগের চড়াই ভাঙ্গিয়া একটা ছোট পাহাড়ের বাঁকের মুখে আবার এইরূপ একটি তুষার-গলিত প্রবাহ-ধারা। পুল পার হইতেই আমরা এইবার "হনুমান্-চটী" সম্মুখে পাইলাম। উক্ত প্রবাহ ধারাকে এ স্থানের লোকে "ঘৃত-গঙ্গা" বলিয়া থাকে।

হনুমান্‌চটীতে মন্দিরে হনুমানজীর মূর্ত্তি, দক্ষিণে তাঁহার মাতা "অঞ্জনা" এবং বামে গণেশজী শোভা পাইতেছেন। এখানে কালী কমলীওয়ালার দুইটি ধর্ম্মশালা, তন্মধ্যে একটিতে খুব লম্বা ঘর ও আচ্ছাদনযুক্ত লম্বা বারান্দা ছিল। ঘরের মধ্যে দেখিলাম, যাত্রিসংখ্যা যথেষ্ট, এজন্য ধর্ম্মশালার চৌকীদারের হুকুম মত আমরা লম্বা বারান্দাটির এক ধারেই আশ্রয় পাইয়া সে সময়ে ধন্য মনে করিলাম।



নবম পর্ব্ব

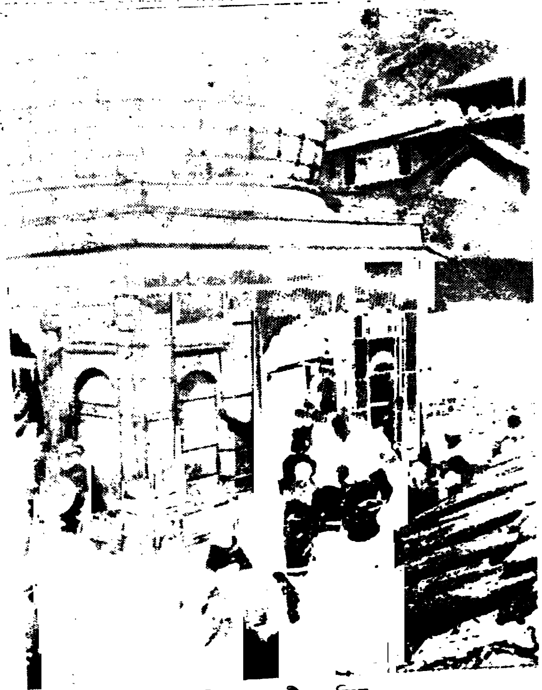
পঞ্চম ধাম—বদরিকাশ্রম

পরদিন অর্থাৎ ২৫শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার আমাদের পক্ষে এক স্মরণীয় বিশিষ্ট শুভ দিন বলিয়াই গণ্য হইয়াছে।

এ দিন আমাদের পাঁচ ধাম যাত্রার শেষ আশা পরিপূর্ণ হইয়াছিল। প্রভাত হইতে না হইতে সকল যাত্রীই এই হনুমানচটী হইতে কতই না আশা-উৎসাহে অগ্রসর হইয়া থাকে! মাত্র পাঁচ মাইল পথের ব্যবধানে "বদরিকাশ্রম"। অগণিত তীর্থ-রাজির মধ্যে প্রত্যেক হিন্দুই এই তীর্থ-দর্শনের পর আর কিছুই অসম্পূর্ণ নাই বলিয়া মনে করেন। ধর্ম্মের পথে এ একটা কত বড় উচ্চ সংস্কার, যুগ-যুগান্তরের সুমহান্ সাধনা না থাকিলে এ তীর্থের দর্শনলাভ ঘটে না! কিছুদূর যাইতে না যাইতেই অলকনন্দার উপরের লৌহসেতু পার হইয়া নদীকে দক্ষিণে রাখিলাম। এ স্থানটিতে পুরাতন রাস্তা সে সময়ে একবারেই ধ্বসিয়া যাওয়ায়, দেড় ফার্লং আন্দাজ পথ 'পাকদাণ্ডি'র পথের অপেক্ষাও দুরারোহ বলিয়া মনে হইল। ডাণ্ডি-ওয়ালাগণ সে স্থলে সওয়ার নামাইতে বাধ্য হইয়াছিল। তার পর পূর্ব্বের মত আবার একটি ভাঙ্গা পুল সম্মুখে পড়ে। সেখান হইতে পথ ক্রমশঃই চড়াইয়ের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। তিন চারি স্থানে স্তূপীকৃত তুষার-রাশি পথের উপরেই জমাট বাঁধিয়াছিল। তার পর প্রায় দুই ফার্লং ব্যাপী আবার এক ধ্বসা স্থানে ভগবান্ সিং খুব দ্রুত ও নীরবে যাইবার জন্য অনুরোধ করিল। কারণ, এ স্থানের খাড়া পাহাড়ের গায়ে

৯ম পর্ব—





বদরীনারায়ণজীর মন্দির

৯ম পর্ব্ব—



দূর হইতে বদরীনাথের দৃশ্য

মাটী-মিশ্রিত অনেকগুলি ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড ‘নুড়ির’ আকারে এতই আলগা ভাবে সংলগ্ন আছে যে, এগুলি অল্প বাতাসের ভরেই গড়াইয়া নীচের পথের উপরে পড়ে, সুতরাং যাত্রীর মাথায় অনায়াসেই আসিয়া লাগিবার সম্ভাবনা। বলা বাহুল্য, পাহাড়ের ঘূর্ণীচক্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া এখন আর আমরা কোন অবস্থাতেই বড় একটা ভীত হই না—কঠিন পথও যেন চলিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। এইরূপে প্রাতঃকাল সাড়ে আটটার মধ্যেই আমরা পাঁচ মাইল পথ শেষ করিয়া আমাদের চির-আকাঙ্ক্ষিত শেষ ধামে উপনীত হইলাম।

“ঋষি-গঙ্গা”র পুল পার হইবার সঙ্গে সঙ্গে পথের সাথী ভগবান্ দক্ষিণে ও বামে দুই দিকের দুই পাহাড় দেখাইয়া জানাইয়া দিল, ইহাদের নাম যথাক্রমে “নর” ও “নারায়ণ”। বদরিকাশ্রম এই দুইয়েরই মধ্যভাগে অবস্থিত। উত্তরাখণ্ডে লিখিত আছে—

“নরনারায়ণৌ শ্রেষ্ঠৌ পর্ব্বতৌ মুনি-বন্দিতৌ।
যো নমেৎ পরয়া ভক্ত্যা ন স ভূয়োঽভিজায়তে॥”

অর্থাৎ নর ও নারায়ণ নামক শ্রেষ্ঠ, মুনিবন্দিত পর্ব্বতদ্বয়কে যে ভক্তিভরে প্রণাম করে, তাহার আর জন্ম হয় না। বলা বাহুল্য, এই দুই পাহাড় উদ্দেশে আমরা সকলেই মনে মনে প্রণিপাত করিলাম। এই পর্ব্বতের উপরিভাগে না জানি কত অগণিত তীর্থই বিদ্যমান।

“গঙ্গায়া দক্ষিণে পার্শ্বে পর্ব্বতে নরনামকে।
তীর্থানাঞ্চ সহস্রাণি লিঙ্গানাঞ্চ শতানি বৈ॥”

এই সকল শাস্ত্রবচনই ইহার যথেষ্ট প্রমাণ।

দুই পাহাড়েরই মস্তকে সে সময়ে দূর হইতে কেবল শুভ্রোজ্জ্বল তুষার-কিরীট ভিন্ন দেখিবার কিছুই ছিল না। মধ্যে পূত-সলিলা অলকনন্দা এই অলকাপুরী ভেদ করিয়াই তর তর শব্দে নীচে নামিয়া আসিতেছেন। জল তুষারবৎ শীতল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহারই পবিত্র তটে "শ্রীশ্রীবদরী-বিশালজী"র সুশোভন মন্দির—চিরোজ্জ্বল রজত-প্রভান্বিত এই সুদূর হিমাচলশীর্ষদেশে যুগযুগান্তরব্যাপী হিন্দুধর্ম্মের জয়-পতাকা তুলিয়াই উন্নতশিরে দণ্ডায়মান। এই মন্দিরের অভ্যন্তরে অনন্তরূপী বিষ্ণু ভগবান্ চতুর্ভুজরূপে বিরাজিত আছেন। কত লক্ষ লক্ষ যাত্রীই আবহমান কাল এক ভাবে এ সময়ে ইঁহার দেবদুর্ল্লভ চরণোদ্দেশে ছুটিয়া আসিয়া ভক্তিগদ্‌গদচিত্তে আপন আপন প্রাণের অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া যায়, তাহার ইয়ত্তা নাই। সাধু, সন্ন্যাসী, গৃহী, তপস্বী যে যেখানেই থাকুক না কেন, দীর্ঘ বৎসরের পরে বুক-ভরা বেদনা লইয়া পরিশ্রান্ত ও ক্ষতবিক্ষতচিত্তে যদি একবার তাঁহারা এই পুণ্য-পাদ-পীঠে উপস্থিত হইতে সমর্থ হয়েন, তখন এই চরণ-সান্নিধ্যে বসিয়া বসিয়া তাঁহাদের অন্তর আনন্দে কতই না উদ্বেলিত হইয়া উঠে। স্থান-মাহাত্ম্যে এখানকার আকাশ-বাতাসও আলোক-সংস্পর্শে দুর্ল্লভ মনুষ্য-জন্ম ও জীবন নিমেষমধ্যেই যেন সার্থক হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়।

মন্দির-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া আজ একবার প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে ডাকিবার ইচ্ছা হইল, জগতের যিনি স্থিতি-কারণ, সেই পালনকর্ত্তা করুণাময় বিষ্ণু ভগবানের অনিন্দ্যসুন্দর দিব্যমূর্ত্তি—জগজ্জনবিস্ময়কারী সুর-নর-মুনি-বন্দিত এই হিমগিরির এইখানে আসিয়াই এত দিনে "বদরী-বিশাল" রূপে দর্শনলাভ হইবে—এ যেন আমাদের একেবারেই অস্বপ্নের স্বপ্ন, বহু দিনের সঞ্চিত আশা মনকে প্রলুব্ধ করিয়া রাখিয়াছিল।

শুনিয়াছি, আচার্য্য শঙ্কর স্বপ্নাদেশে এই পবিত্র মূর্ত্তি এ স্থানের "নারদ-কুণ্ড" হইতে প্রাপ্ত হন। সাক্ষাৎ শঙ্করাবতার শঙ্কর ভগবান্ যাঁহাকে "বদরী-বিশাল" জ্ঞানে পূজা করিয়া গিয়াছেন, আজ আমরা দৈবানুগ্রহে সেই মূর্ত্তিরই মন্দিরসম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি। বদরী-বিশাল দর্শনের মাহাত্ম্য শুধু যে উত্তরাখণ্ডেই বহুল পরিমাণে প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা নহে, মহাভারতাদি প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থেও ইহার যথেষ্ট উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা,—

"বিশালা বদরী যত্র নর-নারায়ণাশ্রমঃ।
তৎ সদাধ্যুষিতং যক্ষৈঃ দ্রক্ষ্যামো গিরিমুত্তমম্॥"

বনপর্ব্ব—১৪১ অধ্যায়, ২৩ শ্লোক॥

"তস্যাতিযশসঃ পুণ্যাং বিশালাং বদরীমনু।
আশ্রমঃ খ্যায়তে পুণ্যস্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ॥"

বনপর্ব্ব—৯০ অধ্যায়, ২৫ শ্লোক॥

ইত্যাদি।

সেই বিশাল-বদরী, সেই পুণ্য-প্রবাহিণী অলকনন্দা ও সেই নর-নারায়ণ * সবই ত এখানে একাধারে বিদ্যমান। কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিবার পর মূর্ত্তিদর্শনাশায় আমরা সকলেই অধীর হইয়া উঠিলাম। মন্দিরে তিন দিকে তিনটি দরজা, কিন্তু শুভ পূর্ণিমা তিথি বলিয়া আজ প্রত্যেক দরজায় অগণিত যাত্রীর ভিড় লাগিয়া আছে। সে ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে

* কথিত আছে, এক সময়ে নর ও নারায়ণ নামে দুই জন প্রাচীন ঋষি এই দুই পাহাড়ে বসিয়া বহুকাল তপস্যা করিয়াছিলেন, যাহার জন্য এই নামেই উঁহারা প্রচলিত হইয়া গিয়াছেন।

গেলে বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। এ দিকে বেলা ক্রমশঃই বাড়িয়া উঠিতেছিল। মাথার উপর প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডদেব সময় বুঝিয়া সকল যাত্রীকেই যেন শীঘ্রই অসহিষ্ণু করিয়া তুলিল। আরও দুঃখের বিষয়, মন্দির-কর্ত্তৃপক্ষের এ সকল বিষয়ে আদৌ দৃষ্টি বা যাত্রীর প্রতি কোন প্রকার সহানুভূতি ছিল না। উপাস্য দেবতার নিকট আসিয়া দূর-দুর্গম পথের পরিশ্রান্ত যাত্রিগণ এই ভাবে দর্শনাশায় বহির্দ্বারে কতক্ষণই বা অপেক্ষা করিতে সমর্থ হয়? সকলেরই হস্তে স্ব স্ব শক্তি অনুসারে পূজোপকরণ, অধিকন্তু এই হিম-শীতল দুর্গম পথে একটি বস্তু দর্শনে আমরা অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলাম। তাহা আর কিছুই নহে, নারায়ণ-পদে অর্পণ করিবার জন্য তাজা তুলসী-মাল্য! পূজার জন্য এরূপ তাজা ও প্রিয় বস্তু কোন ধামেই আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিতে পাই নাই। অবশ্য, প্রত্যেকটি মালার জন্য ছয় পয়সা হিসাবে দক্ষিণা দিতে হইয়াছে। তবুও তাহা স্থানবিশেষে যথেষ্ট সুলভ বলিয়াই সে সময়ে মনে হইয়াছিল। ন্যূনকল্পে তিন ঘণ্টা কাল অপেক্ষা করার পর বহু পরিশ্রমে আমরা সকলেই একে একে দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবিষ্ট হইলাম। সে স্মরণীয় শুভ মুহূর্ত্ত এ জীবনে কদাপি ভুলিবার নহে। যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময়ে যদি কখনও আত্ম-বিস্মৃতি ঘটিয়া থাকে, তবে তাহা সত্য কথা বলিতে কি, সেইখানে—সেই পবিত্র ঘৃতাগ্নি-প্রজ্বলিত ধূপ-ধুনা-কুঙ্কুম-গন্ধপরিপূরিত মন্দিরাভ্যন্তরে, সপারিষদ্ বদরী-বিশালজীর শোভনীয় মূর্ত্তিরই পদতলে! ক্ষণেকের জন্য সে দিন স্বপ্নের মত কি এক অদ্ভুত আবেশে আমাদের পথশ্রান্ত, অবসন্ন শরীর-মন এককালে যেন বিলক্ষণ কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছিল!

দেখিলাম, মন্দিরে শ্বেত প্রস্তর-নির্ম্মিত উচ্চ বেদীর উপরে মধ্যস্থলে বিরাজিত পদ্মাসনে উপবিষ্ট অবস্থায় সেই অপরূপ চতুর্ভুজ মূর্ত্তি। মূর্ত্তিটি বিলক্ষণ মসৃণ ও ধূসরবর্ণের প্রস্তরে নির্ম্মিত বলিয়াই মনে হইল। মস্তকে



মন্দির-প্রাঙ্গণের বাহিরের একপার্শ্ব



মন্দির-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইবার সম্মুখ দরজা



বদরীনারায়ণ দৃশ্য (নিকট হইতে)



কারুকার্য্যময় রত্ন-খচিত মুকুট ও তদুপরি স্বুবর্ণ-ছত্র। মূর্ত্তির বামে নর-নারায়ণ ও দক্ষিণে কুবের, গণেশজী ও লক্ষ্মী এবং একটু নিম্নদেশে আসিয়া সম্মুখের এক পার্শ্বে নারদ ও অপর পার্শ্বে গরুড়জী একে একে শোভা পাইতেছেন। একসঙ্গে এতগুলি দেবতার একত্র সমাবেশ যেন সত্য সত্যই স্বর্গলোকের মত যাত্রিনয়নে প্রতিভাত হইয়া থাকে। সব ভুলিয়া যখন ওই অনিন্দ্য-সুন্দর দেব-মূরতির দিকে এককালীন নয়ন আকৃষ্ট হয়, তখন এই নিরুদ্দেশ পথের যাত্রী—প্রত্যেকেরই অশান্ত হৃদয় হইতে চির-মধুর সান্ত্বনার মত কে যেন অলক্ষ্যে জানাইয়া দিয়া থাকে,—

ওই শ্রীপদে যে লয় গো শরণ
তার কি কোন বিপদ থাকে,
তার জীবনখানি সদাই নত
মরণ-হরা চরণ-আগে!
তার মনের সাধ কি থাকে বাকী
আসল কাযে নাই যে ফাঁকি,
সে যে কুপথ ভুলে, স্বুপথ চলে
মনের আলোর মধুর ডাকে।
বুক ভরা তার সকল ব্যথা
সকল দুখের সার্থকতা—
যদি শেষের দিনে নয়ন-আগে
এমনি-তর ও-রূপ জাগে।

মন্দিরের অভ্যন্তরভাগে যে ঘরে "বদরী-বিশালজী" বিরাজ করিতে-ছেন, তাহার সম্মুখেই আর একটি ঘর, সেটি অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত, অনেকটা

নাটমন্দিরের মত হইলেও আচ্ছাদনযুক্ত থাকায় ভিতরের ঘরটি যেন কতকটা অন্ধকার করিয়া দিয়াছে। এ জন্য বাহির হইতে হঠাৎ কোন যাত্রী মূর্ত্তি-সম্মুখে উপস্থিত হইলে কিয়ৎকাল তাঁহাকে স্থির হইয়া দাঁড়াইতে হয়। অবশ্য অহোরাত্রই সেখানে ঘৃত-প্রদীপ জ্বলিতে থাকে।

মন্দিরের পশ্চিমাংশে কোণের দিকে ভোগ-রান্নার ঘর ও তৎপার্শ্বে লক্ষ্মীদেবীর মন্দির বিরাজমান। বেলা বাড়িয়া যাওয়ায় ঐ দিনে আমরা ইঁহাদের দর্শন-পূজাদি শেষ করিয়াই বাসায় ফিরিয়াছিলাম। নির্দ্দিষ্ট পাণ্ডা "সূর্য্যপ্রসাদ-রামপ্রসাদ"এর দ্বিতল বাটীর নীচের একখানি ঘরে আশ্রয় লওয়া হয়। সে সময়ে পাণ্ডা ঠাকুরের ওখানে যথেষ্ট যাত্রী, তন্মধ্যে চন্দননগরনিবাসী জনৈক ভদ্রলোকের দল উল্লেখযোগ্য। ইঁহার সঙ্গে এককালীন ১৪ খানি ডাণ্ডিতে ১৪ জন সওয়ার এবং কতক জন বা ঘোড়ার উপরে সওয়ার হইয়া হরিদ্বার হইতে এখানে আসিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসায় জানিলাম, প্রত্যেক ডাণ্ডির ভাড়া সওয়ারের ওজন হিসাবে ১১০৲ টাকা হইতে ১৩০৲ টাকা পর্য্যন্ত দিতে হইবে। "চানাচবৈনি" ইত্যাদি স্বতন্ত্র। ইঁহাদের তদ্‌বীর করিতেই পাণ্ডা ঠাকুর সে সময় বিলক্ষণ ব্যস্ত ও বিব্রত ছিলেন। দেখিলাম, আহার-ব্যাপারে এখানে বেশীর ভাগ যাত্রীই ভোগের প্রসাদের উপরেই নির্ভর করিয়া থাকেন। জগন্নাথক্ষেত্রের মত 'ছড়িদার'রা মন্দির হইতে কেবল মহাপ্রসাদই বহন করিয়া আনিতেছিল, সে কি হুড়াহুড়ি ও দৌড়াদৌড়ি ব্যাপার! ভাত, ডাল, তরকারী, চাট্‌নি হইতে পায়স্মন্ন, পাঁপর পর্য্যন্ত কোন জিনিস যেন আর বাকী নাই, বিশালজীর ভোগের ব্যবস্থা কতই না বিশাল! শুনিলাম, কেবলমাত্র এই বদরীনাথের ভোগেই দৈনিক ১৫২৷৶০ ব্যয় নির্দ্দিষ্ট আছে। বড় সাধারণ কথা নহে।

"প্রসাদং হরি-নৈবেদ্যং ভুঞ্জিয়াস্তক্তিতৎপরঃ" এই শাস্ত্রবচনানুযায়ী অনেকেই যে এ বিষয়ে যথেষ্ট ভক্তিপরায়ণ, তাহা দ্বিপ্রহরে ভোগের পরে সে সময়কার অবস্থা দেখিলেই সহজে উপলব্ধি হইয়া থাকে।

"বদরীবনমধ্যে বৈ বদরী-নায়কো হরিঃ" এই শাস্ত্রবচনানুযায়ী অতীত যুগে কোন্ সময়ে এই বদরিকা-ক্ষেত্র বদরীবনে পরিপূর্ণ ছিল, বলিবার উপায় নাই ; তবে ইদানীন্তন এই চতুর্দ্দিকে পাহাড়বেষ্টিত বৈকুণ্ঠ-ভবন যেন একটি মানব-সৃষ্ট 'ছোট-খাটো' সহরের মতই পরিণত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। রাস্তার দুধারেই সারি সারি অজস্র দোকান। নানাবিধ দ্রব্যসম্ভারে দোকানগুলি পরিপূর্ণ—খেলনা, ছবি, ফটো, মনি-হারি দ্রব্য, তীর্থ-পুস্তক, পুরী হালুয়া-মিঠাইএর দোকান, মুদিখানা—এমন কি, দেশের খবর লইবার সংবাদপত্র পর্য্যন্ত যাঁহার যে জিনিষের প্রয়োজন, সমস্তই খুঁজিয়া পাইবেন। সরকারের অনুগ্রহে খাবারের দোকানের পাশে পাশে পাইপ-সংযোগে জলের ব্যবস্থা, ধর্ম্মশালা, পোষ্ট অফিস, তার-ঘর—কিছুরই ত অভাব দেখিলাম না। এমন সহজসাধ্য ও সুখের বৈকুণ্ঠ-ভবনে বৈকুণ্ঠনাথ-দর্শনে অবহেলা করিলে বাস্তবিকই সে ব্যক্তি কলিযুগে বঞ্চিতই হইয়া থাকেন সন্দেহ নাই। শাস্ত্রেই উল্লিখিত রহিয়াছে,—

"আগচ্ছন্ বদরীং যস্তু কৃতকৃত্যত্বমাপ্নুয়াৎ।
ন নমংশ্চ হরিং দেবং বঞ্চিতোহত্র কলৌ যুগে॥"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি বদরিকাশ্রমে আগমন করিয়াছে, তাহার কৃতকার্য্য লাভ অর্থাৎ সিদ্ধি হয়, কিন্তু কলিযুগে যে ব্যক্তি ইহাকে প্রণাম না করিয়াছে, সে বঞ্চিতই হইয়াছে।

এ স্থলে আসিলে যাত্রিগণ পঞ্চতীর্থে * স্নান, পঞ্চশিলায় † নমস্কার ও শ্রীশ্রীআদি কেদারেশ্বর শঙ্করকে দর্শন করিয়া থাকেন। এখানে আমরা ত্রিরাত্রি বাস করিয়াছিলাম। দ্বিতীয় দিবস প্রাতে আমরা "তপ্তকুণ্ডে" স্নানেচ্ছু হইয়া সেখানে উপস্থিত হইলাম। কুণ্ডটি একটি প্রকাণ্ড চৌবাচ্ছার মত, উপরে টিনের আচ্ছাদন দেওয়া আছে। কথিত আছে, এক সময় এই বহ্নি-তীর্থে অসিয়া অগ্নি হরির আরাধনা করিয়াছিলেন ;—

"বহ্নি-তীর্থসমাযুক্তং বিষ্ণুলোকপ্রদং শিবে।
বহ্নি-তীর্থং যত্র দেবী বহ্নিনারাধিতো হরিঃ।"

অর্থাৎ "হে শিবে! ইহা বিষ্ণুলোকপ্রদ বহ্নিতীর্থযুক্ত। যে বহ্নিতীর্থে অগ্নি হরির আরাধনা করিয়াছিলেন।" এই স্থানে যাত্রীদের ভিড়ের সহিত পাণ্ডাদের ভিড়ও যথেষ্ট দেখিলাম। স্নান করিবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা যাত্রীর মনে যতটুকুই থাকুক না কেন, সঙ্কল্প করাইবার জন্য এই পাণ্ডা-গণের যেন উচ্চাকাঙ্ক্ষা অনেক বেশী! কুণ্ডমধ্যে উষ্ণ জলের প্রবাহ, শীতের দিনে স্নান কতকটা আরামপ্রদও বটে! তুষার-কিরীটী হিমালয়ের ইহাও এক অপূর্ব্ব বৈভব সন্দেহ নাই। বৈজ্ঞানিকগণ যাহাই বলুন না কেন, তুষার-শীতল জলের পার্শ্বেই যখন দেখি, এই উষ্ণ জলের ধারা-প্রস্রবণ, বিচিত্র সমাবেশ ভিন্ন তখন আর কি বলা যাইতে পারে! স্নান করিয়া উপরে উঠিবার কালে সম্মুখে আদি কেদারেশ্বরের পবিত্র মন্দির দেখা যায়। মন্দিরের পার্শ্বেই তথাকথিত "রাওল" বা বিশাললালের পূজারীর

---

* পঞ্চতীর্থ যথা,—ঋষিগঙ্গা, কূর্ম্মধারা, প্রহ্লাদধারা, তপ্তকুণ্ড ও নারদকুণ্ড।

† পঞ্চশিলা যথা,—নারদশিলা, বারাহীশিলা, নারসিংহীশিলা, মার্কণ্ডেয়শিলা ও গারুড়ীশিলা।

প্রাসাদ। এই স্থানেই "ত্রোটকাচার্য্যের গদি" ও "কাছারীবাড়ী"— যেখানে যাত্রিগণ সাধারণতঃ বিশালজীর পূজা বা ভোগের দরুণ সামর্থ্য ও রুচি হিসাবে ভেট দিয়া রসিদ লইয়া আসেন।

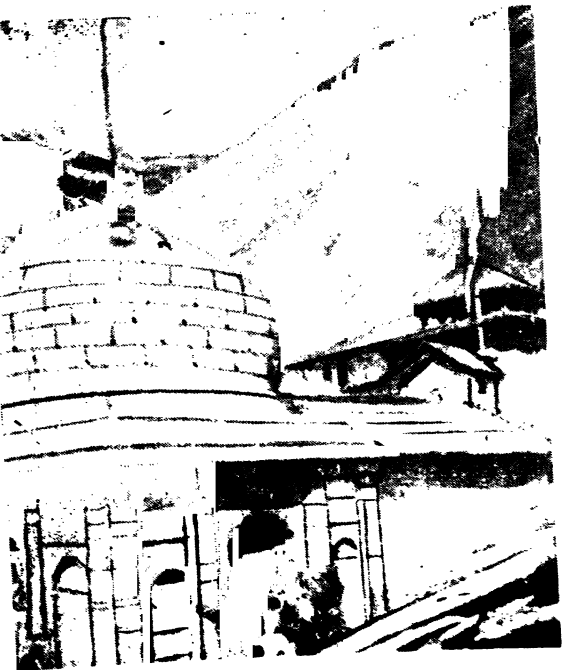
তপ্তকুণ্ডে স্নান ইত্যাদির পরে আমরা এ দিন পুনরায় মন্দিরে উপনীত হইয়াছিলাম। বিশালজীর স্নানকালীন দর্শন মধুর ও উপভোগ্য জানিয়া বহু সাধ্যসাধনায় কর্ত্তৃপক্ষকে আপ্যায়িত করিয়া মন্দিরমধ্যে প্রবেশলাভ করি। পদ্মাসনে উপবিষ্ট ভগবানের চতুর্ভুজমূর্ত্তির এই সময়েই ত যাত্রীরা সমস্ত রূপ সুস্পষ্ট দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকেন। রাওল বা পূজারী নিজেই দণ্ডায়মান থাকিয়া স্বহস্তে শ্রীঅঙ্গের স্নানাদি কার্য্য সম্পাদন করেন, সে সময় দর্শকবৃন্দ যথার্থই সেই বিশ্বনিয়ন্তা বৈকুণ্ঠনাথের জাগ্রত স্বরূপ দর্শনে যেন বৈকুণ্ঠধামের আনন্দ লইয়াই বাসায় ফিরিয়া আসেন, ফিরিবার কালে দর্শনপ্রত্যাগত যাত্রিগণের মুখে কেবল এই কথাই পুনঃ পুনঃ শ্রুত হইয়াছিলাম।

এই ভোগৈশ্বর্য্যমণ্ডিত বিশালজীর আয় বড় কম নহে। ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত রাজা, মহারাজা, ধনী ও সাধারণ—লক্ষ লক্ষ হিন্দুসন্তানই প্রতি বৎসর এ সময়ে এখানে আগমন করিয়া সামর্থ্যানুযায়ী পূজা ও ভেট ইত্যাদি অর্পণ করেন। নারায়ণের শ্রীপাদপদ্মে দানের পরিমাণ কত উঠিয়া থাকে, আজিকার দিনে অনেকেই হয় ত ইহার খবর রাখেন না। আমরা রাওলের বিশিষ্ট কর্ম্মচারি-প্রমুখাৎ সে সময় প্রথমতঃ যতদূর অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছি, পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত এখানে তাহার আয়-ব্যয়ের একটু সংক্ষিপ্ত আভাস দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক মনে করিলাম না।

আয়ঃ—রাজস্ব বা রেভিনিউ বিভাগ হইতে আনুমানিক বাৎসরিক আদায়		১৫,০০০৲
রাজা মহারাজা হইতে „ „ এবং		২৫,০০০৲
যাত্রী হইতে আনুমানিক বাৎসরিক আদায়		১০,০০০০৲
আনুমানিক সর্ব্বসমেত আয়		১,৪০,০০০৲
ব্যয়ঃ—ইহার অধীন ২২টি মঠের দেবতা ইত্যাদির—		
১। পূজা এবং ভোগ ইত্যাদি বাবদ প্রত্যহ ১০০৲ টাকা হিসাবে বাৎসরিক		৩৬,৫০০৲
২। বদরী-বিশালজীর ভোগ বাবদ প্রত্যহ ১৫২৷৷৵০ হিসাবে		৫৫,৭০৮৲
৩। মাসিক বেতন খাতে		
রাওল ২০০৲		
নায়েব রাওল ১০০৲	৮০০৲ হিসাবে	৯,৬০০৲
অন্যান্য কর্ম্মচারী, চাকরবৃন্দ ৫০০৲		
৪। দপ্তরী বিভাগ ও স্বত্ব-সাব্যস্ত বিভাগ ইত্যাদিতে „		৫০০০৲
৫। মঠ ইত্যাদির বাটী মেরামত ইত্যাদি খাতে মাসিক ৩০০৲ হিসাবে		৩৬০০৲
৬। গড়বাল জেলার স্কুল বিভাগের স্কলারশিপ খাতে মাসিক ১০০৲ টাকা হিসাবে „		১২০০৲
৭। দরিদ্রদিগকে বিতরণ খাতে „		১০০০৲
৮। ঔষধ বিভাগে মাসিক ৫০৲ টাকা হিসাবে		৬০০৲
আনুমানিক সর্ব্বসমেত ব্যয়		১,১৩,২০৮৲

রাওল-কর্ম্মচারীর এই উক্তি যদি অসত্য না হয়, তবে উল্লিখিত হিসাব দৃষ্টে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, আয় হইতে এই সকল ব্যয় বাদ দিয়াও বিশালজীর ভাণ্ডারে প্রতি বৎসরেই প্রায় পঁচিশ হইতে কমবেশী ত্রিশ

৯ম পর্ব্ব—



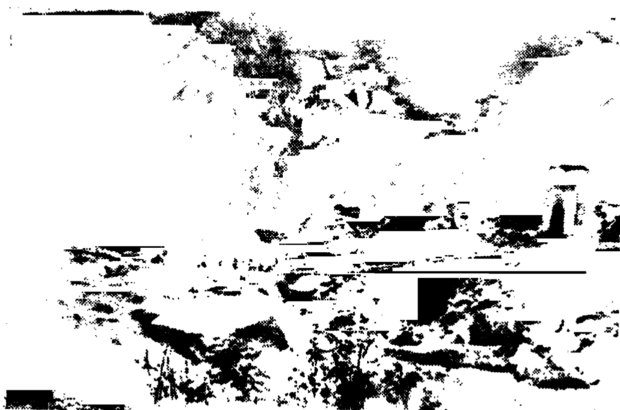


কাণ্ডিওয়ালা—বদরীনাথের পথে

৯ম পর্ব্ব—



হনুমান চটী



বদরীনাথ যাইতে আর একটি কাষ্ঠ-সেতু

হাজার টাকা পর্য্যন্ত উদ্বৃত্ত থাকিয়া যায়। তুষারকিরীটী হিমালয়ের নিভৃত তুষারক্ষেত্রে সেই ধনাধিপতি কুবেরের বাসস্থান কোথায় লুক্কায়িত আছে, এ যুগে তাহা জানিবার আদৌ উপায় নাই, কিন্তু পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে এই বদরী-বিশালজীর বিশাল বিশ্ববন্দিত চরণ-পদ্মে যে যক্ষের ধনের মত প্রতি বৎসরেই অগণিত অর্থ ও বৈভবাদি জমা হইতেছে —মানব-চক্ষুতে ইহার চাক্ষুষ প্রমাণ এইখানেই, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অনন্তশয্যায় শায়িত, মুদিত-পদ্মনেত্র চতুর-চূড়ামণি শ্রীহরির চরণ-পার্শ্বে যেখানে মূর্ত্তিমতী স্বয়ং চঞ্চলা দেবী সেবানিরতা বিরাজ করেন, সেখানে লক্ষ লক্ষ পরিশ্রান্ত যাত্রীর ভক্তিনিবেদিত অর্ঘ্য-সম্ভার বিপুল বৈভবরূপেই যে দিন দিন আত্মপ্রকাশ করিবে, বিচিত্র কি!

যেখানেই লক্ষ্মীমায়ের কৃপাদৃষ্টি থাকে, সেখানে প্রায় সর্ব্বত্রেই কোন না কোন রকমে একটু বিবাদের সৃষ্টি দেখা যায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, একমাত্র রাওলই এ স্থানের পূজা ইত্যাদি সকল -কার্য্যেই হর্ত্তা-কর্ত্তা বিধাতার মতই উচ্চাসনে বসিয়া হুকুম চালাইয়া থাকেন। পূর্ব্বে এই বদরিকানাথ স্বাধীন টিহিরী-রাজ্যের সীমাভুক্ত ছিল। গত ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে "গুর্খা-যুদ্ধের" পর হইতে এ স্থান বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের এলাকামধ্যেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সদাশয় বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট প্রজাদিগের ধর্ম্ম-সংক্রান্ত ব্যাপারে চিরদিনই নিরপেক্ষ থাকা হেতু এই নিয়মানুযায়ী তথা-কথিত রাওল বা পূজারীর দ্বারাই তদবধি এ বদরীনাথ তীর্থের পূজা ও ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় আয়-ব্যয়ের ব্যাপারকার্য্য সুনির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে। টিহিরী রাজ-দরবার-পক্ষ, এ স্থানের এলাকাভুক্ত না থাকিলেও রাওল কর্ত্তৃক আয়ব্যয়-সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ই পরীক্ষা (audit) করিবার জন্ত গভর্ণমেণ্ট হইতে সম্মতি লাভ করিয়াছেন। সম্প্রতি গত ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ হইতে দরবার-পক্ষ ও রাওল মহাশয়ের খুবই "মন-কষাকষি" চলিতেছে

শুনিলাম। দরবার-পক্ষের কথা—"ঐ সময়ে তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট কোন কর্ম্মচারী মন্দিরসম্বন্ধীয় কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে গেলে রাওল মহাশয় উহার ব্যবস্থা মানিয়া লইতে অস্বীকার করেন। ফলে দরবার-পক্ষ মন্দিরের অর্থ-ভাণ্ডার ঘরের (Treasury door) দরজায় রাওলের অমতে চাবিবন্ধ করায় সেই সুযোগে রাওল মহাশয় স্থানীয় বৃটিশ ফৌজদারী আদালতে টিহিরী-রাজ-বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছিলেন। বিচারে সে সময়ে প্রকৃতপক্ষে দরবার-পক্ষই পরাস্ত হইয়া যান।

তখন হইতেই রাজদরবার স্পষ্টতঃ বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে জানাইয়া আসিতেছেন যে, "যত দিন পর্য্যন্ত এই বদরীনাথের দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিভাগ তাঁহার রাজ্যে হস্তান্তরিত না হইবে, তত দিন তিনি এ তীর্থ-সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা বা আয়-ব্যয়ের প্রকৃত তথ্য পর্য্যবেক্ষণ বিষয়ে অত্যন্ত অসুবিধা বোধ করিবেন ইত্যাদি।" দরবার-পক্ষ হইতে মুদ্রিত, "বদরীনাথ মন্দির-সংস্কার" সংসৃষ্ট কাগজখানি পাঠ করিলে জানা যায়, এ বিষয়ে ইউ, পি, গভর্ণমেণ্ট ভারতের সমগ্র সনাতনী হিন্দু জনসাধারণের মতামত কি, জানিতে চাহিয়াছিলেন। এই হস্তান্তর উদ্দেশ্যে দরবার-পক্ষ ইতিমধ্যে বহু স্থানের হিন্দু-সভার মতামত সংগ্রহ করিয়াছেন দেখিলাম। অবশ্য রাওল মহাশয়ও তাঁহার নিজের প্রাধান্য যাহাতে অক্ষুণ্ণই থাকে, সেজন্য নিশ্চেষ্ট বসিয়া আছেন বলিয়া মনে হইল না। ফলাফল সূক্ষ্ম-দৃষ্টি বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের আদেশের উপরেই নির্ভর করিতেছে সন্দেহ নাই। আমরা কিন্তু এ স্থলে যাত্রীর পক্ষ হইতে কর্ত্তৃপক্ষকে কেবল ইহাই সুস্পষ্ট জানাইতে বাধ্য হইব, 'যুগ-যুগান্তর হইতে যে মন্দির ভারতের সমগ্র হিন্দুজাতির গৌরব ও পারত্রিক নিস্তারের একমাত্র কারণ, সে মন্দিরে যাত্রি-লব্ধ এত অধিক ধন-সম্পত্তি সঞ্চিত থাকিতে যাত্রিগণ সেখানে কোনও বিষয়ে কোনও প্রকার অব্যবস্থা বা অবহেলা না দেখিলেই প্রকৃতপক্ষে সুখী হয়।

এইটুকু জানিয়াই যেন কর্ত্তৃপক্ষ সুব্যবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করেন। টিহিরীরাজ-দরবার পূজা বিভাগের কর্ত্তা রাওল মহাশয়ের নিকট হইতে এ ক্ষেত্রে মন্দির-সংক্রান্ত কোন্ বিষয়ে ব্যবস্থার ত্রুটি দেখিয়াছেন (যাহার জন্য এই মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়াছে), তাহাও জনসাধারণের নিকটে সুস্পষ্ট জানাইয়া দেওয়া সর্ব্বপ্রকারেই সুসঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

মুনিজনসেবিত এই শ্রেষ্ঠধাম বদরিকাশ্রমে যে দিকেই দৃষ্টিপাত করা যায়, সকল স্থানই এক একটি তীর্থে পরিণত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না! এস্থানের মাহাত্ম্য একমুখে বর্ণন করা অসম্ভব। শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—

"মাহাত্ম্যং কেন শক্যেত বক্তুং বর্ষশতৈরপি।
যত্র গঙ্গা মহাভাগা বদরীনাথশোভিতা॥"

অর্থাৎ যে স্থানে মহাভাগা গঙ্গা বদরীনাথের শোভা সম্পাদন করিয়া থাকেন, সে স্থানের মাহাত্ম্য শতবর্ষেও কেহ বলিতে সমর্থ হয়েন না। পিতৃপুরুষগণকে পিণ্ডদানের নিমিত্ত "ব্রহ্মকপাল" এ স্থানের আর একটি বিশিষ্ট তীর্থবিশেষ। মন্দিরের উত্তরভাগে একেবারে অলকনন্দার তটের উপরেই ইহা অবস্থিত। কথিত আছে, এক সময়ে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা উন্মত্ত অবস্থায় স্বীয় মানস-কন্যার রূপদর্শনে মোহিত হইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হন। সে সময়ে দেবাদিদেব মহাদেব স্বয়ং সেই সৃষ্টিকর্ত্তা পঞ্চ-বক্ত্রের একটি মুণ্ড ছেদন করেন। অতঃপর ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপক্ষালনের নিমিত্ত এস্থানে আসিয়া স্নান করিলে তিনি পাপমুক্ত হন। এই অলকনন্দার তটেই সে ছিন্নমুণ্ড পতিত হইয়াছিল, সেই কারণে এ স্থানের "ব্রহ্মকপাল" নাম হইয়াছে। তদবধি এ স্থানের পিণ্ডদানপ্রথা চলিয়া আসিতেছে।

"যৈরত্র পিণ্ডবপনং কৃতং জলস্তুতর্পণম্॥
তারিতাঃ পিতরস্তেন দুর্গতা অপি পাপিনঃ।
কিং গয়াগমনাদ্দেবি কিমন্যতীর্থতর্পণৈঃ॥"

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি এই স্থানে পিণ্ডবপন বা জল দ্বারা তর্পণ করে, তাহার পিতৃপুরুষগণ হীনগতি প্রাপ্ত হউক অথবা পাপী হেতু নরকেই পড়িয়া থাকুক, তাহাদের জন্য গয়াগমন বা অন্য তীর্থে তর্পণের আবশ্যক কি ? ব্রহ্মকপালে পিণ্ডদানমাত্র তাহারা মুক্ত হইয়াছে।" সেখানকার প্রথানুযায়ী 'মহাপ্রসাদ' খরিদ করিয়া তদ্দ্বারাই পিণ্ডদানকার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়। বলা বাহুল্য, আমরাও তৃতীয় দিনে তপ্তকুণ্ডে উপস্থিত হইয়া "কর্ম্মধারায়" প্রথমে স্নানাদি কৃত্য শেষ করিয়া লইলাম, তার পর ক্রীত মহাপ্রসাদ দ্বারা যথারীতি এইরূপে পিণ্ডদান কার্য্য শেষ করিয়া বাসায় ফিরিয়াছিলাম। দেখিয়াছি, "ব্রহ্মকপালে" প্রত্যহই যাত্রীর যথেষ্ট ভিড়। সকলেই তীর্থগুরুর দ্বারা এখানে এ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

বাজারের মধ্যভাগে একটু নিম্নদেশে আসিয়া "ত্রিধারা"। তাহার জল পানীয় হিসাবে উৎকৃষ্ট—আরও একটু আগে উত্তরদিকে রামানুজ সম্প্রদায়ের একটি স্থান তাহাকে "রামানুজ কোট" বলা হয়। এই বাটীর মধ্যে হইতেই আবার "প্রহ্লাদধারা" বাহির হইয়াছে। ইহার জল না গরম না ঠাণ্ডা। "ঋষিগঙ্গার" দক্ষিণে পর্ব্বতপার্শ্বে "উর্ব্বশী" দেবীর মন্দির, ঋষিগঙ্গা পর্ব্বতের উপরিভাগে "চরণ-পাদুকা", নর-পাহাড়ে "শেষ-নেত্র" ও ব্রহ্মকপাল হইতে এক মাইল আন্দাজ উত্তরে প্রস্তরক্ষোদিত "মাতা-মূর্ত্তি" প্রভৃতি কত তীর্থের কথাই শ্রুত হইলাম। বলা বাহুল্য, আমাদের সময়ের অল্পতা নিবন্ধন সে সব তীর্থ দেখিয়া আসা কোনমতেই সম্ভবপর হয় নাই। বদরীনাথ হইতে দুই মাইল আগে গেলে "মানা-গ্রাম" এবং তথা হইতে মাত্র ৪ মাইল দূরে "বসু-ধারা" দর্শনের খুবই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ আমাদের সহযাত্রী পূজনীয় অগ্রজ মহাশয় পাঁচ ধাম দর্শনের পর শুধু পরিশ্রান্ত নহে, বিলক্ষণ অসুস্থ হইয়াও পড়িয়াছিলেন, এই সব কারণে বলিতে কি, আগে যাওয়ার আশা একেবারেই পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

তারপর, বসুধারা হইতে আরও উপরের কথা যদি কেহ জিজ্ঞাসু হন,—সে ত তপোবলসম্পন্ন মহাপুরুষ মুনিঋষিগণেরই শেষ আকাঙ্ক্ষিত "সত্য-পথ" ও "স্বর্গারোহণ" বলিয়াই শাস্ত্রগ্রন্থে নির্দ্দিষ্ট আছে। বলা বাহুল্য, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মত তপঃশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষই সে পথের পথিক হইতে পারেন, আমাদের পক্ষে তাহা কেবল একমাত্র কল্পনা ও প্রস্ফুটিত আকাশকুসুম ভিন্ন আর কি হইতে পারে?

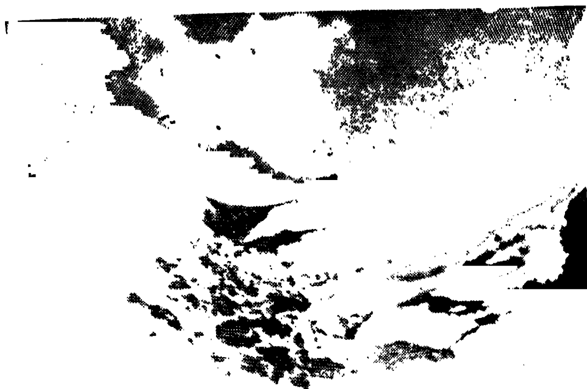
এই বদরিকাশ্রম সমুদ্রগর্ভ হইতে প্রায় ১০৪৮০ ফুট উচ্চে অবস্থিত। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে এ স্থানে এই বিশালজীর মূর্ত্তি শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এ দিকে মহাভারতাদি প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থে বদরী-বিশালজীর সম্বন্ধে নানা স্থানে উল্লেখ থাকায়, "আচার্য্য স্থাপিত এই মূর্ত্তি সে মূর্ত্তি নহে" "সেইটিই আসল, এ কালে লুক্কায়িত অবস্থায় আছেন" ইত্যাদি অন্য প্রকারের আভাসও লোক-মুখে শুনা যায়। এমন কি, কাহারও কাহারও ধারণা, আসল বদরীনারায়ণের মূর্ত্তিটি সুদূর তিব্বতে লামা-করতলগত বৌদ্ধ-বিহার "থুলিং মঠে" সুরক্ষিত আছে, এরূপ সন্দেহও মনে উদয় হইয়া থাকে। আজন্ম মূর্ত্তি-উপাসক হিন্দুদিগের দৃষ্টিতে দেবমূর্ত্তির কোন্‌টি 'আসল', কোন্‌টি 'নকল', এ বিচার, যুক্তি-তর্ক কোনমতেই সমীচীন বলিয়া লেখকের আদৌ ধারণা নাই। সাক্ষাৎ শঙ্করাবতার শঙ্করের স্থাপিত যে মূর্ত্তি সুদীর্ঘ সহস্র বৎসরাধিক কাল হইতে এই নরনারায়ণ-শোভিত বদরিকাশ্রমের তপোমহিমা-মণ্ডিত পুণ্যভূমিতে লক্ষ লক্ষ ভক্তের দ্বারা এইরূপে পূজিত হইয়া আসিতেছেন—সেই মূর্ত্তি বদরীবিশালজীর আসল মূর্ত্তি হইতে কোন্ কোন্ অংশে পৃথক্ হইতে পারে? আজিকার যুগের মদ-মোহান্ধ সংশয়সমাকুল-চিত্ত মানুষ আমরা! আমরা কোন্ ছার! মূর্ত্তি-উপাসক হিন্দু-মহাত্মারা কোন যুগেই যে এ বিষয়ে উত্তর দিতে সমর্থ হইবেন না, ইহা নিঃসংশয়েই বলা যাইতে

পারে। অবিমুক্ত কাশীক্ষেত্রের মহত্ত্ব বা 'কাশীত্ব' যাঁহাকে লাভ করিয়া সেই মঙ্গলময় বিশ্বেশ্বরের 'আসল' মূর্ত্তিই ত 'জ্ঞানবাপীর' অতল তলে চির-নিমগ্ন রহিয়াছে ; কিন্তু তাহা বলিয়া কাশীক্ষেত্রের চিরন্তন মহিমা ও গৌরব উদ্ভাসিত করিতে যে মূর্ত্তি বিশ্বনাথ-মন্দিরে প্রতিদিন অসংখ্য ভক্তের দ্বারা অর্চ্চিত ও পূজিত হইয়া আসিতেছেন, সে মূর্ত্তি কি সেই একচ্ছত্র অদ্বিতীয় মুক্তি-সম্রাটের নিজস্ব মূর্ত্তি হইতে পৃথক্ মনে করা যায় ?

আমার পুরাতন বন্ধু, কৈলাসযাত্রার সহযাত্রী কালিকানন্দ স্বামীজীর সহিত হঠাৎ এখানে একদিন সাক্ষাৎ হইয়া গেল। উভয়েই উভয়ের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিবার পর যখন তিনি শুনিতে পাইলেন, "আমরা একযাত্রায় পাঁচ ধাম দর্শনে বাহির হইয়াছি, ইহাই আমাদের এক্ষণে শেষ ধাম" তখন তিনি যুগপৎ আনন্দিত ও বিস্মিত হইয়াই জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন,—"পাঁওয়ালীর পথ দিয়াই ত আসিয়াছেন ?" উত্তরে সে পথের দুর্দ্দশার কাহিনী ব্যক্ত করিলাম। তিনিও যে সে পথকে এই একইরূপ 'কঠিন !' "সঙ্কটজনক !" ইত্যাদি মনে করিয়া থাকেন, তাহা সে সময়কার ভাবে ও ভাষায় শত মুখেই ব্যক্ত হইয়াছিল। এই শেষ-ধাম বদরীনাথ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে আমাদের সর্ব্বসমেত প্রায় ৪২৬ মাইল পথ আসা হইয়াছে। ইতি-পূর্ব্বে মসৌরী হইতে যমুনোত্তরী তক ৯৬ মাইল পথ এবং যমুনোত্তরী হইতে আবার গঙ্গোত্তরী তক ১০০॥ মাইল পথের হিসাব সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ করিয়াছি, এক্ষণে গঙ্গোত্তরী হইতে কেদারনাথ পর্য্যন্ত ১২৩ মাইল পথ ও কেদারনাথ হইতে এই বদরীনাথ পর্য্যন্ত ১০৬॥ মাইল * পথের সংক্ষিপ্ত হিসাব পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত স্থানান্তরে লিপিবদ্ধ করিলাম।

---

* "তুঙ্গনাথ" ও গুপ্তকাশী" এই দুই তীর্থে যাওয়ার দরুণ আমাদিগকে প্রায় ॥ মাইল অতিরিক্ত যাইতে হইয়াছিল। নতুবা এ পথের দূরত্ব আনুমানিক ০০ মাইলের বেশী নহে।



বদরীর নিকটে তুষার-দৃশ্য

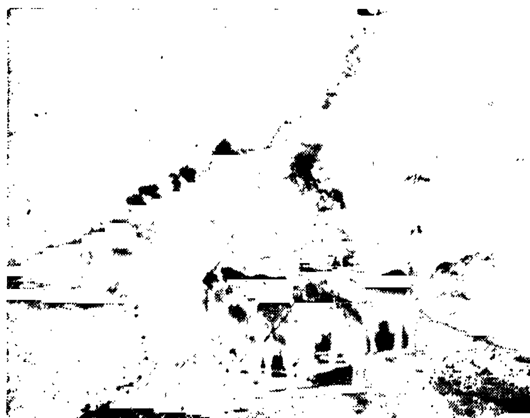


বরফ গলিত ধারা নদীতে নামিয়াছে

৯ম পর্ব্ব—



বদরীনারায়ণ—সহরের দৃশ্য



গঙ্গোত্তরী হইতে কেদারনাথ তক যাত্রাপথের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

স্থান	দূরত্ব	চটীর নাম	পৌঁছিবার তারিখ	বিশেষত্ব
ঙ্গোত্তরী	৬ মাইল	ভৈরব-ঘাটি	২৮।১।৪০	চটীতে জলকষ্ট আছে।
রব-ঘাটি	৬ ”	ধরালী	” ”	প্রশস্ত ধর্ম্মশালা আছে।
ালী	৯ ”	সুখী	২৯।১।৪০	চড়াইয়ের উপরে পাকা দ্বিতল ধর্ম্মশালা আছে।
খী	৯ ”	গাঙ্গনানি	৩০।১।৪০	প্রশস্ত ধর্ম্মশালা আছে।
াঙ্গনানি	৯ ”	ভাটোয়ারী	৩১।১।৪০	টিহিরী-রাজ তরফ হইতে যাত্রিগণের মাল ওজন করা হয়।
াটোয়ারী	১৷ ”	মনূলা বা বেলাটিপ্‌রী	১।২।৪০	এখান হইতে কেদারনাথ যাইবার স্বতন্ত্র পথ গিয়াছে।
বলাটিপ্‌রী	৩ ”	সৌরগড়	” ”	ছপ্পর ঘর মাত্র।
সৌরগড়	২ ”	ফিয়ালু	” ”	” ” ”
ফিয়ালু	৩ ”	ছুনা	” ”	গভীর জঙ্গল, তবে ধর্ম্মশালা আছে।
ুনা	৪ ”	বেলক	২।২।৪০	” ” ও ছপ্পরযুক্ত ঘর বিদ্যমান।
বেলক	৫ ”	পওয়াণা	” ”	” ” ” ” ”
পওয়াণা	৪ ”	ঝালা	৩।২।৪০	দ্বিতল ছপ্পরযুক্ত চটী, কঠিন উৎরাই পড়ে।
ঝালা	৫ ”	বুড়া-কেদার	৪।২।৪০ ৫।২।৪০ ৬।২।৪০	বিশিষ্ট-তীর্থ-ক্ষেত্র, ধর্ম্মশালা, দোকান ইত্যাদি আছে তবে ভয়ঙ্কর মাছির উপদ্রব দেখা যায়।
বুড়া-কেদার	৫ ”	মালধা	৭।২।৪০	ছপ্পরযুক্ত চটি আছে।
মালধা	৩ ”	ভৈরব বা হাটকুনী	৮।২।৪০	” ” ”
হাটকুনী	২৷ ”	ভেঁাট	” ”	দুই তিনখানি ”
ভেঁাট	৫ ”	পেবেটি	” ”	
পেবেটি	২ ”	গুত্তু	৯।২।৪০	ভৃগুনদীতে স্নান, একটি পাকাঘর মাত্র ধর্ম্মশালা তবে দোকান আছে।

গুপ্তু	১॥	„	গাঁওয়ানা	১০।২।৪০	পথ ক্রমিক চড়াই উঠিয়াছে।
গাঁওয়ানা	২॥	„	পৌ	„ „	„ „ „ „
পৌ	২॥	„	গাঁওয়ান কী মাড়া	„ „	চড়াইএর পথে ছপ্পরযুক্ত লম্বা ঘর।
গাঁওয়ান কী মাড়া	৩	„	দোফন্দ	১১।২।৪০	
দোফন্দ	৩	„	পঁওয়ালী	„ „	দ্বিতল ছপ্পরযুক্ত লম্বা ঘর।
পঁওয়ালী	৯	„	মন্থু	১২।২।৪০	সাংঘাতিক পথ—তুষারপাত হইলেই অতিক্রমে বিশেষ কষ্টকর ধর্ম্মশালাটি পাকা, তবে জলকষ্ট আছে।
মন্থু	৫	„	ত্রিযুগীনারায়ণ	১৩।২।৪০	কেবল উৎরাই, বিশিষ্ট তীর্থ-বিশেষ, বড় গ্রাম।
ত্রিযুগীনারায়ণ	৫	„	গৌরীকুণ্ড	১৪।২।৪০	বহু দোকান এবং বিশিষ্ট তীর্থ।
গৌরীকুণ্ড	৪	„	রামবাড়া	১৫।২।৪০	একটি ধর্ম্মশালা ও অনেকগুলি ছপ্পরযুক্ত দোকান আছে।
রামবাড়া	৩॥	„	কেদারনাথ	„ „	বিশিষ্ট-তীর্থক্ষেত্র। বহু ধর্ম্মশালা আছে।

সর্ব্বসমেত—১২৩ মাইল মাত্র

কেদারনাথ হইতে বদরীনাথ তক যাত্রাপথের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

কেদারনাথ	৭॥ মাইল		গৌরীকুণ্ড	১৬।২।৪০	বিশিষ্ট তীর্থ এবং বহু দোকান আছে।
গৌরীকুণ্ড	৫	„	রামপুর	„ „	বহু দোকান ও ধর্ম্মশালা আছে।
রামপুর	১৳	„	বাদলপুর	১৭।২।৪০	
বাদলপুর	৬॥	„	ভেতা দেবী	„ „	বহু মন্দির আছে।
ভেতা দেবী	৪	„	গুপ্তকাশী	„ „	বিশিষ্ট তীর্থ, ছোট সহরের মত।
গুপ্তকাশী	২॥	„	উখী মঠ	১৮।২।৪০	বাণাসুরের বাসস্থান, বড় বাজার, ডাকঘরও দুটি আছে।
উখী মঠ	৯॥	„	দোগলভিটা	১৯।২।৪০	পাঁচ ছয়খানি ছপ্পরযুক্ত লম্বা দোকান আছে।

স্থান	দূরত্ব	চটীর নাম	পৌছিবার তারিখ	বিশেষত্ব
দোগলভিটা	১ „	চোপ্‌তা	১৯।২।৪০	এখান হইতে তুঙ্গনাথ যাইতে হয়।
চোপ্‌তা	৩ „	তুঙ্গনাথ	„ „	বিশিষ্ট তীর্থ, আকাশগঙ্গায় স্নানবিধি।
তুঙ্গনাথ	২ „	ভূলোকনা	„ „	উংরাই পথে নামিতে হয়।
ভূলোকনা	৩। „	পাণ্ডববাসা	„ „	নিবিড় জঙ্গল তবে ধর্ম্মশালা আছে।
পাণ্ডববাসা	৩। „	মস্তল	২০।২।৪০	সুন্দর দ্বিতল ধর্ম্মশালা ও বহু চটী আছে।
মস্তল	৬ „	গোপেশ্বর	„ „	শিবমন্দির ও বৈতরিণীকুণ্ড আছে।
গোপেশ্বর	৩ „	লালসাঙা	„ „	কেদার, বদরী ও কর্ণ-প্রয়াগ পথের মিলনস্থল ও সহরের মত।
লালসাঙা	২ „	মঠ চটী	২১।২।৪০	শাক সব্‌জী ও আম, নেবু, কলা ইত্যাদি পাওয়া যায়।
মঠ	৭ „	পিপুলকুঠী	„ „	বহু দোকান, ডাক ও তার-ঘর আছে।
পিপুলকুঠী	৪ „	গরুড়-গঙ্গা	„ „	গরুড়-গঙ্গা ও অলকনন্দা-সঙ্গম স্থল, ধর্ম্মশালা আছে।
গরুড়-গঙ্গা	৪ „	পাতাল-গঙ্গা	২২।২।৪০	পাতাল-গঙ্গা অলকনন্দা-সঙ্গম। দোকানঘর আছে।
পাতাল-গঙ্গা	৬ „	কুম্‌হার বা হিলং	„ „	৫টি ধর্ম্মশালা আছে।
হিলং	৬ „	সিংহধার	„ „	সমতল স্থানের উপর ৪।৫ খানি চটী আছে।
সিংহধার	১ „	যোশী মঠ	„ „	শঙ্করাচার্য্য-স্থাপিত চারিটি মঠের মধ্যে অন্যতম। ছোট সহরের মত
যোশী মঠ	২ „	বিষ্ণুপ্রয়াগ	২৩।২।৪০	এখানে বিষ্ণুগঙ্গা ও অলকনন্দার সঙ্গমস্থল।
বিষ্ণুপ্রয়াগ	৪ „	ঘাট চটী	„ „	বহু চটী আছে।
ঘাট চটী	২ „	পাণ্ডুকেশর	„ „	ইহার অপর নাম যোগবদরী। তাম্রশাসন আছে।
পাণ্ডুকেশর	৫ „	হনুমান্ চটি	২৪।২।৪০	হনুমান্‌জীর প্রাচীন মন্দির আছে। পথ চড়াই।
হনুমান্ চটি	৫ „	বদরীনাথ	২৫।২।৪০	বদরীনারায়ণ দর্শন, তপ্তকুণ্ডে স্নান ও ব্রহ্মকপালে পিণ্ডদান।

সর্ব্বসমেত—১০৬। মাইল মাত্র

এখানে আসা নিবন্ধন আমরা ডাণ্ডিওয়ালা ও বোঝাওয়ালা কুলীগণকে প্রত্যেকেরই ইনাম, খিচুড়ী হিসাবমত চুক্তি করিলাম। বলা বাহুল্য, তাহারা সকলেই পাঁচ ধাম দর্শন করাইতে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছে। এইবার নির্ব্বিঘ্নে ফিরিবার যাত্রা-পথটুকু (সে ও বড় কম নহে!) শেষ হইলেই ত তাহাদের ছুটী!

"সুরযপ্রসাদ" পাণ্ডা ঠাকুরকে কিছু 'মোটা' দক্ষিণাই স্বীকার করিতে হইল। তাঁহার দেওয়া ভগবান্ সিং (ছড়িদার) এই দুর্গম পথে বরাবরই ত এ যাবৎ সাথী রহিয়াছে। বাকী পথটুকুও পার করিবার জন্য তিনি ভগবান্‌কে আদেশ দিতে বিস্মৃত হইলেন না। এইরূপে তাঁহার নিকট হইতে 'সুফল' ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া আমরা একে একে ২৪শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার প্রাতে শেষ ধাম হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

দশম পর্ব্ব

প্রত্যাবর্ত্তন

বারো মাইল পথ নামিয়া আসিয়া বেলা বারোটা আন্দাজ সময়েই "ঘাট" চটীতে মধ্যাহ্নের আহারাদি সে দিন সম্পন্ন করা হইল। বৈকালের দিকে আকাশে দুর্য্যোগ দেখিয়া এস্থানেই রাত্রিবাস করা হয়। পরদিন প্রাতে ৫৷৷টা আন্দাজ সময়ে বাহির হইয়া সাতটায় বিষ্ণুপ্রয়াগে বিষ্ণুগঙ্গার পুল অতিক্রম করিলাম। দক্ষিণে অলকনন্দার সুমধুর কল-কলধ্বনি এখান হইতে চড়াই পথে উঠিবার কালে ক্রমশঃই যেন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিল। দু'ধারেই অলকাস্পর্শী পর্ব্বত-প্রাসাদের চূড়ায় চূড়ায় নবোদিত সূর্য্যরশ্মি খেলিয়া বেড়াইতেছিল। সম্মুখেই এই চড়াইটুকু শেষ করিতে পারিলেই "যোশীমঠে" উপস্থিত হইব। ইহা আচার্য্য শঙ্করের স্থাপিত সহস্রাধিক বৎসরের প্রাচীন মঠ! কোন্ অতীত কালের সুমধুর পবিত্র স্মৃতি এ স্থানের প্রস্তরে প্রস্তরে আজও যেন সমানভাবে মিশ্রিত রহিয়াছে! ধর্ম্মের পথে, সাধনার সোপান অতিক্রম করিয়া এক দিন এখানে হয় ত মনুষ্যকর্ণে স্বর্গের দুন্দুভি-নিনাদই শ্রুত হইয়াছিল! সে দিন কোথায়! ধীরে ধীরে দুই মাইল প্রায় চড়াই শেষ করিয়া সেই শঙ্কর-মহিমা-মণ্ডিত সুপ্রসিদ্ধ যোশীমঠে উপস্থিত হইলাম।

আচার্য্যের স্থাপিত চারিটি মঠের মধ্যে এই যোশী মঠ হইতেছে অন্যতম।* এখানে মন্দির-মধ্যে অনেক দেবদেবীই বিরাজ করিতেছেন।

---

* অন্যান্য তিনটি যথা,—দক্ষিণে সেতুবন্ধসমীপে "শৃঙ্গেরী," পশ্চিমে দ্বারকায় "শারদা" এবং পূর্ব্ব-প্রান্তে পুরীতে "গোবর্দ্ধন" মঠ স্থাপিত আছে।

তন্মধ্যে "নৃসিংহ" ভগবানের মূর্ত্তিটি সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম ও দেখিতে সুন্দর মনে হইল। দ্বাদশাঙ্গুলি-পরিমিত মসৃণ শালগ্রাম-শিলায় নির্ম্মিত এই মূর্ত্তিটি বীরাসনে বিরাজ করিতেছেন, বামহস্তে শঙ্খ ও দক্ষিণহস্তে চক্র সুশোভিত। সৌভাগ্যক্রমে ইহার স্নানকালেই আমরা দর্শন লাভ করি। পূজারী মহাশয় বলিলেন, আচার্য্য শঙ্কর এই মূর্ত্তি স্বয়ং পূজা করিতেন। ইহারই দক্ষিণে বদরী-বিশালজীর অষ্টধাতুনির্ম্মিত সুন্দর মূর্ত্তি, ক্রোড়ে উদ্ধবজী এবং বামে রাম-লক্ষ্মণ-সীতার কৃষ্ণপ্রস্তরমূর্ত্তি, বহির্ভাগে বৃহৎ কাষ্ঠক্ষোদিত চণ্ডীমূর্ত্তি ও সম্মুখে চারিটি শালগ্রাম-শিলা বিরাজ করিতেছেন। মন্দির-বাহিরে "নৃসিংহ-ধারা"। যাত্রিগণ এখানে স্নান করিয়াই দর্শনাদি করিয়া থাকেন। এখান হইতে আর একটু উপরে উঠিলে আর একটি মন্দির দৃষ্ট হয়। তাহাতে ভগবান্ বাসুদেবের ন্যূনাধিক পাঁচ হাত উচ্চ এক কৃষ্ণপ্রস্তরমূর্ত্তি শঙ্খ-চক্রগদা-পদ্ম-শোভিত চতুর্ভুজরূপে দণ্ডায়মান। "জয়া" ও "বিজয়া" ঐ একই প্রস্তরে একসঙ্গে ক্ষোদিত মনে হইল। পার্শ্বে "ভূ"দেবী ও "শ্রী"দেবী বিরাজিতা। দক্ষিণভাগে আবার দণ্ডায়মান বলদেবের নয়নাভিরাম মূর্ত্তি শোভিত রহিয়াছে। এই সকল দেব-দেবী দর্শন করিয়া মন্দির-প্রদক্ষিণকালে দক্ষিণ ভাগের একটি মন্দিরে আবার নবদুর্গার নয়টি মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিলাম। তাহা ছাড়া আরও এ স্থানের অন্যান্য মূর্ত্তির মধ্যে "হর-পার্ব্বতীর" মূর্ত্তি—(শিবমূর্ত্তির হস্তে বেষ্টিত অবস্থায় পাষাণ-প্রতিমা পার্ব্বতী) ও গণেশজীর অষ্টভুজ "তাণ্ডব-মূর্ত্তি" দুই-ই দেখিতে অতি সুন্দর মনে হইল। শুনিলাম, এ স্থানের মন্দিরাদিতে প্রত্যহ প্রায় এক মণ চাউলের ভোগ দিবার ব্যবস্থা আছে। অবশ্য প্রাতঃকালের ভোগের জন্য সে সময় আমরা সেখানে বিশেষ কিছু আয়োজন দেখিলাম না। বদরিকা-ক্ষেত্রের মন্দিরদ্বার যখন রুদ্ধ থাকে, এই যোশীমঠেই তখন নারায়ণের পূজাদি কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।

এখান হইতে কতকটা পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া উত্তরদিকে একটি স্বতন্ত্র রাস্তা গিয়াছে। কেহ কেহ সে রাস্তা ধরিয়া মানস-সরোবরতীর্থে (তিব্বতে) যাইবার ক্লেশ স্বীকার করিয়া থাকেন। তাহাতে "নীতি-পাস" অতিক্রম করিতে হয়।

ধর্ম্মশালায় আহারাদি শেষ করিয়া এ দিন আমরা সোজাপথে একেবারে "পাতালগঙ্গায়" আসিয়াই রাত্রিযাপন করিলাম। ঘাট চটী হইতে পাতালগঙ্গার দূরত্ব প্রায় ১৯ মাইল হইবে। তৃতীয় দিনে দুই বেলায় আমরা ১৫ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া "মঠ" চটীতে অবস্থান করি। এখানে ডাণ্ডিওয়ালা ফতে সিং ও বোঝাওয়ালা কর্ণ সিং উভয়েরই জ্বর ও রক্তামাশয় দেখা দেওয়ায় দ্রুতগতি ফিরিবার পথে আমাদের এক নূতন চিন্তা উপস্থিত হইয়াছিল। পরদিন দুই মাইল দূরে "লালসাঙ্গা"য় আসিয়া এবার নূতন পথের সম্মুখবর্ত্তী হইলাম। এ স্থানটি কেদার, বদরী ও কর্ণপ্রয়াগ এই তিনটি পথের মিলনস্থান। এখান হইতে "মেইল চৌরী" প্রায় ৫০ মাইল হইতেছে। এইটুকু পার হইতে পারিলেই ত এই সকল কুলীদিগের নিকট হইতে অব্যাহতি লাভ করা যায়। অলকনন্দাকে দক্ষিণে রাখিয়া আমরা বরাবর দক্ষিণমুখে দুই মাইল আগে আসিতে "কুবের" চটী পাইলাম। এই স্থানে একটি ঝরণার উপরে কাষ্ঠ-পুল ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় নূতন করিয়া নির্ম্মিত হইতেছিল। তার পর আর একটি চটী (নাম মঠিয়ানা) অতিক্রম করিয়া প্রায় ৫ মাইল দূরে "নন্দ-প্রয়াগে" যখন উপস্থিত হইলাম, তখন বেলা প্রায় সাড়ে নয়টা হইবে। এ স্থানটি নন্দা ও অলকনন্দার সঙ্গমস্থল! নন্দা নদী গ্রামের দক্ষিণদিক্ হইতে আসিয়া পশ্চিমে অলকনন্দার সহিত মিলিত হইয়াছেন; রাজা নন্দদেব পূর্ব্বকালে এ স্থানে যজ্ঞ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ। নন্দদেবের মন্দিরসম্মুখের একটি নূতন দোকানঘরে সে দিন আমাদের

মধ্যাহ্নের আহারাদি শেষ করা হয়। নাড়ুগোপালের পিতলের মূর্ত্তি-শোভিত "গোপাল-মন্দির" এ স্থানের একটি দ্রষ্টব্য স্থান।

এখান হইতে "গরুড়" চটী যাইবার স্বতন্ত্র পথ নির্ম্মিত হইয়াছে। সে পথের দূরত্ব প্রায় ৪৪ মাইল হইবে। এই গরুড় চটী হইতে যাত্রিগণ মোটরযোগে ষ্টেশনে উপস্থিত হইতেও পারেন শুনা গেল। তবে সে পথের চটীগুলি তত সুবিধার নহে এবং সে পথে গেলে "কর্ণ-প্রয়াগ" ও "আদি-বদরী" প্রভৃতি তীর্থদর্শন বাকী রহিয়া যায়, এজন্য যাত্রিগণ "গরুড়" চটীতে সাধারণতঃ যাইতেই চাহেন না। এই নন্দ-প্রয়াগ হইতে কর্ণ-প্রয়াগের দূরত্ব মাত্র বারো মাইল। বলা বাহুল্য, আমরা এই গ্রামের দক্ষিণাংশের পুল পার হইয়া পাহাড়ের গা দিয়া দিয়া এবার পশ্চিমাভিমুখী রাস্তা ধরিলাম। প্রায় সাড়ে সাত মাইল দূরে "জয়কান্তি" চটীতে আসিয়া এ দিন রাত্রিযাপনের স্থির হইল। মধ্যে তিন মাইল দূরে "সোনলা" এবং তথা হইতে আরও তিন মাইল আগে গিয়া "লাঙ্গাসু," চটী পার হইয়াছিলাম। এই জয়-কান্তি হইতে "মেইল চৌরীর" দূরত্ব মাত্র ৩৩ মাইল হইবে। পরদিন ৪৷৷০ মাইল মাত্র দূরে কর্ণের তপস্যাস্থল "কর্ণ-প্রয়াগে" প্রভাতেই উপস্থিত হইলাম। মধ্যে 'উমটী' নামে আর একটি চটী পড়িয়াছিল। দেখিলাম—কর্ণ-প্রয়াগ স্থানটি দৃশ্য হিসাবেও বেশ সুন্দর। "পিণ্ডর-গঙ্গা" ও অলকনন্দার সঙ্গমস্থলে যাত্রিগণ এখানে সচরাচর স্নান করিয়া থাকেন। সে স্থলে দুই নদীতীরেই নানা বর্ণের কত প্রকার সুন্দর 'নুড়ি' বিস্তৃতভাবে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা দেখিলেই সমতল-দেশবাসী যাত্রীর কুড়াইয়া লইবার স্বতঃই ইচ্ছা জন্মে। এ স্থানেরই পর্ব্বত-সমীপে কর্ণ সূর্য্যদেবের দর্শন পাইয়া তাঁহার নিকট হইতে অভেদ্য কবচাদি বর লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ। সঙ্গমস্থলে স্নান করিয়া উপরিভাগে "কর্ণ-শিলা", কর্ণদেবের মন্দির ও উমা-মহেশ্বরের মন্দির প্রভৃতি দর্শনান্তে

আবার আমরা আগে যাত্রা করি। এখান হইতে "দেব-প্রয়াগের" রাস্তা স্বতন্ত্র, প্রায় ৬০ মাইল দূরে শুনিলাম,—পাঁচ-ধাম যাত্রার সুদীর্ঘ পথক্লেশের পর সে তীর্থ দর্শন করিয়া আবার হরিদ্বার পর্য্যন্ত যাওয়া আমাদিগের পক্ষে বিশেষ কষ্টসাধ্য মনে হওয়ায়, আমরা পূর্ব্ব হইতেই আমাদের কুলিগণের সহিত মেইল চৌরী তক পৌঁছাইয়া দিবার সর্ত্ত করিয়াছিলাম। যাত্রীর পক্ষে ইহাই ত নিকটতম পথ। অলকনন্দা দেবপ্রয়াগ অভিমুখেই ছুটিয়া চলিয়াছেন, সুতরাং সে পবিত্রতোয়ার সুমধুর কল-কল-ধ্বনি এখান হইতে একেবারেই কোথায় লীন হইয়া গেল।

আমাদের পাঁচ ধাম যাত্রার সুরু হইতে শেষ পর্য্যন্ত সাথী ভগবান্ সিং আজ কয় দিন হইতে জ্বরে প'ড়িয়াছে, তথাপি তাহার প্রভুদ্বয়ের আদেশমত সে অসুস্থাবস্থায়ই আমাদের সঙ্গে এ পর্য্যন্ত বরাবরই চলিয়া আসিতেছিল! দেব-প্রয়াগের পথেই তাহার বাটী এবং এখান হইতে খুবই কাছে পড়ে শুনিয়া, আমরা আর তাহাকে আমাদের সহিত আসিয়া কষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই, এইরূপ বলিয়াই একেবারে বিদায় দিলাম। এত দিনের সুখ-দুঃখের সাথীকে কিছু কিছু বখশিশও দেওয়া হইল, ইহা অবশ্য তাহার পক্ষে অতিরিক্ত লাভ,—সন্দেহ নাই।

মেইল চৌরীর আর ২৯ মাইল মাত্র বাকী জানিয়া দ্রুতগতি কর্ণপ্রয়াগ হইতে আমরা এ দিনে আরও ৮ মাইল আন্দাজ আসিয়া "ভটৌলী"তে রাত্রি কাটাইলাম। মধ্যে প্রায় ৪ মাইল দূরে "সেমনী" চটী হইতে "গাড়" নদীর তীর ধরিয়া বরাবর সমতল পথ পাইয়াছি। সেখান হইতে ভটৌলী আসিতে মধ্যে "সিরোলী" নামে আরও একটি চটী ছিল।

পরদিনের যাত্রা-পথে প্রভাতেই "আদি-বদরী" উপস্থিত হইলাম। ভটৌলী হইতে ইহার দূরত্ব কিঞ্চিদধিক ৪ মাইল হইবে। মধ্যে "উজলপুর" ও "তাল" বলিয়া দুইটি ছোট চটীও এ পথে দৃষ্ট হয়। আদি-বদরীতে মন্দিরগুলি

অতি প্রাচীন। মন্দিরে আদি-বদরীর কৃষ্ণপ্রস্তরমূর্ত্তিটি অতি সুশোভিত দেখিলাম। আশে-পাশে লক্ষ্মীনারায়ণ, গরুড়জী, কেদারনাথ ও গণেশজী প্রভৃতি বিরাজ করিতেছেন। কতকগুলি ভগ্ন মূর্ত্তিও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে পড়িয়া আছে। তিন চারিটি চটী ও দোকান আছে। মন্দির হইতে একটু আগের পথে একটি ছোট মন্দিরে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত সত্যনারায়ণজীর মূর্ত্তিও দেখিতে সুন্দর লাগিল—উত্তরাখণ্ডের পাঁচটি বদরীতীর্থের মধ্যে ইহাই হইল আমাদের যাত্রা-পথে তৃতীয় বদরী।

আদি-বদরী হইতে আবার যাত্রা করিয়া আমরা এ দিনে "ক্ষেতী" "জঙ্গল", "কালীমাঠি", "রসিয়াগড়" "খোয়াড়" এই পাঁচটি চটী ক্রমান্বয়ে কচিৎ চড়াই বা কচিৎ উৎরাই পথে অতিক্রম করিয়া, "ধোবীঘাটে"র একটি সুন্দর বারান্দাযুক্ত দ্বিতল-ঘরে রাত্রিযাপন করিলাম। দৃশ্য হিসাবে এ স্থানটি বেশ মনোরম। চারিদিকেই চোখের আগে পাহাড়গুলি এখান হইতে স্তরের পর স্তর কেমন ভাবে অনন্তে মিশিয়া রহিয়াছে দেখা যায়। সম্মুখেই উন্মুক্ত প্রশস্ত সমতলভূমি, সুতরাং আলো-বাতাস যথেষ্ট। দোকানদার ঘরগুলিকে বেশ খটখটে ও পরিষ্কার রাখিয়াছে। নীচের জলের ঝরণা পাইপ সংযোগে ধরা আছে। সম্মুখেই দু'একটি পাহাড়ী 'চুলু' বৃক্ষ। বলিতে কি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা দেখিয়া এ স্থানটিতে স্বতঃই থাকিবার ইচ্ছা জন্মে। আদি-বদরী হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় ১০॥০ মাইল হইবে।

পরদিন প্রভাতে আমাদের ডাণ্ডিওয়ালা কুলীগণের প্রত্যেকেই অত্যন্ত প্রসন্নচিত্তে—দ্বিগুণ উৎসাহে ডাণ্ডি বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিল, আর সাত মাইল মাত্র দূরে "মেইল চৌরী" উপস্থিত হইলেই তাহাদের এ পরিশ্রমের শেষ হইয়া যায়। প্রভাতে সওয়ার-স্কন্ধে প্রথম হইতেই ফতে সিং-এর বুলি—"মাজী! আজ শেষ দিন,—প্রত্যেককেই এক একখানি করিয়া "কপড়া" (কাপড়) বখশিস্ দিতে হইবে।" মিষ্ট কথায়

মায়েদের মন ভুলাইতে সে খুবই অভ্যস্ত! তাহা ছাড়া এই দুর্গম শৈলশিখরে আরোহণ-অবরোহণে অনভ্যস্ত সমতলদেশবাসীর নিকট হইতে তীর্থপথযাত্রার একমাত্র অবলম্বন ও ভরসাস্থল এই বহনকারী কুলীরা যে সহজেই দয়া ও সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে, ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। বলা বাহুল্য, তাহাদের শেষ সাধ অপূর্ণ রহিল না। যোগি-ঋষিবাঞ্ছিত মহাপ্রস্থানের পথে যত কিছু দুর্ল্লভ পবিত্র তীর্থ ও ধাম দর্শনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগে, ইহারা না থাকিলে এ যুগে আমাদের মত গৃহী যাত্রীর পক্ষে তাহা যে একেবারেই অপূর্ণ থাকিয়া যায়। সুখের বিষয়, আজ এক মাইল আন্দাজ নামিয়া আসিতেই "ধুনার ঘাট" নামক একটি বড় চটীতে সে দিন একটি কাপড়ের দোকান চোখে পড়ায়, সেখান হইতে প্রত্যেক কুলীর জন্য এক একখানি কাপড় খরিদ করিয়া লওয়া হইল। দশ হাত প্রত্যেকখানি কাপড়ে দুই টাকা হিসাবে দাম স্বীকার করিতে হইয়াছিল। এইরূপে বেলা ৯টার মধ্যেই আমরা মেইল চৌরী আসিয়া উপস্থিত হইলাম; মধ্যে "দাড়মডালি" ও "সেঁইজি" নামক আরও দুইটি চটী পাইয়াছিলাম।

মেইল চৌরী পর্য্যন্ত আসিয়াই টীহিরী-রাজ্যের গণ্ডী শেষ হইয়াছে, তাই ডাণ্ডি ও বোঝাওয়ালা কুলীগণ এইখানে আসিয়াই তাহাদের সর্ত্তমত আগে যাওয়া একবারেই ক্ষান্ত দিল। অগত্যা বোঝাওয়ালা প্রত্যেকেরই প্রাপ্য মজুরী (প্রতি মণ ৪০৲ টাকা হিসাবে) যে যেমন মাল বহন করিয়া (ভাটোয়ারীতে ওজন হইয়াছিল) আনিয়াছে, সেই মত এইবার সমগ্র চুক্তি দিয়া তাহাদিগকে একবারেই বিদায় দিতে বাধ্য হইলাম। ডাণ্ডি-ওয়ালারাও নির্দ্দিষ্ট মজুরী আদায় লইয়া এইবার সানন্দে দেশে ফিরিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। ইহাদের পরিবর্ত্তে আমরাও আবার রাণীক্ষেত পর্য্যন্ত নূতন কুলী নিযুক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কুলীর আদৌ অভাব

নাই। এখান হইতে রাণীক্ষেতের দূরত্ব কমি-বেশী ৩১ মাইল হইবে। ইহার জন্য প্রতি ডাণ্ডি পিছু ১৮৲ টাকা দিবার স্বীকারে নূতন কুলী পাওয়া গেল। আর বোঝার জন্য কুলীর পরিবর্ত্তে এবার ঘোড়া লওয়া সুবিধাজনক মনে হওয়ায় একটি ঘোড়াওয়ালার সহিত অনেক কষ্টে প্রতি মণ বোঝা পিছু ২৷৷৹ টাকা দরে কথাবার্ত্তা স্থির করিলাম। ৫ মণ বোঝার জন্য দুইটি ঘোড়া সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানকার রীতি অনুযায়ী সরকারী বহিতে প্রত্যেক কুলীর নাম, ধাম, মজুরী ও মাল প্রভৃতির ওজন লিখাইয়া দিয়া আহারান্তে এ দিন আমরা বেলা তিনটা আন্দাজ সময়ে মেইল চৌরী হইতে আগে রওনা হইলাম।

প্রথমেই "রামগঙ্গা" নদীর পুল পার হইয়া কতকটা চড়াই পথে উপরে উঠিলাম। তার পর আবার উৎরাই পথ ধরিয়া আড়াই মাইল আন্দাজ দূরে আসিতে "ইমল ক্ষেতের" কয়েকখানি দোকান-ঘর দেখা গেল। সেখান হইতে দুই মাইল আগে "নারায়ণ" চটী, তার পর একবারেই নিম্নভূমিতে দুই ধারে কেবল বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রভূমি দেখিতে দেখিতে আমরা "গনাই-চৌখুটিয়া" নামক এক স্থানের একটি দোকানীর দোকান-ঘরে আসিয়া রাত্রিটি অতিবাহিত করিলাম। পথিমধ্যে বিস্তৃত ময়দানের মাঝে আরও একটি শ্রীসম্পন্ন "রামপুর" চটী চোখে পড়িয়াছিল।

এই গনাই চৌখুটিয়া হইতে আগে দুইটি রাস্তা পড়ে, একটি দক্ষিণাভিমুখী বামদিকে রাণীক্ষেত গিয়াছে, তাহার দূরত্ব মাত্র ২৩ মাইল, অপরটি পশ্চিমাভিমুখী দক্ষিণদিকে "রামনগর" পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহার দূরত্ব প্রায় ৫৬ মাইল হইবে। প্রায় ৩৩ মাইল অতিরিক্ত যাইবার ভয়ে আমরা রামনগরের রাস্তা না ধরিয়া বামদিকের রাস্তায় পরদিন দ্রুত আগে চলিলাম। "গোয়ালী" "মহাকালেশ্বর" "চিত্রেশ্বর" ও "কৌলেশ্বরের" চটী ক্রমান্বয়ে পার হইয়া মোট ১০ মাইল

দূরে "দ্বারাহাট" (ঢুঁড়াহাটও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন) আসিতে পথিমধ্যে তিন চারিটি ভাঙ্গা পুল পার হইতে হইয়াছিল। দ্বারাহাট হইতে রাণীক্ষেতের দূরত্ব মাত্র তেরো মাইল হইবে। এখানে দোকান-পসার যথেষ্ট। বহু দিনের পর পাকা আম বিক্রয়ার্থ দেখিয়া এখান হইতে কিছু সংগ্রহ করা হইল। এ স্থানে মধ্যে মধ্যে স্তূপের উপরে কেবলই প্রাচীন মন্দির দেখিয়া জিজ্ঞাসায় জানিলাম, উহাতে *কেদার*, বদরীনারায়ণ, লক্ষ্মীনারায়ণ ও নৃসিংহ ভগবান্ প্রভৃতি বহু দেবতাই বিরাজমান আছেন। কত দিনের এ সকল স্থাপনা, বলিবার উপায় নাই! অতীত যুগের এ সকল হিন্দুকীর্ত্তি দেখিবার ইচ্ছা থাকিলেও আমরা এ যাত্রায় আর কাল-বিলম্ব না করিয়া, এখান হইতে আরও দুই মাইল আগে "চণ্ডেশ্বরে"ই আজ দ্বিপ্রহরের ভোজনাদি কার্য্য শেষ করিলাম।

প্রাতের দিকেই বারো মাইল পথ চলিয়া আসা হইল। কিন্তু বলিতে কি, পথ যেন আর শেষ হইতেই চাহে না! বিশ্রামকে আমরা একেবারেই মন হইতে দূর করিয়া দিয়া বৈকালের দিকে আবার তিন মাইল আন্দাজ উৎরাই পথে "কফড়া চটী" উপস্থিত হইলাম। এইখানে আসিতে দূর হইতে অত্যুচ্চ পর্ব্বতগাত্রে রাণীক্ষেত সহরটি সম্মুখভাগে অগণিত শ্বেত-বিন্দুর মত যখন চোখের আগে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তখন আমাদের প্রত্যেকেরই পরিশ্রান্ত, অবসাদগ্রস্ত চিত্তে ক্ষণেকের জন্য কেমন একটা স্বস্তি ও আশার আলোক উদ্দীপ্ত হইয়াছিল, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপর কাহারও বুঝিবার সামর্থ্য নাই। দুই মাসের আত্মীয়-স্বজন-স্বদেশ-বন্ধু-বান্ধব-পরিত্যক্ত যাত্রি-হৃদয়ে যখনই তীর্থ-দর্শনের উৎকট আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে তখন আজন্ম পরিপুষ্ট ঘরের দিকেই যে মনঃ-প্রাণ স্বতঃই ঝুঁকিয়া পড়িবে, ইহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। পাহাড়ের নিরন্তর ঘূর্ণীপাক

এক্ষণে যেন একবারে আমাদের অসহ্য মনে হইতেছিল। কোন প্রকারে "দড়্মার" পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়া এ দিনের যাত্রা শেষ করা হইল।

দড়মার হইতে মাত্র পাঁচ মাইল দূরে "রাণীক্ষেত"। কোন প্রকারে রাত্রি কাটাইয়া আমরা প্রভাত হইতে না হইতে এ স্থান পরিত্যাগ করিলাম। আজিকার পথটুকু কেবলই চড়াই। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, সে দিকে আদৌ লক্ষ্য ছিল না। সকলেই ভাবিতেছিলাম, এই বেলার মধ্যেই আমাদের সুদীর্ঘ পাঁচ ধাম যাত্রার পথক্লেশের চির-অবসান ঘটিবে। তীর্থ-পথ-যাত্রী, প্রত্যক্ষদর্শীর যাত্রা সুসম্পূর্ণ হইলে, তাহার সকল শ্রান্তি ও অবসাদ কতই না সার্থক ও সুখের হইয়া থাকে। যাত্রার পূর্ব্বে কাল যাহা প্রত্যেকেরই নিকটে না জানি কত ভয়াবহ ও ভীষণ দুর্গম ও বিপৎসঙ্কুল বলিয়া মনে হইয়াছিল, আজ দৈবানুগ্রহে ফিরিবার শেষ মুহূর্ত্তে—হউক না সে ভীষণ চড়াই, ইহা আর কতটুকু এবং কতক্ষণই বা! এই ধারণাই এক্ষণে প্রত্যেককে দ্রুতগতি আগে লইয়া যাইতেছিল। শুধু আমরা নহি, আমাদের ক্ষীণশরীরা বৃদ্ধা দিদি পর্য্যন্ত এই চড়াই পথে আজ সকলেরই অগ্রগামিনী হইয়া চলিয়াছেন। সকলেরই প্রাণে অপরিসীম আনন্দ; হৃদয়ের নিভৃত অন্তস্তলে ফিরিয়া তাকাইলে আজ সেখানে শুধু সন্তোষেরই মধুময় সুধা কানায়-কানায় ভরা মনে হইতেছিল। সেই হিমাচল-শীর্ষ-শোভি সুদূর যমুনোত্তরীর তুষারশীতল প্রবাহ, অন্য দিকে কি বা তাহার নিরন্তর আবেগ-উচ্ছলিত নৈসর্গিক বিপুল উষ্ণ উচ্ছ্বাস মনে পড়িল। মনে পড়িল সেই রাজর্ষি ভগীরথ-আনীত হরিপাদ-নিঃসৃত ভাগীরথীর প্রথম-কল্লোল-মুখরিত মধুময় অবতরণ। সেই ত্রিযুগসঞ্চিত প্রজ্বলিত হোমাগ্নি। উপরন্তু সেই রজতগিরিনিভ শুভ্রোজ্জ্বল চিরতুষারবেষ্টিত সুমহান্ জ্যোতির্লিঙ্গ ও সেই মুনিজনমনোহারী ভৃগুপদসুশোভনহৃদি শঙ্খচক্রধারী চতুর্ভুজ—পাঁচধামের

সকল দেবমূর্ত্তি ও তীর্থরাজির কথা ক্ষণেকের জন্য একে একে আ'ন স্মৃতিপটে আসিয়া উদয় হইল। এত সম্পদ্ ও নিত্য নবীন-চিত্র-বৈচিত্র্য যেখানে বিরাজ করে, সেই মহাজনপ্রদর্শিত মহাপ্রস্থানপথের পবিত্র মহাতীর্থের যাঁহারা অনুগামী হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সে দৃশ্যে আনন্দ ও বিস্ময়াপ্লুত না হইয়া কখনই থাকিতে পারেন না। আত্মীয়-স্বজন-স্বদেশ-বন্ধু-বান্ধব-পরিত্যক্ত যাত্রি-হৃদয় এইবার একবার ভক্তিগদ্গদচিত্তে সেই যোগি-ঋষিবাঞ্ছিত তপোমহিমামণ্ডিত পবিত্র হিমগিরির চরণোদ্দেশে শেষবার আপন আপন শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য নিবেদন করিল। উচ্চকণ্ঠে বলিতে ইচ্ছা হইল, "হে চিরন্তন মহিমার হৈম-মুকুটধারী অমল ধবল শুভ্রোজ্জ্বল তুষারশোভি হিমালয়! তোমাকে লাভ করিয়া শুধু হিন্দু নহে, সসাগরা ভারতভূমি হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত সকল দেশবাসীই তোমার দিকেই অনন্তকাল হইতে শ্রদ্ধানতচিত্তে মুগ্ধনেত্রে কেমন তাকাইয়া রহিয়াছে! তুমি পুণ্যভূমি ভারতের শিরো-দেশে একমাত্র পবিত্র ভূষণ! তুমি অবিনশ্বর, প্রতাপী, অখণ্ড পুণ্যোজ্জ্বল, সুমহান্ শ্রেষ্ঠ বিকাশ! যোগি-ঋষির নিয়ত ধ্যান ও ধারণার অতুলনীয় আধার ও অমূল্য সম্পদ্ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তোমাকে আজ শেষবার কোটি কোটি প্রণাম জানাইতেছি! তোমার ঐ অভ্রভেদী বিরাট অবয়বে দেব-মধুর লীলা-বৈচিত্র্য ও নিত্য-নবীন রুচিকর পবিত্র-মধুর দৃশ্য যুগ-যুগান্তর ধরিয়াই সমানভাবে ক্ষুদ্র মানবকে বিস্মিত, স্তম্ভিত ও মোহিত করিয়া রাখিবে সন্দেহ নাই।"

চড়াই পথে "উয়ল্লাঁ" ও "কোটলি" নামক দুইটি চটী অতিক্রম করিয়া বেলা সাড়ে সাতটার মধ্যেই আমরা লোক-কোলাহলপূর্ণ রাণীক্ষেতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বদরীনাথ হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় ১২৮ মাইল হইবে। স্থানান্তরে এ পথেরও সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল।

বদরীনাথ হইতে রাণীক্ষেত তক যাত্রাপথের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

স্থান	দূরত্ব	চটীর নাম	পৌঁছিবার তারিখ	বিশেষত্ব
বদরীনাথ	১২ মাইল	ঘাট চটী	২৮।২।৪০	বহু চটি আছে।
ঘাট	৬ "	যোশী মঠ		আচার্য্য শঙ্কর-স্থাপিত চারিটি মঠের অন্যতম।
যোশীমঠ	১৩ "	পাতাল-গঙ্গা	২৯।২।৪০	অলকনন্দা ও পাতাল-গঙ্গার সঙ্গম-স্থল। দোকানঘর আছে।
পাতাল-গঙ্গা	১৫ "	মঠ চটী	৩০।২।৪০	শাক সবজী পাওয়া যায়।
মঠ চটী	২ "	লালসাঙা	" "	কেদার, বদরী ও কর্ণপ্রয়াগ-পথের মিলন-স্থল। সহরের মত।
লালসাঙা	৭ "	নন্দ-প্রয়াগ	" "	নন্দা ও অলকনন্দা-সঙ্গমস্থল।
নন্দ-প্রয়াগ	৭॥ "	জয়কান্তি	৩১।২।৪০	৪।৫টি দোকানঘর আছে।
জয়কান্তি	৪॥ "	কর্ণপ্রয়াগ	" "	কর্ণের তপস্থাস্থল। পিণ্ডর গঙ্গা ও অলকনন্দার সঙ্গম-স্থল।
কর্ণপ্রয়াগ ~	৭৸ "	ভটৌলি	১।৩।৪০	
ভটৌলি	৪৸ "	আদি-বদরী	" "	নারায়ণের প্রাচীন মন্দির আছে। ঝরণার জল পান করা উচিত।
আদি-বদরী	১০॥ "	ধোবীঘাট	২।৩।৪০	পাকা দোকানঘর আছে।
ধোবীঘাট	১ "	ধূনারঘাটি	" "	অনেক চটি আছে।
ধূনারঘাটি	৬ "	মেইল চৌরী	" "	পুরাতন কুলিগণ এই পর্য্যন্ত আসিয়া থাকে। নূতন কুলি নিযুক্ত হয়।
মেইল চৌরী	৮॥ "	গনাই চৌখুটিয়া	৩।৩।৪০	এখান হইতে একদিকে রাণীক্ষেত, অন্যদিকে রামনগর যাইবার রাস্তা পড়ে।
গনাই চৌখুটিয়া	১০ "	দ্বারাহাট	" "	বহু দোকান ও কতকগুলি প্রাচীন মন্দির আছে।
দ্বারাহাট	৮ "	দড়মার	৪।৩।৪০	
দড়মার	৫ "	রাণীক্ষেত	৫।৩।৪০	স্বাস্থ্যকর স্থান, পার্ব্বত্য-সহর, এখান হইতে কাঠগুদাম যাইবার মোটর-বাস পাওয়া যায়।

সর্ব্বসমেত ১২৮ মাইল মাত্র

১০ম পর্ব্ব—



যাত্রী তুষার-পথ পার হইতেছে



যোশী মঠ



ফিরিবার কালে একস্থানে নদীর দৃশ্য



বদরী-সন্নিহিত পাহাড়

উল্লিখিত হিসাব-দৃষ্টে জানা যায়, মসৌরী হইতে পাঁচ ধাম দর্শনান্তে এ পর্য্যন্ত ফেরত আসিতে সর্ব্বসমেত প্রায় ৫৫৪ মাইল (৪২৬+১২৮) পার্ব্বত্য-পথ আমাদিগকে অতিক্রম করিতে হইয়াছে।

রাণীক্ষেতে স্থানীয় সৈন্যদিগের রসদ ও বাহন প্রভৃতি যে দিকে থাকে, সেই পথ দিয়া আমাদিগের ডাণ্ডি ও ঘোড়াওয়ালা একটি ত্রিরাস্তার সন্ধিস্থলে মোটরবাসের আড্ডায় আসিয়া উপস্থিত হইল। এইখানেই তাহাদের আপন আপন প্রাপ্য মজুরী চুক্তি দিয়া রেহাই পাইলাম। অসহায়ের সহায় ডাণ্ডি দুইখানি এইবার বোঝা হইয়া দাঁড়াইল। ইহার খরিদদার এ সময়ে কেহই ছিল না; অগত্যা শেষ মুহূর্ত্তে ইহা-দিগকে স্থানীয় দুইটি "অনাথালয়ে" অর্পণ করাই সাব্যস্ত হইল। এই অপরূপ বাহন ও বাহকদিগের জন্য প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বড় কম খরচ পড়ে নাই। হিসাব দৃষ্টে জানা গিয়াছে, প্রতি ডাণ্ডি পিছু ডাণ্ডিওয়ালাদের পশ্চাতে নির্দ্দিষ্ট মজুরী ২২৫৲ টাকা ছাড়া "চানা-চবেনি" "খিচুড়ী" ও ইনাম প্রভৃতিতে অতিরিক্ত আরও ৭৫৲ টাকা অর্থাৎ সর্ব্বসমেত প্রায় তিন শত টাকা লাগিয়াছে। এইরূপে আবার বোঝার জন্য বোঝাওয়ালাদিগকেও পাঁচ ধামের নির্দ্দিষ্ট মজুরী প্রতি মণ ৪০৲ টাকা হিসাবে দিয়াও, অতিরিক্ত প্রায় ৩০৲ টাকা অর্থাৎ প্রতি মণ ৭০৲ টাকার কমে আমরা পার পাই নাই। পাঁচ ধাম যাত্রার ইহাই হইল প্রধান খরচ। অবশ্য পদব্রজে যাত্রীর শুধু বোঝার জন্যই (ডাণ্ডির নহে) খরচ লাগিয়া থাকে। তার পর রেলভাড়া, বাস্‌ভাড়া, নিত্য আহার্য্যদ্রব্যাদি খরিদ, দান-খয়রাত, পূজা, ভেট, প্রণামী ও পাণ্ডার দক্ষিণা ইত্যাদি উপরন্তু খরচ তাহা ত সমস্তই শক্তি অনুসারে যেখানে যেরূপ করা চলে, সকলকেই বহন করিতে হয়।

এখান হইতে "কাঠগুদাম" রেলষ্টেশন প্রায় ৫২ মাইল হইবে। মোটর-বাসে জন পিছু ভাড়া ২৵০ স্বীকারে, সকলেই একে একে মাল-পত্রসহ বেলা ১০টা আন্দাজ সময়ে, পুনর্ব্বার রওনা হইলাম। অপরাহ্ণ বাগাইদ ষ্টেশনে আসিয়া রাণীক্ষেত হইতে ক্রীত ফলমূলাদির দ্বারা এ দিনের ক্ষুৎ-পিপাসা দূর করা হইল। সময়াভাবে এদিন অন্নাহার জুটে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

দীর্ঘ দুই মাস পরে ৬ই আষাঢ় মঙ্গলবার সকলেই নিরাপদে কাশী প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছি। এ স্থলে একটি বিষয় না জানাইয়া আমি আমার এই দীর্ঘ ভ্রমণকাহিনীর পরিসমাপ্তি করিতে পারিতেছি না—এই আগা-গোড়া যাত্রাপথের যে সকল চিত্র ক্রমান্বয়ে পাঠকবর্গের নিকটে একে একে উপস্থিত করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহার জন্য আমি তিন জনের দিকটে প্রকৃতপক্ষে ঋণী আছি। প্রথম ব্যক্তি কাশীনিবাসী শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ চক্রবর্ত্তী—ইনি আমাদিগেরই সময়ের সহযাত্রী, বর্দ্ধমানের ধর্ম্মপ্রাণা শ্রীযুক্তা রাণী মাতার সহিত বদরী-কেদার দর্শনে বাহির হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি এলাহাবাদ-নিবাসী শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বাগ্‌চী (ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ জনৈক "আর্টিষ্ট", মাসিক পত্রিকায় ছবি ইত্যাদি প্রকাশ করিয়া থাকেন) গঙ্গোত্রীপথে পথিক ছিলেন এবং তৃতীয় ব্যক্তি কলিকাতানিবাসী শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র মিত্র—ইঁহার সহিত "গৌরীকুণ্ড" তীর্থে আলাপাদি হয়। ইঁহাদের প্রত্যেককেই এ জন্য ধন্যবাদ জানাইয়া, আমি এ যাত্রায় পাঠকবর্গের নিকটে বিদায় লইলাম।

সমাপ্ত

মতামত

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় বলেন ঃ—

"হিমালয়ে পাঁচ ধাম"—শ্রদ্ধাবান্ তীর্থযাত্রিগণের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া আমার মনে হয়। পথের সন্ধান, যাত্রিনিবাসের সুবিধা-অসুবিধা, তীর্থগুরুদিগের আচরণ, পথে খাদ্যদ্রব্যের সুলভতা বা দুর্ম্মূল্যতা, গন্তব্যধামসমূহের দূরতা, পথের দুর্গমতা, প্রাকৃতিক মনোহর দৃশ্য প্রভৃতির আবশ্যক পরিচয়, গ্রন্থকার এমন সুন্দর ও সরলভাবে দিয়াছেন, তাহাতে তত্ত্বান্বেষী সহৃদয় যাত্রী মাত্রেই সন্তুষ্ট হইবেন এবং উপকৃত হইবেন। ইহা বলিলেই এই গ্রন্থের যথেষ্ট পরিচয় দেওয়া হইল বলিয়া আমার মনে হয় না, সাত্বিকভাবে তীর্থযাত্রা করিতে হইলে গন্তব্য তীর্থনিবহের ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক উৎপত্তি-কথা, শাস্ত্রীয় অবশ্য কর্ত্তব্য অনুষ্ঠানপদ্ধতি ও তত্তৎতীর্থে কি কি অবশ্য কর্ত্তব্য এবং কি পরিহরণীয়, ইত্যাদি বহু জ্ঞাতব্য বিষয় এই গ্রন্থে যাত্রীর পক্ষে নিতান্ত দুর্লভ শাস্ত্রীয় প্রমাণের সাহায্যে সুন্দর ও সরলভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই সখের তীর্থযাত্রার যুগে গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী প্রভৃতি হিমালয়স্থ দুর্গম অথচ মনোহর পঞ্চ ধামের প্রকৃত অথচ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলির এমন সুশ্লিষ্ট ভাবে বর্ণনা আমি পূর্ব্বে আর দেখি নাই। সহৃদয় আস্তিকসমাজে এরূপ গ্রন্থের বিশেষ আদর হইবে, ইহাই আমার বিশ্বাস। ইতি

৺কাশীধাম
২২শে চৈত্র ১৩৩৪

স্বাঃ—শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

শ্রীরামঃ শরণম্।

নানাদর্শনপরমাচার্য্য পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় বলেন :—

শ্রীমান্ সুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বে "মানস-সরোবর ও কৈলাস" নামক ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিয়া বিশেষ যশস্বী হইয়াছেন, এক্ষণে "হিমালয়ে পাঁচ ধাম" নামক ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। ইহাতে যমুনোত্তরী, গঙ্গোত্তরী, ত্রিযুগী-নারায়ণ, কেদারনাথ ও বদরী-নারায়ণ,—উত্তরাখণ্ডের এই প্রধান প্রধান পাঁচটি তীর্থের বিবরণ আছে।

'ধাম' শব্দের আভিধানিক অর্থ স্থান, সুতরাং এই পঞ্চ পবিত্র স্থানের 'ধাম' নামে উল্লেখ করা অসঙ্গত হয় নাই।

এইরূপ ভ্রমণবৃত্তান্ত সর্ব্বশ্রেণীর পাঠকেরই আনন্দ বর্দ্ধন করিবে, ইহা আমি বিশ্বাস করি, বিশেষতঃ শাস্ত্রীয় প্রমাণ সংযোজিত হইয়া এই ভ্রমণবৃত্তান্তকে মূল্যবান্ করিয়াছে।

'গোমুখী' শব্দের যে বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে, তাহা প্রসিদ্ধিমূলক হইলেও স্বর্গদ্বার অর্থে ইহার প্রয়োগ হওয়া সমীচীন বলিয়া আমি মনে করি।

শ্রীমান সুশীলচন্দ্রের এই গ্রন্থমধ্যে রচনার বৈশিষ্ট্য আন্তরিক ধর্ম্মভাব দ্বারা পরিস্ফুরিত হইয়াছে। আশা করি, ধার্ম্মিকসমাজ এই গ্রন্থের বিশিষ্ট সমাদর করিবেন এবং শ্রীমানের যশঃশ্রী ইহাতে বৃদ্ধি পাইবে। ইতি তাং ১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫

স্বাঃ—শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

স্বনামখ্যাতা উপন্যাস-লেখিকা শ্রীমতী অনুরূপা দেবী বলেন:—

আপনার "পাঁচ ধাম" যে কোন উপন্যাসের অপেক্ষাও চিত্তাকর্ষক। বাঙ্গালীর ছেলে-মেয়েরা এমন কি, বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাগণ পর্য্যন্ত যে এখনও অন্তরে অন্তরে বীর ও বীরাঙ্গনা, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আপনাদের এই কয়টি ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। 'ভীরু বাঙ্গালী' এবং 'অবলা নারী' এই শব্দগুলির ব্যবহার বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে মনে হয় একটা যেন ষড়যন্ত্র। প্রাচীন কালে বৃহত্তর বঙ্গের সৃজনে, এমন কি, বৃহত্তর ভারতের সৃষ্টিতেও, বাঙ্গালী তিব্বতে ও চীনে এবং ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ভারতবর্ষের ধর্ম্ম এবং সভ্যতার বিস্তারকার্য্যে যথেষ্টরূপেই সহায়তা করিয়াছিল, তাহার প্রচুরতর প্রমাণ রহিয়াছে। আজও ধর্ম্ম সম্পর্কিত অভিযানে সে তেমনই আগ্রহান্বিত এবং নির্ভীক! তাহার লিখিত প্রমাণ আপনাদের উপর্য্যুপরি মানস-সরোবর ও কৈলাসের পরই এই পাঁচ ধাম যাত্রায় পাওয়া গেল। কত শত নর-নারীই এমন নির্ভীকতার এবং ভারতবর্ষীয় হিন্দুর (এই বস্তুতান্ত্রিক যুগেও) একনিষ্ঠ ধর্ম্মপ্রাণতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ প্রদান করিয়া থাকেন, কে সংবাদ রাখে? আমার এই ভগ্নশরীরেও বাকী দুই ধাম (গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী) দর্শনের আশা যেন দুরাশা বলিয়া মনে স্থান পাইতেছে না। এমন সব পুস্তক ইংরাজীতে অনুবাদ হইলে হয় ত বাঙ্গালী নর-নারীর ভীরুতার অপবাদ ঘুচিতে পারে।

স্বাঃ—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।

গ্রন্থকারের আর একখানি পুস্তক

"মানস-সরোবর ও কৈলাস"—সচিত্র ভ্রমণ-কাহিনী। মূল্য দেড় টাকা মাত্র। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় ইহার ভূমিকা লিখিয়াছেন। সমস্ত মাসিক-পত্রিকা ও সংবাদ-পত্রে উচ্চকণ্ঠে প্রশংসিত।

উপন্যাস-লেখিকা শ্রীমতী অনুরূপা দেবী বলেন, "পড়িতে পড়িতে ছুটিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছিল······রচনার বৈশিষ্ট্যে—ভাষার লালিত্যে গ্রন্থ-খানি যেন উপন্যাসের মতই সুখপাঠ্য হইয়াছে না দেখিয়াও সেই অলৌকিক ও মহান্ তীর্থরাজ কৈলাসের প্রত্যক্ষ দৃষ্টবৎ উজ্জ্বল চিত্রখানি যেন মানসমধ্যে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। মানস-সরোবরে যেন সেই রজত-গিরি-সন্নিভের সমাবেশিত রজতগিরির সুবিমল ছায়া প্রগাঢ়রূপে চিত্রাঙ্কিত করিয়া দিয়াছে। লেখকের ইহাই যথার্থ লিপিকুশলতা।"

"তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়" শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় লিখিয়াছেন, "এখন যখন বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গভাষার সাহায্যে নানা বিষয়ে শিক্ষা দিবার প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তখন আমাদের বিশ্বাস, আলোচ্য গ্রন্থখানি তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে স্থান পাইবে।"

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ এম, এ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী, রস-সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত কলেজাধ্যক্ষ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত এম, এ, পি, এইচ, ডি, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র-নাথ দত্ত এম, এ, বি, এল বেদান্তরত্ন মহাশয় (কত লোকের নাম করিব)

প্রভৃতি সকলেই একবাক্যে ইহার প্রশংসা করিয়াছেন। ভাবুক, ধর্ম্মপ্রাণ ও সৌন্দর্য্যপিপাসু প্রত্যেক নর-নারীর ইহাই অপূর্ব্ব সুযোগ। ঘরে বসিয়া স্বল্পমাত্র মূল্যে এই চিররহস্যাবৃত হিমাদ্রি-শিখর-চুম্বি মানস-সরোবর ও কৈলাসের প্রত্যক্ষ বহুচিত্র-শোভিত পুস্তকখানি ক্রয় করিয়া নয়ন সার্থক ও সঙ্গে সঙ্গে আশাতীত আনন্দ লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হউন।

প্রাপ্তিস্থান

১। বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট

২। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

৩। গ্রন্থকারের নিকট ১৯০ নং সোনারপুরা, ৺কাশীধাম

